আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ

দ্বিতীয় খণ্ড

শ্রীমোহনদাস করমচাঁদ গান্ধী প্রণীত

অনুবাদক
শ্রীসতীশচন্দ্র দাসগুপ্ত

মূল্য—বারো আনা মাত্র।

আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ

চতুর্থ ভাগ

সূচী-পত্র

চতুর্থ ভাগ

বিষয়		পৃষ্ঠা

বিষয়		পৃষ্ঠা

আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ

বিপুল শ্রম কি পণ্ড হইল

মিষ্টার চেম্বারলেন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে সাড়ে তিন কোটি পাউণ্ড অর্থ (সাড়ে বাহান্ন কোটি টাকা) লইতে আসিয়াছিলেন, আর ইংরেজ-দিগের ও সম্ভব হয় ত বোয়ারদিগের মন হরণ করিতে আসিয়াছিলেন। এইজন্য ভারতীয় প্রতিনিধিরা যে জবাব পাইয়াছিলেন তাহাতে আন্ত-রিকতার আভাস ছিল না। তিনি বলিলেন—"আপনারা ত জানেন যে, দায়িত্বশালী সংস্থার উপর ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্টের নাম মাত্রই হাত আছে। আপনাদের অভিযোগ সত্য বলিয়াই মনে হয়। আমার দ্বারা যাহা সম্ভব তাহা আমি করিব। কিন্তু আপনারা যতটা পারেন এখানকার গোরাদের সুনজরে থাকিবার চেষ্টা করিবেন।"

প্রতিনিধিরা জবাব শুনিয়া দমিয়া গেলেন। আমিও হতাশ হইলাম। আমি বুঝিলাম আবার নূতন করিয়া কাজ আরম্ভ করিতে হইবে। সঙ্গীদিগকেও সে কথা বুঝাইলাম।

প্রকৃত পক্ষে চেম্বারলেনের জবাব মন্দ ছিল না। গোলমেলে কথা না

বলিয়া তিনি সিধা কথাই বলিয়াছিলেন। মিষ্টি কথায় তিনি আমাদিগকে সমঝাইয়া দিয়াছিলেন যে, "তোমাতে আমাতে তরবারির সম্পর্ক।"

কিন্তু আমাদের কাছে তলোয়ার কোথায়? আমাদের কাছে তলোয়ারের আঘাত সহ্য করার দেহ থাকে ত তাহাই ভাগ্য বলিয়া মানিব।

মিঃ চেম্বারলেনের মাত্র কয়েক সপ্তাহ থাকার কথা। দক্ষিণ আফ্রিকা ত একটা ছোট প্রদেশ নয়, ইহাকে একটা দেশ—একটা মহাদেশও বলা যায়। অনেকগুলি দেশ আফ্রিকার অন্তর্ভুক্ত রহিয়াছে। যদি কন্যাকুমারী হইতে শ্রীনগর ১৯০০ মাইল হয়, তবে ডারবান্ হইতে কেপ্‌টাউন ১১০০ মাইলের কম নয়। এই মহাদেশ মিঃ চেম্বারলেনকে পবন-বেগে ঘুরিতে হইবে। তিনি ট্রান্সভাল রওনা হইলেন। আমাকে এখন মোকদ্দমা তৈরী করিয়া দাখিল করিতে হইবে। কিন্তু প্রিটোরিয়ায় কেমন করিয়া পঁহুছিব? আমার সেখানে সময় মত পঁহুছিতে হইলে যে পাস্ (Permit) আবশ্যক, তাহা নিজেদের লোক দিয়া পাওয়ার উপায় ছিল না।

লড়াইয়ের পরে ট্রান্সভাল যেন উজাড় হইয়া গিয়াছিল। সেখানে খাওয়া-দাওয়ার সামগ্রী ছিল না, পরিধানের কাপড় ছিল না, খালি ও বন্ধ-করা দোকানগুলি তখনও ভর্ত্তি হইতে এবং খুলিতে বাকী ছিল। এ কার্য্য ধীরে ধীরে চলিতেছিল। যেমন যেমন দোকানগুলি ভরিয়া উঠিতেছিল, সেই সেই মত যাহারা ঘর-বাড়ী ছাড়িয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে ফিরিয়া আসিতে অনুমতি দেওয়া হইতেছিল। এজন্য প্রত্যেক ট্রান্সভালবাসীকেই পাস লইতে হইল। গোরাদিগের চাহিবা মাত্রই পাস মিলিত, ভারতীয়দেরই হইল মুস্কিল।

বিপুল শ্রম কি পণ্ড হইল

লড়াইয়ের জন্য ভারতবর্ষ ও লঙ্কা হইতে অনেক আমলা ও সিপাহী দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিল। তাহাদের মধ্যে যাহারা সেখানে বসবাস করিতে চায়, তাহাদিগকে তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া বৃটিশ গবর্ণমেণ্ট অবশ্য করণীয় বলিয়া গণ্য করিয়াছিলেন। একটা নূতন বিভাগ (ডিপার্টমেণ্ট) সৃষ্টি করার হেতুও তাহাই। গবর্ণমেণ্টের এই ইচ্ছা কর্ম্মচারীরা সহজেই মানিয়া লইলেন। কর্ম্মচারীরা তীক্ষ্ণ বুদ্ধি-বশতঃ এক নূতন বিভাগও সৃষ্টি করিলেন—এই বিষয়ে তাঁহাদের যোগ্যতাও ছিল বিলক্ষণ। যদি নিগ্রোদিগের জন্য ভিন্ন বিভাগ থাকে, তবে ভারতবাসীর জন্যই বা তাহা থাকিবে না কেন? যুক্তিটি ঠিক বলিয়া গণ্য হইল। তাই আমি পহুছিবার পূর্ব্বেই এই নূতন বিভাগ খোলা হইয়াছিল ও ধীরে ধীরে তাহা নিজের জালও বিস্তার করিতেছিল। যাহারা ফিরিতেছিল ইচ্ছা করিলে পূর্ব্বের কর্ম্মচারীই তাহাদের সকলকে পাস দিতে পারিতেন। কিন্তু এশিয়াবাসীদের জন্য তাঁহার গরজ কি? যদি নূতন বিভাগের অনুমোদনে এই পাস দেওয়া হয়, তবে এই কর্ম্মচারীর ঝুঁকিও কমে, কাজের বোঝাও কমে, ইহাই ছিল নূতন বিভাগ খোলার যুক্তি। আসলে কথাটা এই যে, নূতন বিভাগের কার্য্যের আবশ্যক ছিল আর কর্ম্মচারীদেরও টাকার আবশ্যক ছিল। যদি কাজ না থাকে, তবে নূতন বিভাগের আবশ্যকতা থাকে না এবং অবশেষে উহা উঠাইয়াও দিতে হয়। এই জন্যই এ কার্য্য তাঁহারা জোটাইয়া লইয়াছিলেন।

এই নূতন বিভাগে ভারতবাসীদিগকে দরখাস্ত করিতে হয়, আর জবাব পাইতে অনেক দিন চলিয়া যায়। এই জন্য ট্রান্সভাল যাইতে যাহারা ইচ্ছুক তাহাদের জন্য অনেক দালাল জুটিয়া গেল। এই দালাল ও কর্ম্মচারীরা মিলিয়া গরীব ভারতবাসীদের হাজার হাজার টাকা লুট

করিয়াছে। আমাকে বলা হইয়াছিল যে, খাতির না থাকিলে পাসের হুকুম পাওয়া যায় না। খাতির থাকা সত্ত্বেও কোনও কোনও ক্ষেত্রে ভারতবাসীকে শত শত পাউণ্ড ব্যয় করিতে হইয়াছে।

আমি আমার পুরাতন বন্ধু, ডারবানের পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের নিকট গিয়া বলিলাম—"আপনি পাস্ দেওয়ার কর্ম্মচারীর সহিত আমার পরিচয় করাইয়া দিন, এবং আমাকে পাস পাইবার ব্যবস্থা করিয়া দিন। আমি যে ট্রান্সভালে ছিলাম তাহা ত আপনি জানেন।" তিনি তখনই মাথায় টুপি দিয়া আমার সঙ্গে আসিলেন ও আমার পাস কাটাইয়া দিলেন। আমার যাওয়ার ট্রেণ ছাড়ার মাত্র এক ঘণ্টা বাকী ছিল। আমি মাল-পত্র গোছাইয়া রাখিয়াছিলাম। সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট আলেকজেণ্ডরের উপকারের জন্য তাঁহাকে ধন্যবাদ দিয়া আমি প্রিটোরিয়া যাওয়ার জন্য রওনা হইলাম।

মুস্কিলের ভিতর দিয়াও আমি ঠিক মত আসিয়া পঁহুছিয়াছিলাম। আরজি পেশ করিলাম। ডারবানে ভারতবাসীদিগকে তাহাদের প্রতিনিধিদের নাম পূর্ব্বেই পেশ করিতে হইবে বলিয়া নির্দ্দেশ দেওয়া হইয়াছিল বলিয়া মনে পড়ে না। কিন্তু এখানে নূতন বিভাগ চালু হইয়াছিল। তাঁহারা প্রতিনিধির নাম প্রথমেই জিজ্ঞাসা করিলেন। প্রিটোরিয়ার ভারতবাসীরা খবর পাইয়াছিলেন যে, কর্তৃপক্ষ আমাকে প্রতিনিধিদের ভিতর স্থান দিতে রাজি নহেন।

এই দুঃখদায়ক অথচ রহস্যময় কাহিনী পরবর্ত্তী অধ্যায়ে বর্ণিত হইল।

এশিয়ার [illegible] আমলাতন্ত্রী ব্যবস্থা

নূতন বিভাগের কর্ম্মচারী [illegible] পারিলেন না যে, আমি কেমন করিয়া ট্রান্সভালে প্রবেশ [illegible] নিকট যে সকল ভারতবাসী যাতায়াত করে, [illegible]হাদিগকে [illegible] কথাটা জিজ্ঞাসা করিতেছিলেন, কিন্তু সে বেচারারা [illegible] কি জানে ; [illegible]চারীরা অনুমান করিল যে, আমি পূর্ব্বের পরিচয়ের খাতিরে, পাস না লইয়াই প্রবেশ করিয়াছি। তাহা যদি হইয়া থাকে তবে তাহারা আমাকে কয়েদ দিতে পারিবে।

বড় একটা যুদ্ধ হইয়া গেলে সাধারণতঃ রাজ-কর্ম্মচারীদের হাতে বিশেষ ক্ষমতা কিছুকালের জন্য দেওয়া হয়। দক্ষিণ আফ্রিকাতেও তাহাই হইয়াছিল। শান্তি-রক্ষার জন্য এক আইন পাস হইয়াছিল। তাহার এক সর্ত্ত ছিল যে, যদি কেহ বিনা পাশে ট্রান্সভালে প্রবেশ করে তবে তাহাকে গ্রেপ্তার করিয়া কয়েদ দেওয়া যায়। এই সর্ত্ত অনুসারে আমাকে গ্রেপ্তার করার জন্য পরামর্শ হইল। কিন্তু আমার নিকট পাস দেখিতে চাওয়ার সাহস কাহারও হইল না।

কর্ম্মচারীরা ডারবানে তার পাঠাইয়া দিলেন। তাঁহারা যখন তারের জবাবে জানিলেন যে, আমি পাস লইয়াই আসিয়াছি তখন তাঁহারা নিরাশ হইলেন। কিন্তু এই নিরাশায় তাঁহারা পরাজয় স্বীকার করার লোক নহেন। আমি আসিয়া পড়িয়াছি ঠিক, কিন্তু মিঃ চেম্বারলেনের নিকট আমাকে যাইতে দেওয়া-না-দেওয়ার উপায় তাঁহাদের হাতেই আছে।

তাঁহারা প্রথমে প্রতিনিধিদের নাম লইলেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে বর্ণ-বিদ্বেষ ত যেখানে সেখানে ছিলই, কিন্তু এখন ভারতবর্ষের ন্যায় নোংরা ও প্রচ্ছন্ন ব্যবহারের দুর্গন্ধও পাইতে লাগিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় সাধারণ বিভাগ প্রজার হিতের জন্যই রক্ষিত হইয়া থাকে। সেইহেতু সেখানে কর্ম্মচারীদের মধ্যে এক প্রকার সরলতা ও নম্রতা দেখা যায়। ইহার লাভ কালো চামড়ার লোকেরাও অল্প-বিস্তর পাইত। এখন ইহার মধ্যে এশিয়া-সুলভ আবহাওয়া প্রবেশ করায় (এশিয়া হইতে আগত কর্ম্মচারীদের জন্য) সেখানেও এশিয়ার মতই জো-হুকুমী, তেমনি চক্রান্ত প্রভৃতি নোঙরামিও প্রবেশ করিল। দক্ষিণ আফ্রিকায় খানিকটা প্রজার অধিকার বর্ত্তমান ছিল। এইবার সেখানে এশিয়া হইতে আমলাতন্ত্রের নবাবশাহী আসিয়া উপস্থিত হইল। এশিয়াতে ত প্রজার অধিকার নাই-ই, বরঞ্চ প্রজার উপর অধিকার আছে। দক্ষিণ আফ্রিকাতে গোরারা ঘর করিয়া বাস করিতেছিল, এই হেতু তাহারা সেখানকার প্রজা ছিল এবং বিভাগীয় কর্ম্মচারীদের উপর তাহাদের যথেষ্ট প্রভাব-প্রতিপত্তিও ছিল। এই অবস্থায় এশিয়া হইতে অবাধ আমলাতন্ত্রের আমদানী করা হয়। ফলে ভারতীয়দের অবস্থা জাঁতীর মধ্যে সুপারির ন্যায় হইল।

আমাকেও এই আমলাতন্ত্রী অধিকারের ভাল রকম পরিচয় পাইতে হইয়াছিল। প্রথমে আমার উপর এই বিভাগের কর্ত্তার নিকট উপস্থিত হওয়ার তলব আসিল। কর্ত্তাটি লঙ্কা হইতে আসিয়াছিলেন। 'তলব আসিল' বলায় অতিশয়োক্তি মনে হইতে পারে। সেইজন্য আরও একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। আমাকে কোনও পত্র দেওয়া হয় নাই। ভারতীয় নেতাদিগকে মাঝে মাঝে এশিয়া সম্পর্কিত কর্ম্মচারীদের নিকটে যাইতে

হইত। এই নেতাদের মধ্যে পরলোকগত শেঠ তৈয়ব হাজি খান-মহম্মদও একজন ছিলেন। তাঁহাকে ঐ সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন—"গান্ধী কে? সে কেন আসিয়াছে?"

তৈয়ব শেঠ জবাব দিলেন—"তিনি আমাদের পরামর্শ-দাতা, তাঁহাকে আমরা ডাকিয়া আনিয়াছি।"

সাহেব বলিলেন—"আমরা সকলে এখানে তবে কি করিতে আছি? আমরা কি তোমাদিগকে রক্ষণাবেক্ষণ করিতে পারি না? গান্ধীর এখানে কোন্ দরকারটা আছে?"

তৈয়ব শেঠ যথাশক্তি এই আঘাতের উত্তর দিলেন। তিনি বলিলেন—"আপনারা ত আছেনই। কিন্তু গান্ধী কি আমাদেরই একজন নহেন? তিনি আমাদের ভাষা জানেন, তিনি আমাদিগকে বুঝিতে পারেন। আপনারা ত চাকুরে (আমলা)।"

সাহেব হুকুম করিলেন—"গান্ধীকে আমার নিকট লইয়া আসিও।"

তৈয়ব শেঠ ইত্যাদির সাথে আমি গেলাম। চেয়ার আর কোথা হইতে জুটিবে? আমাদের সকলকেই দাঁড়াইয়া থাকিতে হইল।

সাহেব আমার দিকে তাকাইয়া বলিলেন—"ভাল, আপনি এখানে কি কাজে আসিয়াছেন?"

আমি জবাব দিলাম—"আমার ভাইয়েরা আমাকে ডাকিয়াছে বলিয়া আমি পরামর্শ দিতে আসিয়াছি।"

"কিন্তু আপনি কি জানেন না যে, আপনার এখানে আসার অধিকার নাই? আপনি যে পাস পাইয়াছেন তাহা ভুল করিয়া আপনাকে দেওয়া হইয়াছে। আপনাকে এখানকার বাসিন্দা বলিয়া ধরা যায় না। আপনাকে ত ফিরিয়া যাইতেই হইবে, আপনার মিঃ চেম্বারলেনের নিকটেও

যাওয়া হইবে না। এখানকার ভারতবাসীদের দেখা-শোনা করার ভার আমার বিভাগের উপরই দেওয়া আছে। এখন যাইতে পারেন।"

এই কথা বলিয়া সাহেব আমাকে বিদায় করিলেন, আমাকে জবাব দেওয়ার অবকাশও দিলেন না।

কিন্তু আমার অন্য সঙ্গীদিগকে তিনি আটকাইলেন। তাঁহাদিগকে ধমকাইয়া পরামর্শ দিলেন—আমাকে যেন ট্রান্সভাল হইতে বিদায় করা হয়। একটা নূতন, কঠিন ও অপ্রত্যাশিত অবস্থা আমার নিকট স্পষ্ট হইয়া উঠিল।

৩

তেতো ঢোক গেলা

এই অপমানে আমার বড় দুঃখ হইল। কিন্তু পূর্ব্বে যেমন করিয়া অপমান সহ্য করিয়াছি, তেমনি করিয়া শক্ত হইয়া রহিলাম। এই অপমান গ্রাহ্য না করিয়া উহাতে উদাসীন থাকিয়া যাহা আমার কর্ত্তব্য মনে হয় তাহাই করিব বলিয়া স্থির করিলাম।

পূর্ব্বোক্ত কর্ম্মচারীর স্বাক্ষরে এক পত্র আসিল। তাহাতে লেখা ছিল যে, মিঃ চেম্বারলেন ডারবানে মিঃ গান্ধীর সহিত দেখা করিয়াছেন, সেইহেতু এখন তাঁহার নাম প্রতিনিধি-তালিকা হইতে কাটিয়া দেওয়া আবশ্যক হইয়াছে।

সাথীদিগের নিকট এই পত্র অসহ্য মনে হইল। তাঁহারা ডেপুটেশন লইয়া যাওয়া পরিত্যাগ করারই পরামর্শ দিলেন। আমি তাঁহাদিগকে আমাদের সম্প্রদায়ের বিশ্রী অবস্থার কথা বুঝাইয়া দিলাম। বলিলাম, যদি আপনারা মিঃ চেম্বারলেনের নিকট না যান, তবে এখানে কোনও ক্লেশ নাই—এই রকমই বোঝা যাইবে। সেইহেতু যাহা বলার আছে তাহা লিখিয়া দিতেই হইবে, আর সে লেখাও তৈরী হইয়াছে। এক্ষণে আমিই পড়ি, কি আর কেহ পড়ে—তাহাতে কি আসে যায়? মিঃ চেম্বারলেন ত আর আলোচনা করিবেন না। আমার যে অপমান হইয়াছে তাহা আপনাদের হজম করিতে হইবে।

আমার বলা শেষ হইতে না হইতেই তৈয়ব শেঠ বলিয়া উঠিলেন—"কিন্তু আপনার অপমানে সম্প্রদায়েরই অপমান ত ? আপনি আমাদেরই প্রতিনিধি, ইহা কেমন করিয়া ভুলিব ?"

আমি বলিলাম—"সে কথা ঠিক। কিন্তু সম্প্রদায়কেও এই অপমান গিলিতে হইবে। আমাদের কাছে আর দ্বিতীয় কোনো উপায় আছে কি ?"

তৈয়ব শেঠ বলিলেন—"যাহা হওয়ার হইবে, কিন্তু ইচ্ছা করিয়া নূতন অপমান কেন সহ্য করিব ? খারাপ ত আমাদের হইয়াই আছে, আমাদের কি অধিকারই বা আছে ?"

এই তেজ আমার কাছে ভাল লাগিল। কিন্তু তাহা ব্যবহার করা যায় না ইহাও আমি জানিতাম। সম্প্রদায়ের অসমর্থতার অনুভব আমার ছিল। সেইজন্য আমি সাথীদিগকে আমার পরিবর্ত্তে পরলোকগত ভারতীয় ব্যারিষ্টার জর্জ্জ গড্‌ফ্রেকে লইয়া যাইতে পরামর্শ দিলাম।

মিঃ গড্‌ফ্রে ডেপুটেশনের নায়ক হইলেন। আমার সম্বন্ধেও মিঃ চেম্বারলেন কিছু চর্চ্চা করিয়াছিলেন। "একই লোকের কথা পুনরায় শোনা অপেক্ষা নূতন লোকের কথা শোনা খুবই ভাল"—ইত্যাদি বলিয়া তিনি ক্ষত সারাইবার চেষ্টা করিয়াছিলেন।

কিন্তু ইহাতে সম্প্রদায়ের এবং আমার কার্য্য বাড়িল, শেষ হইল না। গোড়া হইতে পুনরায় আরম্ভ করিতে হইল। "আপনার কথাতেই আমাদের সম্প্রদায় লড়াইয়ে অংশ লইয়াছিল। কিন্তু পরিণাম ত ইহাই হইল ?"—কেহ কেহ এই প্রকার উপহাসের বাণও আমার উপরে নিক্ষেপ করিলেন। কিন্তু উপহাসে আমার কিছু হইল না। আমি বলিলাম—"আমি যে উপদেশ দিয়াছিলাম সে জন্য আমার অনুতাপ নাই। যুদ্ধে

অংশ লইয়া যে আমরা ঠিকই করিয়াছি, ইহা এখনো আমি মানি। আমরা ঐ প্রকার করিয়া নিজেদের কর্ত্তব্য পালন করিয়াছি, তাহার ফল আপাত দৃষ্টিতে না হয় না-ই পাইলাম। কিন্তু শুভ কার্য্যের ফল যে শুভ, ইহা আমার দৃঢ় বিশ্বাস। গত ঘটনার বিচার করা অপেক্ষা এক্ষণে আমাদের কি কর্ত্তব্য তাহা বিচার করাই ভাল—একথা আপনারা ভাবিয়া দেখিবেন।"

কথাটা অপর সকলে মানিয়া লইলেন।

আমি বলিলাম—"ঠিক ভাবে দেখিতে গেলে যে কার্য্যের জন্য আমাকে আনিয়াছিলেন তাহা শেষ হইয়াছে, বলা যায়। সুতরাং আপনারা হয়তো আমাকে ফিরিতে আজ্ঞা দিবেন। কিন্তু আমার দ্বারা যাহা করা সম্ভব তাহা করার জন্যই আমার পক্ষে এখনও ট্রান্সভাল পরিত্যাগ করা সঙ্গত হইবে না বলিয়াই আমি মনে করি। এখন আর 'নাতাল' হইতে নয়, পরন্তু এই স্থান হইতেই কাজ চালানো দরকার। এক বৎসরের মধ্যে দেশে না ফিরিবার সঙ্কল্প ত করিতেই হইবে, তাহা ছাড়া এইখানেই আমার ওকালতীর সনদও লওয়া চাই। এই নূতন বিভাগের সহিত বোঝা-পড়া করার শক্তি আমার আছে। যদি বোঝা-পড়া না করা হয়, তবে ভারতীয় সম্প্রদায় ত লুণ্ঠিত হইবেই, এ সম্প্রদায়কে এই স্থান হইতে বহিষ্কৃতও হইতে হইবে। সম্প্রদায়ের প্রতি হীন ব্যবহারও প্রতিদিনই বাড়িতে থাকিবে। মিঃ চেম্বারলেন আমার সহিত দেখা করিলেন না, সরকারী কর্ম্মচারীটি আমার সহিত অন্যায় ব্যবহার করিয়াছেন, এ সমস্ত অপমান-কর সন্দেহ নাই, কিন্তু সম্প্রদায়ের যে অপমান ভবিষ্যতের গর্ভে জমা আছে তাহার তুলনায় এ সকল কিছুই নয়। এ স্থানে কুকুরের মত থাকিতে হইবে ইহা সহ্য করা যায় না।"

এইরূপে আমি কার্য্যারম্ভ করিলাম। প্রিটোরিয়া ও জোহানেসবর্গ-বাসী ভারতীয় প্রধান প্রধান ব্যক্তিদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া অবশেষে জোহানেসবর্গে আফিস করিতে কৃত-নিশ্চয় হইলাম।

ট্রান্সভালে আমার ওকালতীর সনদ পাওয়ার সম্বন্ধে আশঙ্কা অবশ্যই ছিল। কিন্তু উকীল-মণ্ডল হইতে আমার আরজির বিরুদ্ধতা না হওয়ায় বড় আদালত আমার আরজি মঞ্জুর করিলেন।

ভারতীয়দের, উপযুক্ত স্থানে আফিস পাওয়া মুস্কিল ছিল। মিঃ রীচের সহিত আমার ভাল পরিচয় ছিল। সেই সময় তিনি সেখানে একজন ব্যবসাদার ছিলেন। তাঁহার পরিচিত বাড়ী-সংগ্রাহকের মারফতে আমি ভাল যায়গায় আফিস বাড়ী পাইলাম ও ওকালতী আরম্ভ করিয়া দিলাম।

৪

বর্দ্ধনশীল ত্যাগ-বৃত্তি

ট্রান্সভালে ভারতীয় সম্প্রদায়ের প্রাপ্য অধিকারের জন্য কি রকম ভাবে লড়িতে হইয়াছিল, ও এশিয়া-সম্পর্কিত বিভাগের কর্ম্মচারীর সহিত কি প্রকারে ব্যবহার করিতে হইয়াছিল, সে কথা বর্ণনার পূর্ব্বে আমার জীবনের অন্য দিকে দৃষ্টি দেওয়ার আবশ্যকতা আছে।

আজ পর্য্যন্ত আমি দুই রকম সঞ্চয় করিয়া আসিয়াছি—পরমার্থ ও স্বার্থ। আমার পরমার্থের সহিত স্বার্থের মিশ্রণ ছিল।

বোম্বাইয়ে যখন আফিস খুলিয়াছিলাম, তখন একজন বীমার দালাল আসিতেন। তাঁহার চেহারা সুন্দর ছিল। তাঁহার কথা মিষ্ট ছিল। ইনি পুরাতন বন্ধুর মতই আমার সহিত আমার ভবিষ্যৎ কল্যাণ সম্বন্ধে আলোচনা করিতেন। বলিতেন—"আমেরিকাতে ত তোমার অবস্থায় সকল মানুষই নিজের জীবনের বীমা করে। তোমারও তেমনি করিয়া ভবিষ্যতের জন্য সমস্ত স্থির করিয়া রাখা দরকার। জীবনের ভরসা ত কিছুই নাই। আমেরিকাতে আমরা বীমা করা ধর্ম্ম বলিয়াই গণ্য করি। একটা ছোট রকমের পলিসি করার ইচ্ছাও কি আমি তোমার ভিতরে জাগাইতে পারিব না?"

এ পর্য্যন্ত কি দক্ষিণ আফ্রিকাতে, কি ভারতবর্ষে কোথাও কোনও দালালের কথাই আমি গ্রাহ্য করি নাই। আমার মনে হইত, বীমা করায় কতকটা ভীরুতা ও ঈশ্বরের প্রতি অবিশ্বাস আছে। কিন্তু এইবার আমি

লালসায় পড়িলাম। সেই দালাল যখন কথা বলিতে থাকিত তখন আমার মনের সাম্‌নে পত্নী ও পুত্রের মূর্ত্তি আসিয়া উপস্থিত হইত। নিজেকে বলিতাম—"তুমি ত নিজের পত্নীর গহনা প্রায় সমস্তটাই বেচিয়া ফেলিয়াছ। যদি তোমার কিছু হয়, তবে পত্নীর ও ছেলেদের পালন করার ভার ত সেই গরিব ভাইয়ের উপরেই ফেলিবে, যে ভাই নিজের মহত্ত্ববশতঃ পিতার স্থান লইয়াছেন। কিন্তু কাজটা ত ঠিক হইবে না।" এই ধরণে নিজের মনের সহিত যুক্তি করিয়া আমি দশহাজার টাকার পলিসি করিলাম।

কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার স্থিতির পরিবর্ত্তনের সহিত আমার মতও বদলাইল। দক্ষিণ আফ্রিকায় বিপদ কালে আমি যে যে পদক্ষেপ করিয়াছি তাহা ঈশ্বর সাক্ষী রাখিয়াই করিয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় যে কতদিন কাটিবে,সে বিষয়ে আমার কোনও ধারণা ছিল না। আমার মনে হইল যে,আমি আর ভারতবর্ষে ফিরিয়া যাইতে পারিব না। সুতরাং আমার ছেলে-পেলেকে সঙ্গেই রাখা দরকার। তাহাদের ভরণ-পোষণও দক্ষিণ আফ্রিকা হইতেই হওয়া চাই। তাহাদের সহিত বিচ্ছিন্ন হইয়া আর এখন থাকা উচিত হইবে না। এইরূপ বিচার করার সঙ্গে সঙ্গেই সেই পলিশি আমার নিকট দুঃখদায়ক হইয়া উঠিল। বীমা-দালালের জালে পড়িয়াছিলাম বলিয়া আমার লজ্জা হইল। "ভাই যদি বাপের মতই হয়, তবে ছোট ভাইয়ের বিধবাকে ভার বলিয়া গণ্য করিবে ইহা কেমন কথা? পালন-কর্ত্তা তুমিও নহ, ভাইও নহেন, পালন-কর্ত্তা ঈশ্বর। বীমা করাইয়া তুমি তোমার ছেলে-পেলেকে পরাধীন করিয়াছ। তাহারা কেন স্বাবলম্বী হইবে না? অসংখ্য দরিদ্রের ছেলে-পেলের কি হয়? তুমি নিজেকে তাহাদেরই একজন বলিয়া কেন না গণ্য করিবে?"

বর্দ্ধনশীল ত্যাগ-বৃত্তি

এই প্রকার চিন্তার ধারা চলিতে লাগিল। কিন্তু তখনকার মত সে চিন্তা আমলে আনিলাম না। একবারকার দেয় বীমার টাকা দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে দিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ আছে।

কিন্তু এই চিন্তার প্রবাহে বাহির হইতেও উত্তেজনা পাইলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় প্রথমবার ভ্রমণ কালে আমি খৃষ্টীয় প্রভাবে আসিয়া ধর্ম্ম সম্বন্ধে জাগ্রত হইয়াছিলাম। এইবারে থিয়োসফিষ্টদের প্রভাবে আসিলাম। মিঃ রীচ থিয়োসফিষ্ট ছিলেন। তিনি আমাকে জোহানেসবর্গ সোসাইটীর সহিত সম্বন্ধ-যুক্ত করিলেন। আমি তাহার সভ্য অবশ্য হইলাম না। আমার মতভেদ ছিল। তাহা হইলেও থিয়োসফিষ্টদিগের প্রত্যেক গূঢ় প্রসঙ্গে আমি ছিলাম। তাঁহাদের সহিত প্রতিদিন ধর্ম্ম-চর্চ্চা করিতাম। তাঁহারা পুস্তক পাঠ করিতেন। তাঁহাদের মণ্ডলেও আমাকে বলিতে হইত। থিয়োসফিতে ভ্রাতৃ-ভাব বিকাশিত করা ও বর্দ্ধিত করাই মুখ্য বস্তু ছিল। এই বিষয়ে আমি খুব চর্চ্চা করিতাম এবং যখন সভ্যদের মধ্যে,যাহা তাঁহারা মানেন তাহার সহিত তাঁহাদের আচরণের প্রভেদ হইত দেখিতাম, তখন তাহার সমালোচনাও করিতাম। এই সমালোচনার প্রভাব আমার উপর ভাল রকমই হইয়াছিল। আমি আত্ম-নিরীক্ষণ করিতে লাগিলাম।

৫

আত্ম-নিরীক্ষণের পরিণাম

১৮৯৩ সালে আমি খৃষ্টান মিশনারীদিগের সহিত ঘনিষ্ট ভাবে মিশিবার সুযোগ পাই। তখন আমি কেবল শিক্ষার্থীর স্থিতিতে ছিলাম। খৃষ্টান মিত্রগণ আমাকে বাইবেলের সংবাদ শুনাইতেন, বুঝাইতেন, এবং যাহাতে উহা আমি গ্রহণ করি তাহার চেষ্টা করিতেন। আমি নম্রতার সহিত ও নির্ব্বিকার ভাবে তাঁহাদের শিক্ষা শুনিতাম ও বুঝিতাম। এই অবস্থায় আমি যথাশক্তি হিন্দু ধর্ম্ম অভ্যাস করিতে ও অপর ধর্ম্ম বুঝিতে চেষ্টা করিতাম। ১৯০৩ সালে এই স্থিতির কিঞ্চিৎ পরিবর্ত্তন হইল। থিয়োসফিষ্ট মিত্রগণ অবশ্য আমাকে তাঁহাদের মণ্ডলে টানিতে ইচ্ছা করিতেন, কিন্তু সে কেবল হিন্দু হিসাবে আমার নিকট হইতে কিছু পাওয়ার জন্য। থিয়োসফিষ্টদের পুস্তকে হিন্দু ধর্ম্মের ছায়া ও তাহার প্রভাব খুবই ছিল। সেই হেতু এই ভাইয়েরা মনে করিতেন যে, আমি তাঁহাদিগকে সাহায্য করিতে পারিব। আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইয়াছিলাম যে আমার সংস্কৃত জ্ঞান ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়, আমি হিন্দুদের প্রাচীন ধর্ম্ম-গ্রন্থ সংস্কৃতে পড়ি নাই, অনুবাদ হইতেও আমার পড়া খুবই কম। তাহা হইলেও তাঁহারা সংস্কার ও পুনর্জ্জন্ম মানিতেন বলিয়া আমার কাছে অল্প স্বল্প সাহায্যও পাওয়া যাইবে—এই রকম মনে করিতেন। আমি 'পাদপশূন্য দেশে এরণ্ড বৃক্ষের' ন্যায় হইলাম। কাহারও সহিত বিবেকানন্দের রাজযোগ, কাহারও সাথে মতিলাল নভু ভাইয়ের রাজযোগ, পড়িতে আরম্ভ করিলাম। এক

মিত্রের সহিত পাতঞ্জল যোগ-দর্শন পড়িতাম। অনেকের সাথেই গীতা পাঠ আরম্ভ হইল। 'জিজ্ঞাসু-মণ্ডল' নামে একটি ছোট রকমের মণ্ডল গঠন করিলাম এবং নিয়মিত পাঠাভ্যাস আরম্ভ হইল। গীতার উপর আমার প্রেম ও শ্রদ্ধা পূর্ব্ব হইতেই ছিল। এক্ষণে গভীরভাবে প্রবেশ করার আবশ্যকতা দেখিলাম। আমার কাছে গীতার দুই একখানা অনুবাদ ছিল। উহার সাহায্যে মূল সংস্কৃত বুঝিবার চেষ্টা করিলাম এবং প্রত্যহ এক অথবা দুই শ্লোক কণ্ঠস্থ করিতে লাগিলাম।

প্রাতঃকালে দাঁতন করার ও স্নান করার সময়টা কণ্ঠস্থ করার জন্য ব্যবহার করিতাম। দাঁতনে পনের মিনিট ও স্নানে বিশ মিনিট লাগিত। ইংরাজী রীতিতে দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া দাঁতন করিতাম। সামনের দেওয়ালে গীতার শ্লোক লিখিয়া আটকাইয়া দিতাম ও আবশ্যকমত দেখিতাম ও মুখস্থ করিতাম। মুখস্থ করা শ্লোক পরে স্নানের সময় পাকা হইয়া যাইত। ইহার মধ্যে পূর্ব্বেকার শ্লোকগুলি প্রত্যহই একবার করিয়া আওড়াইয়া লইতাম। এমনি করিয়া তের অধ্যায় মুখস্থ করিয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ আছে। কিন্তু অন্যান্য কাজ বাড়িয়া উঠায় বই মুখস্থের কাজে বাধা পড়িল। তারপর যখন সত্যাগ্রহের জন্ম হইল, সেই শিশুর লালনপালনের জন্যই আমার সমস্ত বিচার করার সময় কাটিতে লাগিল, আর সেই জন্যই আজও কাটিতেছে—এ কথা বলা যায়।

এই গীতাপাঠের প্রভাব আমার সহাধ্যায়ীদের উপর কি রকম হইয়াছিল তাঁহারাই তাহা জানেন। আমার পক্ষে ত পুস্তকখানি আচরণের এক মহান্ পথ-প্রদর্শক হইয়া পড়িল। ঐ পুস্তকখানি আমার ধর্ম্মসম্বন্ধীয় কোষগ্রন্থ হইয়া পড়িল। অজানা ইংরাজী শব্দ-

আঁমার কাছে ক্ষমা চাহিয়াছিলেন। তাঁহার পুত্রগণকে আমার ইচ্ছামত পালন করার জন্য আমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। আমার সহিত সাক্ষাতের জন্য নিজেও অধীর হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাকে আসিতে তার করিয়াছিলাম। কিন্তু আমাদের ভাগ্যে মিলন ছিল না। তাঁহার পুত্র সম্বন্ধেও তাঁহার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। তিনি দেশেই দেহত্যাগ করেন। পুত্রদিগের ভিতর তাহাদের পূর্ব্ব জীবনের ধারাই চলিতেছিল। তাহাদের পরিবর্ত্তন হইল না। আমি তাহাদিগকে আমার নিকট টানিয়া আনিতে পারিলাম না। ইহাতে তাহাদের দোষ নাই। স্বভাবকে কে পরিবর্ত্তন করিতে পারে? বলবান সংস্কারকে কে নাশ করিতে পারে? আমরা যদি মনে করি যে, আমাদের নিজেদের যে পরিবর্ত্তন হইয়াছে, যে বিশ্বাস আছে, তাহা আমাদের আশ্রিত ও সাথীদেরও হইতে হইবে, তবে তাহা মিথ্যা। মা বাপ হওয়ার দায়িত্ব কি কঠিন তাহা এই দৃষ্টান্ত হইতে কতক বুঝিতে পারা যায়।

নিরামিষ আহারের জন্য ত্যাগ

জীবনে যেমন ত্যাগের ও সাদাসিদাভাবে থাকার ভাব বাড়িতে লাগিল, যেমন ধর্ম্ম-জাগৃতি বাড়িতে লাগিল, তেমনি তাহার সঙ্গে সঙ্গেই নিরামিষ আহার ও তাহার প্রচারের ইচ্ছাও বাড়িতে লাগিল। প্রচারকার্য্যের একটি মাত্র পথ আমি জানি, তাহা হইতেছে—আচরণ করিয়া ও আচরণ সম্বন্ধে জিজ্ঞাসুর সহিত আলোচনা করিয়া।

জোহানেস্‌বর্গে এক নিরামিষ আহারের হোটেল ছিল। একজন ক্যুহ্নের জল-চিকিৎসায় বিশ্বাসী জারমান্ ইহা চালাইতেন। সেখানে আমি যাতায়াত আরম্ভ করিলাম এবং যত ইংরাজ মিত্রকে সেখানে লইয়া যাইতে পারিতাম, লইয়া যাইতাম। কিন্তু আমি দেখিলাম যে, হোটেল দীর্ঘ দিন চলিবে না। জারমান্‌টির অর্থের অভাব লাগিয়াই আছে। আমি যতটা পারিতাম সাহায্য করিতাম, কিছু পয়সাও খোয়াইয়াছিলাম। অবশেষে উহা বন্ধ হইয়া গেল। অনেক থিয়োসফিষ্টই নিরামিষাশী, কেহ বা পুরা কেহ বা অর্দ্ধেক। এই মণ্ডলে এক দুঃসাহসী মহিলা ছিলেন। দুঃসাধ্য কর্ম্মের প্রতি তাঁহার প্রবল আসক্তি ছিল। তিনি ভারি রকমের এক নিরামিষ আহার গৃহ বসাইলেন। এই মহিলার কলাবিদ্যার সখ ছিল, খরচার হাত বেশ ছিল, এবং হিসাবের জ্ঞান বিশেষ ছিল না। তাঁহার মিত্র সংখ্যাও ছিল অনেক। প্রথমতঃ ছোট রকমেই তিনি কার্য্য আরম্ভ করেন। কিন্তু কিছুদিন পরেই তিনি উহা বড় করা ও বড় বাড়ীতে লইয়া যাওয়া স্থির করিলেন

এবং আমার সাহায্য চাহিলেন। সে সময় তাঁহার হিসাব-পত্রের জ্ঞানের কোনও খবর আমি লই নাই। তাঁহার লাভ-লোকসানের হিসাব (এষ্টিমেট্) ঠিকই আছে ধরিয়া লইয়াছিলাম। আমার কাছে টাকার সুবিধা ছিল। অনেক মক্কেলের টাকা আমার কাছে থাকিত। তাঁহাদের মধ্যে একজনের অনুমতি লইয়া তাঁহার টাকা হইতে প্রায় একহাজার পাউণ্ড (১৫০০০৲ টাকা) তাঁহাকে দিলাম। এই মক্কেল বিশাল-হৃদয় এবং বিশ্বাসী ছিলেন। প্রথম এগ্রিমেণ্টে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তিনি তাঁহাদেরই একজন। তিনি বলিলেন—"ভাই, আপনার ইচ্ছা হয় ত টাকা দিয়া দিবেন। আমি কিছু জানি না। আমি ত আপনাকেই জানি।" তাঁহার নাম বদ্রী। তিনি সত্যাগ্রহে খুব বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে জেলেও যাইতে হইয়াছিল। তাঁহার ঐ প্রকার সম্মতির উপর আমি মহিলাটীকে টাকা ধার দিয়াছিলাম। দুই তিন মাসেই আমি বুঝিলাম যে, সে টাকা আর ফেরৎ পাওয়া যাইবে না। এত বড় লোকসান দেওয়ার শক্তি আমার ছিল না। আমার দ্বারা ঐ টাকার অন্যরূপ ব্যবহার হইতে পারিত। টাকা ফিরিয়া পাওয়া গেল না। কিন্তু বিশ্বাসী বদ্রীর টাকা খোয়া যায় কি করিয়া? সে ত আমাকেই জানিত। ঐ টাকা আমিই পূরণ করিলাম।

এক মক্কেল বন্ধুকে ঐ টাকার ব্যাপারের কথা বলিয়াছিলাম। তিনি আমাকে মিষ্ট কথায় গালি দিয়া কহিলেন—"ভাই, (দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমি মহাত্মা হই নাই, এমন কি বাপু বা বাবাও ছিলাম না। মক্কেল মিত্রটি আমাকে 'ভাই' বলিয়াই ডাকিতেন) এ কাজ তোমার করা উচিত হয় নাই। আমরা তো তোমার উপর নির্ভর করিয়াই চলি। ঐ টাকা তুমি ফিরিয়া পাইবে না। বদ্রীকে তুমি অবশ্যই বাঁচাইবে, আর নিজের টাকা

খোয়াইবে। কিন্তু এই রকমে তোমার সংস্কার কার্য্যে সকল মক্কেলের টাকা যদি দিতে থাক, তবে মক্কেলরা ত মরিবেই, তুমিও ভিখারী হইয়া ঘরে বসিবে। তোমার জন-সাধারণের জন্য কার্য্যও বন্ধ হইয়া যাইবে।"

সৌভাগ্যবশতঃ এই মিত্রটি বাঁচিয়া আছেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে অথবা অন্যত্র আমি তাঁহা অপেক্ষা অধিক স্বচ্ছ ব্যক্তি আর দেখি নাই। কাহাকেও যদি তিনি মনে মনে সন্দেহ করিয়া থাকেন এবং পরে বুঝিতে পারেন যে, তাঁহারই ঐরূপ করা দোষের হইয়াছে,তবে তৎক্ষণাৎ তিনি সেই ব্যক্তির নিকট ক্ষমা চাহিয়া নিজের আত্মাকে সাফ্ করিয়া ফেলেন। তাঁহার দেওয়া এই শিক্ষা আমার নিকট ঠিক বোধ হইল। বদ্রীর টাকা আমি ভরিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু যদি ঐ রকম আরও হাজার পাউণ্ড তখন খোয়া যাইত তাহা হইলে তাহা পূরণ করার শক্তি আমার আদৌ হইত না এবং আমাকে কর্জ্জ করিতেই হইত। এইরূপ কর্ম্ম আমার জীবনে আর কখনো করি নাই এবং উহার প্রতি আমার মনে সর্ব্বদাই একটা বিরক্তির ভাব রহিয়াছে। আমি দেখিলাম যে, সংস্কার করিবার জন্যও নিজের শক্তির বাহিরে যাওয়া উচিত নয়। সঙ্গে সঙ্গে আমি ইহাও বুঝিতে পারিলাম যে, ধারের কারবারের দ্বারা আমি গীতার নিষ্কাম কর্ম্ম করার মুখ্য শিক্ষার অনাদর করিয়াছি। আলোক স্তম্ভের উপরকার আলোক যেমন দূর হইতেই কোথায় বিপদ তাহা দেখাইয়া সতর্ক করিয়া দেয়, এই ভুল আমাকে তেমনি ভাবে সতর্ক করিয়া দিতেছে।

নিরামিষ আহার প্রচারের জন্য এই প্রকার অর্থ ত্যাগ করার কল্পনা আমার ছিল না। ইহা যেন আমাকে দিয়া জোর করিয়া পুণ্যসঞ্চয় করাইয়া লওয়া হইয়াছিল।

৭

মাটি ও জলের প্রয়োগে চিকিৎসা

জীবনে সাদাসিধা ভাব বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে রোগের জন্য ঔষধ ব্যবহারের প্রতি আমার যে বিরাগ পূর্ব্ব হইতে ছিল, তাহাও বাড়িতে লাগিল। যখন আমি ডারবানে ওকালতী করিতেছিলাম, তখন ডাক্তার প্রাণজীবনদাস মেহ্‌তা আমার সহিত সাক্ষাৎ করিতে আসিয়াছিলেন। ঐ সময় আমি বাতে ও দুর্ব্বলতায় কখন কখন ভুগিতেছিলাম। তিনি চিকিৎসা করিয়াছিলেন এবং তাহাতেই আমি ব্যাধিমুক্ত হই। তাহার পর দেশে ফিরিয়া আসা পর্য্যন্ত আমার কোনও বড় রকমের ব্যাধি হইয়াছিল বলিয়া স্মরণ নাই।

কিন্তু জোহানেসবর্গে আমার কোষ্ঠ-কাঠিন্য হইত এবং সে জন্য মাথা ধরিত। রেচক ঔষধ খাইয়া শরীর ঠিক রাখিতে হইত। উপযুক্ত পথ্য ত হামেশাই করিতাম কিন্তু তবুও আমি সম্পূর্ণ ব্যাধিমুক্ত হইতে পারি নাই। রেচক ব্যবহার হইতে মুক্তি পাইলে যে ভাল হয় এ কথাটা সর্ব্বদাই মনে হইত।

ম্যানচেষ্টারের "নো ব্রেকফাষ্ট এসোশিয়েশন" স্থাপনার বিষয় পড়িলাম। তাহার যুক্তি এই ছিল যে, ইংরাজেরা অনেকবারে এবং পরিমাণে অনেকটা করিয়া খায়, রাত বারোটা পর্য্যন্ত খাওয়া চলে। আর তাহারই ফলে তাহারা ডাক্তারের ঋণ শোধ করে। এই অবস্থা হইতে মুক্তি পাইতে হইলে প্রাতঃকালের 'ব্রেক্‌ফাষ্ট' আহার ছাড়িয়া দিতে হয়। ঐ কথা

মাটি ও জলের প্রয়োগে চিকিৎসা

আমার সম্বন্ধে পুরাপুরি বলা না যাইতে পারিলেও আংশিক ভাবে বলা যায়—এই প্রকার মনে হইল। আমি তিনবার পেট ভরিয়া খাইতাম এবং অপরাহ্ণে চাও খাইতাম। আমি কদাপি অল্পাহারী ছিলাম না। নিরামিষ ও মশলাহীন আহার্য্য যতটা স্বাদু করা যায় তাহা করিতাম। ছ'-সাতটা বাজার পূর্ব্বে কদাচিৎ ঘুম হইতে উঠিতাম। এই অবস্থায় আমার মনে হইল যে, যদি সকালের আহার ত্যাগ করি তবে মাথা ধরা হইতে অবশ্য মুক্তি পাইব। আমি সকালের খাওয়া ছাড়িয়া দিলাম। কতকটা কষ্ট অবশ্য হইয়াছিল, কিন্তু মাথাধরা সারিয়া গেল। ইহা হইতে আমি ধরিয়া লইলাম যে, আমার খোরাক প্রয়োজন অপেক্ষা অধিক ছিল

কিন্তু এই পরিবর্ত্তন দ্বারা কোষ্ঠ-কাঠিন্যের অভিযোগ মিটিল না। কূনের কটি-স্নানের প্রয়োগ লইলাম। তাহাতে অল্প কিছু আরাম আসিল বটে, কিন্তু তেমন বিশেষ কোনও পরিবর্ত্তন হইল না। ইতোমধ্যে সেই জারমান্ হোটেলওয়ালা অথবা অন্য কেহ আমার হাতে 'জষ্ট'এর 'রিটার্ণ টু নেচার' বা 'প্রকৃতির দিকে ফের' নামক পুস্তকখানি দিলেন। তাহাতে আমি মাটির প্রয়োগ সম্বন্ধে পড়িলাম। শুষ্ক ফল মেওয়া এবং টাট্‌কা ফল যে মানুষের স্বাভাবিক খাদ্য তাহা এই লেখক খুব সমর্থন করিয়াছেন। কেবল ফলাহারের উপর নির্ভর করা এই সময় গ্রহণযোগ্য বলিয়া মনে করি নাই, কিন্তু মাটির ব্যবহার তখনই সুরু করিলাম। উহাতে আমার আশ্চর্য্য ফল হইল। চিকিৎসা এই রকম ছিল ঃ—ক্ষেত হইলে সাফ্ কালো বালাল মাটি লইয়া তাহাতে উপযুক্ত পরিমাণ ঠাণ্ডা জল দিয়া সাফ পুরানো পাতলা কাপড়ে বিছাইয়া পেটের উপর পুল্টিসের মত লাগাইয়া ব্যাণ্ডেজ করা। এই ব্যাণ্ডেজ আমি রাত্রিতে শোওয়ার সময়

বাঁধিতাম এবং সকালে আর হয়ত বা রাত্রেই ফেলিয়া দিতাম। তাহাতেই আমার কোষ্ঠবদ্ধতা দূর হইল। তারপর হইতে আমার ও আমার অনেক সঙ্গীর উপর এই মাটির চিকিৎসা প্রয়োগ করিয়াছি এবং কদাচিৎ কাহারও বেলায় নিষ্ফল হইয়াছি বলিয়া স্মরণ হয়। দেশে ফিরিয়া আসার পর মাটির চিকিৎসা অনুরূপ নির্ভরতার সহিত করিতে পারিয়াছি বলিয়া মনে হয় না। পরীক্ষা করার জন্য এক জায়গায় স্থির হইয়া বসার মত অবসরও আমার হয় নাই। তাহা হইলেও মাটি ও জল দ্বারা চিকিৎসার বিষয়ে আমার শ্রদ্ধা বহুল অংশে প্রথমবারের মতই আছে। আজও কোন কোন ক্ষেত্রে আমি মাটির চিকিৎসার প্রয়োগ নিজের উপর করিয়া থাকি এবং প্রসঙ্গ উপস্থিত হইলে সাথীদিগকেও পরামর্শ দিয়া থাকি। এ জীবনে দুইবার কঠিন পীড়া ভোগ করার পরও আমি বিশ্বাস করি যে, মানুষের ঔষধ খাওয়ার কদাচিৎ আবশ্যক আছে। পথ্য, জল, মাটি ইত্যাদির ঘরোয়া চিকিৎসার দ্বারাই হাজারের মধ্যে নয় শত নিরানব্বইটা রোগ ভাল হইতে পারে। সর্ব্বদা বৈদ্য, হকীম ও ডাক্তারের নিকট দৌড়াইয়া এবং শরীরটাকে প্রচুর ঔষধ ও রসায়ন পূর্ণ করিয়া মানুষ নিজের জীবনকাল খাটো করিয়া ফেলে। কেবল তাহাই নহে, মানুষ মনের উপর অধিকারও হারাইয়া ফেলে। সেইজন্য মনুষ্যত্বও হারায় এবং শরীরের স্বামী না হইয়া শরীরের গোলাম হয়।

রোগশয্যায় পড়িয়াই আমি ইহা লিখিতেছি বলিয়া কেহ যেন ইহা অগ্রাহ্য না করেন। আমার পীড়ার কারণ আমি জানি। আমার দোষের জন্যই যে আমি রোগে পড়ি, সে বিষয়েও আমার পুরাপুরি জ্ঞানও বোধ আছে। এই প্রকার বোধ আছে বলিয়াই আমি ধৈর্য্য হারাইয়া ফেলি নাই। রোগকে আমি ঈশ্বরের অনুগ্রহ বলিয়া মনে করি

এবং অনেক ঔষধ করার লালসা হইতে দূরে থাকি। আমি জানি, আমি আমার একরোখামি দ্বারা আমার ডাক্তার বন্ধুদের বিরক্তি উৎপাদন করিয়া থাকি, কিন্তু তাঁহারা উদারতার সহিত আমার জেদ সহ্য করেন এবং আমাকে ত্যাগ করেন না।

কিন্তু আমার এখনকার কথায় তখনকার কথা যেন চাপা না পড়ে। ইহা আমার ১৯০৪ সালের কথা।

আরো অগ্রসর হওয়ার পূর্ব্বে পাঠককে কিছু সাবধান করা আবশ্যক। ইহা পড়িয়া যদি কেহ 'জষ্টের' পুস্তক ক্রয় করেন, তবে তিনি যেন তাঁহার প্রত্যেক কথা বেদবাক্য বলিয়া গ্রহণ না করেন। সকল লেখাতেই লেখকের অনেক অংশে একদেশদর্শিতা থাকে। প্রত্যেক বস্তুই নানা দিক্ হইতে দেখা যাইতে পারে, এবং সেই সেই দৃষ্টিতে সেই বস্তু সত্য হইলেও সে সকলের প্রত্যেকটি একই সময় একই অবস্থায় সত্য নয়। আবার অনেক পুস্তকে, বিক্রয়ের জন্য বা নাম-যশের জন্য লেখা হয় বলিয়া, দোষ থাকিয়া যায়। ইহা স্মরণ রাখিয়া ঐ সকল পুস্তক পড়িতে হয়, এবং বিচার করিয়া পড়িতে হয়। আর যদি কেহ উহার কোনও ব্যবস্থা কার্য্যে প্রয়োগ করিতে চান, তবে তাহার পূর্ব্বে হয় তাহার কোনও অভিজ্ঞ ব্যক্তির পরামর্শ লওয়া উচিত, নতুবা ধৈর্য্য সহকারে লিখিত বিষয় পড়িয়া উহা পরিপাক করিয়া তবে প্রয়োগ করা উচিত।

৮

সাবধানতা

আমার আত্মকথার প্রসঙ্গ পরের অধ্যায় পর্য্যন্ত বন্ধ রাখিয়া অন্য কথা বলিতে হইতেছে।

পূর্ব্বের অধ্যায়ে মাটির প্রয়োগ সম্বন্ধে যাহা লিখিয়াছি তাহাতে আমার আহারের বিষয়ও ছিল। ঐ বিষয় এখন কিছু লিখিয়া ফেলা উচিত মনে করি। উহা পুনরায় প্রসঙ্গ-ক্রমে ভবিষ্যতেও আসিবে।

আহার ও তৎসম্বন্ধে বিচার এই অধ্যায়ে বিস্তারিত ভাবে করিব না। দক্ষিণ আফ্রিকায় 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' কাগজে প্রকাশিত এই বিষয়ের সম্পর্কে আমার সমস্ত লেখা "আরোগ্য সাধন" (Guide to health) নামক পুস্তকে বিস্তৃত ভাবে দেওয়া হইয়াছে। আমার ছোট ছোট পুস্তকের ভিতর এই বইখানা পশ্চিমে ও এদেশে সর্ব্বাপেক্ষা বেশী প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছে। তাহার কারণ আমি আজ পর্য্যন্তও বুঝিতে পারি নাই। এই পুস্তক কেবল 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' পাঠকদের জন্য লেখা হইয়াছিল। কিন্তু উহার আশ্রয় লইয়া অনেক ভাই ও ভগ্নী নিজেদের জীবনের পরিবর্ত্তন করিয়াছেন এবং আমার সহিত পত্র-ব্যবহারও চালাইতেছেন। সেই জন্য ঐ পুস্তক সম্বন্ধে এই স্থানে কিছু লেখা আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

যদিও ঐ পুস্তকের লিখিত বিষয়ের সম্বন্ধে সিদ্ধান্তের পরিবর্ত্তন করার আবশ্যক আমি অনুভব করি নাই, তথাপি আমি ব্যবহারের বেলায়

প্রয়োজন অনুসারে কিছু অদল-বদল করিয়াছি। পুস্তকের সকল পাঠক তাহা জানেন না। সেই সকল পরিবর্ত্তনের বিষয় তাহাদিগকে এই সুযোগে জানানো দরকার।

আমার অন্যান্য পুস্তকের মতই এ পুস্তকখানাও আমি কেবল ধর্ম্ম-ভাবনা হইতেই লিখিয়াছি, এই ধর্ম্ম-ভাবনা হইতেই আজ পর্য্যন্ত আমি আমার প্রত্যেক কার্য্য করিয়া আসিতেছি। তাহা হইলেও উহার কয়েকটি বিচার আমি আজ পর্য্যন্তও ব্যবহারে প্রয়োগ করিতে পারি নাই বলিয়া আমার খেদ আছে, আমার মনে লজ্জা আছে।

আমার দৃঢ় বিশ্বাস এই যে, মানুষের বাল্যকাল পর্য্যন্তই মাতার দুধ পান করা আবশ্যক। তাহার পরে অন্য দুধের আবশ্যকতা নাই। মানুষের খাদ্য বনজাত পাকা বা শুষ্ক ফল ছাড়া আর কিছু নহে। বাদামাদির বীজ হইতে এবং দ্রাক্ষাদি ফল হইতে মানুষের শরীরের ও বুদ্ধির পূর্ণ পোষণ মিলিতে পারে। এই প্রকার খাদ্যের উপর যে থাকে তাহার পক্ষে ব্রহ্মচর্য্যাদি আত্মসংযম খুব সহজ বস্তু। 'মানুষ যেমন খায় তেমনি হয়' এই প্রবাদ বাক্যে যথেষ্ট সত্য আছে—এ কথা আমি ও আমার সাথীরা অনুভব করিয়া থাকি।

এই বিচার আরোগ্য-সাধন পুস্তকে বেশ ভাল করিয়া সমর্থন করা হইয়াছে। কিন্তু ভারতবর্ষে আসিয়া আমি উহার প্রয়োগের সম্পূর্ণতায় পঁহুছিতে পারি নাই। খেড়া জিলায় সিপাহী ভর্ত্তির কার্য্য করিতে করিতে আমার পথ্যের ভুলে আমি মরিতে বসিয়াছিলাম। দুধ ব্যতীত বাঁচিয়া থাকিতে আমি বহু ব্যর্থ চেষ্টা করিয়াছি। যে সব বৈদ্য, ডাক্তার, রসায়ন-শাস্ত্রীর সহিত আমার পরিচয় ছিল, তাহাদের সাহায্যে দুধের পরিবর্ত্তে অন্য কিছু ব্যবহার করা যায় কিনা

তাহা খুঁজিয়া বাহির করিতে আমি চেষ্টা করিয়াছি। কেহ বা মুগের জল, কেহ বা মহুয়ার তেল, কেহ বা বাদামের দুধের উল্লেখ করিয়াছেন। এই সকল দ্রব্যই প্রয়োগ করিয়া আমি শরীরকে ক্লিষ্ট করিতেছিলাম, কিন্তু আমি উহাদের সাহায্যে রোগশয্যা হইতে মুক্তিলাভ করিতে পারি নাই।

বৈদ্যেরা আমাকে চরক ইত্যাদি হইতে শ্লোক শুনাইয়াছেন যে, ব্যাধি দূর করার জন্য খাদ্যাখাদ্যের বাধা নাই ও মাংসাদিও খাওয়া যাইতে পারে। সুতরাং এই প্রকার বৈদ্যের পক্ষে দুধের পরিবর্তে শরীর রক্ষার উপযোগী অন্য কোনও বস্তুর সন্ধান দেওয়া সম্ভবপর নহে। যে চিকিৎসায় 'বিফ্-টি' (গোমাংসের রস হইতে চা) এবং ব্রাণ্ডি মদের স্থান আছে, তাহাতে দুধের পরিবর্তে অন্য যে বস্তুর সাহায্যে শরীর রক্ষা করা চলে, তাহার নির্দেশ কি প্রকারে মিলিবে? গাভী বা মহিষের দুধ ত পান করিতেই পারিব না, কেন না আমি ব্রত লইয়াছিলাম। ব্রতের জন্য দুধমাত্রই ত্যাগ করিতে হইয়াছিল। কিন্তু ব্রত লওয়ার সময় আমার মনের সাম্‌নে গো-মাতা ও মহিষ-মাতাই ছিল, এই জন্য আমি বাঁচিবার জন্য যেমন তেমন করিয়া মনকে ফুসলাইলাম। ব্রতের কথার শব্দগত মানে মাত্র পালন করিয়া আমি ছাগলের দুধ লওয়া স্থির করিলাম। ছাগ-মাতার দুধ খাওয়ার সময় আমি আমার ব্রতের আত্মার হত্যা করিলাম। জানিয়া শুনিয়াই দুধ খাইলাম। আমাকে 'রাউলাট অ্যাক্ট' লইয়া যুঝিতে হইবে, এই মোহ আমাকে পাইয়া বসিয়াছিল। তাহা হইতেই বাঁচিবার আকাঙ্ক্ষা হইয়াছিল এবং সেই জন্য জীবনে যাহা একটা মহাপরীক্ষা বলিয়া গণ্য করিয়াছিলাম, তাহা বন্ধ লইল।

সাবধানতা

খাওয়া দাওয়ার সাথে আত্মার সম্বন্ধ নাই, আত্মা আহার করে না এবং পান করে না, যাহা পেটে যায় তাহাতে তাহার লাভ-ক্ষতি নাই; কিন্তু যে বাক্য ভিতর হইতে বাহির হয় তাহাতেই লাভ-ক্ষতি হয় ইত্যাদি যুক্তি আমি জানি। ইহাতে তথ্যাংশ আছে। কিন্তু যুক্তির ভিতর না নামিয়া এখানে আমার দৃঢ় বিশ্বাসের কথা বলিতেছি। যে ব্যক্তি ঈশ্বরের ভয় করিয়া চলিতে চায়, যাহার ঈশ্বরকে প্রত্যক্ষ দর্শন করার ইচ্ছা আছে, এমন সাধক ও মুমুক্ষুর পক্ষে, কোন্ বাক্য বলিতে হইবে ও কোন্ বাক্য ত্যাগ করিতে হইবে, কোন্ ভাব গ্রহণ করিতে হইবে ও কোন্ ভাব বর্জন করিতে হইবে তাহা যেমন বিচার করিয়া স্থির করা আবশ্যক, খাদ্য সম্বন্ধেও ঠিক ততটাই বিচার করিয়া, কোন্ খাদ্য ত্যাগ করিতে হইবে, আর কোন্ খাদ্য গ্রহণ করিতে হইবে, তাহাও স্থির করা আবশ্যক।

কিন্তু যে বিষয়ে আমি নিজেই অকৃতকার্য্য হইয়াছি, ব্যর্থ হইয়াছি, সেই বিষয়ে অপরকে আমার যুক্তির উপর চলিতে আমি পরামর্শ দিতে পারি না। কেবল তাহাই নহে, তাঁহাদিগকে আমি সে পথ গ্রহণে নিষেধও করিতে চাই। সেই হেতু 'আরোগ্য-সাধন' পুস্তকের উপর নির্ভরশীল সমস্ত ভাই-ভগ্নীকে আমি সাবধান করিয়া দিতেছি। দুধ ত্যাগ করা যদি সর্ব্বাংশে লাভজনক বলিয়া মনে হয়, অথবা অভিজ্ঞ বৈদ্য বা ডাক্তার যদি পরামর্শ দেন তবেই দুধ ত্যাজ্য, নচেৎ কেবল আমার পুস্তকের কথার উপর নির্ভর করিয়া কেহ যেন দুধ ত্যাগ না করেন। এখন পর্য্যন্ত আমার অভিজ্ঞতা এই যে, যাহার হজম শক্তি মন্দ হইয়াছে, অথবা যে শয্যাগত হইয়াছে তাহার পক্ষে দুধ ব্যতীত হাল্কা অথচ পুষ্টিকর খাদ্য আর কিছু নাই।

এই অধ্যায় পাঠ করার পর কোনও বৈদ্য, ডাক্তার, হকীম বা এই বিষয়ে অভিজ্ঞ অন্য কোনও ব্যক্তি যদি দুধের পরিবর্তে দুধের মত পুষ্টিকর ও পাচক কোনও ভেষজ বস্তুর বিষয় জানেন, বহি পড়িয়া নহে, ব্যবহারিক অনুভবের ফলে জানেন, তবে সে কথা আমাকে জানাইলে আমার উপকার করা হইবে।

৯

পরিস্থিতির সম্মুখীন

এক্ষণে এশিয়ার আমদানী কর্ম্মচারীদের দিকে দৃষ্টিপাত করা যাক্। এশিয়া-সম্পর্কিত কর্ম্মচারীদের মধ্যে ও বৃহৎ স্থান ছিল জোহানেসবর্গ। তাঁহারা মনে করিতেন যে, ভারতীয়, চীনা ইত্যাদির রক্ষণের জন্য নয় পরন্তু ভক্ষণের জন্যই তাঁহারা সেখানে আছেন। আমার নিকট রোজ এই মর্ম্মে অভিযোগ আসিত যে—"যাহার ট্রান্সভালে ফিরিয়া আসার বাস্তবিক দাবী আছে সে প্রবেশ করিতে পারিতেছে না, অথচ যাহার কোনও দাবী নাই সে এক একশ' পাউণ্ড ঘুষ দিলেই আসিবার অনুমতি পাইতেছে। ইহার প্রতিকার তুমি যদি না কর তবে কে করিবে?" কথাটা আমারও ঠিক মনে হইল। যদি এই অন্যায় ব্যবস্থা না দূর করিতে পারি তবে আমার ট্রান্সভালে বাস করা বৃথা।

আমি সাক্ষী সংগ্রহ করিতে লাগিলাম। অনেকগুলি সাক্ষ্য জমিল। এইবার আমি পুলিশ-কমিশনারের নিকট গেলাম। তাঁহার ভিতরে দয়া ও ন্যায়ের ভাব ছিল বলিয়া মনে হয়। আমার কথা পাল্টাইয়া ফেলিয়া দেওয়ার বদলে তিনি ধৈর্য্য ধরিয়া শুনিলেন এবং আমাকে সাক্ষ্য দেখাইতে বলিলেন। সাক্ষীদিগকে নিজেই তিনি পরীক্ষা করিলেন। তাঁহার বিশ্বাস হইল। কিন্তু আমি জানিতাম আর তিনিও জানিতেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকাতে গোরা জুরীর দ্বারা গোরা অপরাধীকে দণ্ড দেওয়া মুস্কিল। তিনি বলিলেন—"তবুও আমরা চেষ্টা ত করিব। দোষীদিগকে জুরী ছাড়িয়া দিবে এই ভয়ে তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইবে না—ইহা ঠিক নয়।

আমি তাহাদিগকে গ্রেপ্তার করিব। আমি চেষ্টারও ত্রুটি করিব না,—এ কথা আপনাকে দিতেছি।"

আমার আশ্বাসের আবশ্যক ছিল না। অনেক কর্ম্মচারীর উপরেই সন্দেহ ছিল। কিন্তু তাহাদের বিরুদ্ধে আমার নিকট তেমন অকাট্য প্রমাণ ছিল না। যে দুইজনের সম্বন্ধে অনুমাত্রও সন্দেহ ছিল না সেই দুইজনের উপর ওয়ারেণ্ট বাহির করা হইল।

আমার চলা-ফেরা লুকানো ছিল না। আমি যে প্রায় রোজই পুলিশ-কমিশনারের নিকট যাইতেছি তাহা অনেকেই দেখিয়াছিলেন। এই দুই কর্ম্মচারীরও ছোট বড় চর ছিল। তাহারা আমার আফিসের উপর পাহারা রাখিত এবং আমার যাতায়াতের খবর সেই আমলাদারদিগকে দিত। এখানে একথাও বলা দরকার যে, এই কর্ম্মচারীদ্বয়ের প্রতি সকলের ঘৃণা এতই গভীর ছিল যে, বেশী চর পাওয়াও তাহাদের পক্ষে সম্ভব ছিল না। যদি ভারতবাসীরা ও চীনারা আমাকে সাহায্য না করিত তবে ইহাদিগকে কখনও গ্রেপ্তার করা যাইত না।

এই দুইজনের মধ্যে একজন ফেরার হইল। পুলিশ-কমিশনার বাহিরে ওয়ারেণ্ট পাঠাইয়া তাহাকে ধরিয়া আনিলেন। মোকদ্দমা চলিতে লাগিল। সাক্ষীও ভালই ছিল। তাহা হইলেও এবং একজন যে ফেরার হইয়াছিল তাহা সত্ত্বেও জুরীর নিকট সাক্ষ্য দেওয়ার পর উভয়েই খালাস পাইল।

আমি খুব নিরাশ হইলাম। পুলিশ-কমিশনারও দুঃখিত হইয়াছিলেন। উকীলের ব্যবসার প্রতি আমার ধিক্কার উপস্থিত হইল। বুদ্ধির প্রয়োগে দোষ ঢাকা হইতেছে দেখিয়া বুদ্ধির উপরেই বিরাগ আসিল।

এই দুই কর্ম্মচারীর অপরাধ এতই প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল যে,

তাহারা খালাস পাইলেও গবর্ণমেণ্ট তাহাদিগকে কাজে রাখিতে পারিলেন না। উভয়েই বরখাস্ত হইল এবং এশিয়া সম্পর্কিত বিভাগটাও কতকটা সাফ্ হইল। সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন ধৈর্য্য আসিল, সাহসও দেখা দিল।

আমার প্রতিষ্ঠা বাড়িল, আমার ব্যবসাও বাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে সম্প্রদায়ের যে শত শত পাউণ্ড ঘুষে যাইত তাহাও অনেকটা বাঁচিল। সব বাঁচিল এমন কথা বলা যায় না। অসৎ লোকেরা তবুও ব্যবসা চালাইতেছিল। তবে সৎ লোকেরা সততা বজায় রাখিতে পারিতেছিল—একথা বলা যায়।

আমি বলিতে পারি যে, এই কর্ম্মচারীরা অত্যন্ত অধম হইলেও তাহাদের বিরুদ্ধে ব্যক্তিগত বিদ্বেষ ভাব আমার কিছুই ছিল না। আমার এই স্বভাব তাহারাও জানিত এবং যখন তাহারা দুরবস্থায় পড়িয়া আমার নিকট সাহায্যের জন্য আসিল, তখন আমি সাহায্যও করিয়াছিলাম। জোহানেসবর্গের মিউনিসিপ্যালিটিতে আমি যদি বিরোধ না করি তবে তাহাদের চাকুরী মিলিবে এমন একটা অবস্থার উদ্ভব হয়। তাহাদের এক বন্ধু আমার সহিত দেখা করে এবং তাহাদের চাকুরী পাওয়ার সাহায্য করিতে আমি প্রতিশ্রুত হই। তাহাদের চাকুরী হইয়াছিল।

এই ঘটনার প্রভাব এই হইল যে, যে-সকল গোরার সম্পর্কে আমি আসিতাম তাহারা আমার সম্বন্ধে নির্ভয় হইতে লাগিল এবং যাহাদের বিভাগে গিয়া আমাকে অনেক সময় লড়িতে হইত, কড়া কথা বলিতে হইত, তাহারা তাহা সত্ত্বেও আমার সহিত মধুর সম্বন্ধ রাখিয়াছিলেন। এই প্রকার আচরণ যে আমার পক্ষে স্বাভাবিক তাহা আমার সে সময় সম্যক উপলব্ধি ছিল না। এই ব্যবহারের ভিতর সত্যাগ্রহের বীজ ছিল, ইহা অহিংসারই অঙ্গ-বিশেষ—একথা আমি পরে বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ

মানুষ ও তাহার কার্য্য—এই দুই ভিন্ন বস্তু। ভাল কার্য্যের প্রতি অনুরাগ এবং মন্দ কার্য্যের প্রতি বিতৃষ্ণা বোধ হওয়া উচিত। ভালই হোক আর মন্দই হোক, কার্য্যের যে কর্ত্তা তাহার প্রতি ভাল কার্য্যের জন্য শ্রদ্ধা এবং মন্দ কার্য্যের জন্য দয়ার ভাব রাখা সঙ্গত। একথা বোঝা সহজ হইলেও ব্যবহারের সময় ইহার খুবই কম প্রয়োগ হয়, আর সেই জন্যই এই জগতে বিদ্বেষের বিষ ছড়াইয়া পড়ে।

সত্যের অনুসন্ধানের মূলে এই অহিংসা আছে। আমি ইহা প্রতিক্ষণ অনুভব করিতেছি যে, যদি অহিংসার ব্যবহার না হয় তবে, সত্য লাভ হয় না। তন্ত্র বা ব্যবস্থার সহিত ঝগড়া শোভা পায়। কিন্তু যদি তন্ত্রী বা ব্যক্তির সহিত ঝগড়া করা হয় তবে তাহা নিজের সঙ্গেই ঝগড়া করার তুল্য হয়। কেননা সকলেই একই সূত্রে গ্রথিত, সকলেই একই প্রজাপতির সন্তান। ব্যক্তির মধ্যে অনন্ত শক্তি রহিয়াছে। ব্যক্তির অনাদরে বা তিরস্কারে সেই শক্তিরই অনাদর করা হয় এবং তাহাতে যেমন সেই ব্যক্তির ক্ষতি হয়, তেমনি তাহার সাথে সারা জগতেরও ক্ষতি হয়।

১৩

পুণ্য-স্মৃতি ও প্রায়শ্চিত্ত

আমার জীবনে এমন সকল ঘটনা ঘটিয়াছে যে, তাহা দ্বারা আমি অনেক ধর্মের ও অনেক জাতির সহিত গভীর পরিচয়ে আসিতে পারিয়াছি। এই সকল অভিজ্ঞতা হইতে একথা বলা যায় যে, আমি আত্মীয় এবং অনাত্মীয়, দেশী ও বিদেশী, সাদা ও কালো, হিন্দু ও মুসলমান অথবা খৃষ্টান, পারসী কি ইহুদীর মধ্যে ভেদ রাখি নাই। আমি একথা বলিতে পারি যে, আমার হৃদয় এই প্রকার ভেদ রাখিতেই অপারগ। এই বস্তুকে আমার সম্বন্ধে একটা গুণ বলিয়া মানি না। কেননা এই অভেদভাব বিকাশ করিতে আমাকে কোনও প্রযত্ন করিতে হয় নাই। উহা আমার প্রকৃতিগত। তুলনায় আমি দেখি যে—অহিংসা, ব্রহ্মচর্য, অপরিগ্রহ ইত্যাদি গুণ বিকশিত করার জন্য আমাকে প্রতিনিয়ত চেষ্টা করিতে হইতেছে এবং সেই চেষ্টার সম্বন্ধে আমার পরিপূর্ণ বোধ রহিয়াছে।

যখন আমি ডারবানে ওকালতী করিতাম তখন অনেক সময় আমার সহিত আমার কেরাণীরা বাস করিতেন। তাঁহারা হিন্দু বা খৃষ্টান ছিলেন, অথবা যদি প্রদেশ অনুসারে ধরা যায় তবে গুজরাটী বা মাদ্রাজী ছিলেন। তাঁহাদের সম্বন্ধে ভেদ-ভাব উপস্থিত হওয়ার কথা আমার স্মরণ নাই। তাঁহাদিগকে আমি পরিবার-ভুক্ত বলিয়া মনে করিতাম ও যদি আমার স্ত্রীর দিক হইতে উহাতে কোনও বাধা আসিত তবে তাঁহার সহিত লড়িতাম। একজন কেরাণী খৃষ্টান ছিলেন। তাঁহার পিতামাতা পঞ্চম

অর্থাৎ অস্পৃশ্য জাতীয় ছিলেন। আমাদের গৃহ-গঠন ইউরোপীয় ধরণের ছিল। কামরায় নর্দ্দমা ছিল না—থাকার দরকারও নাই, একথা আমি মানি। সেই জন্য প্রত্যেক কামরাতেই প্রস্রাব করার জন্য পাত্র রাখা হইত। উহা সাফ্ করার কাজ চাকরদের ছিল না, আমাদের স্বামী-স্ত্রীরই ঐ কাজ ছিল। কেরাণীদিগের মধ্যে যাহারা নিজদিগকে বাড়ীর লোক মনে করিত তাহারা নিজ নিজ প্রস্রাবের পাত্র সাফ্ করিত সত্য, কিন্তু এই অস্পৃশ্য বংশের কেরাণীটি নূতন আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাঁহার প্রস্রাবের পাত্র আমাদেরই সাফ্ করা উচিত বলিয়া মনে করিলাম। অন্যের বাসন ত কস্তুর-বাঈ-ই সাফ্ করিতেন, কিন্তু এইবার অস্পৃশ্যের প্রস্রাব সাফ্ করার বেলায় তাহা তাঁহার সহ্যের সীমার বাহিরে গেল। আমাদের মধ্যে কলহ হইল। আমি সাফ্ করিব ইহা তিনি সহ্য করিতে পারেন না, আর নিজেরও সাফ্ করা কঠিন। আমি আজও দেখিতেছি—কস্তুর-বাঈ বাসন হাতে করিয়া তাঁহার রক্তবর্ণ চক্ষুর দৃষ্টিতে আমাকে বিদ্ধ করিয়া সিঁড়ি দিয়া নামিতেছেন, তাঁহার চক্ষু হইতে মুক্তা-ফলের ন্যায় অশ্রু-বিন্দু ঝরিতেছে।

কিন্তু আমি যেমন প্রেম-পরায়ণ তেমনি নিষ্ঠুর, স্বামী ছিলাম। আমি নিজেকে তাঁহার শিক্ষক বলিয়া মনে করিতাম এবং আমার অন্ধ প্রেমের বশীভূত হইয়া সকল রকমে তাঁহাকে জ্বালাতন করিতাম। কেবল বাসন উঠাইয়া লওয়াতেই আমার সন্তোষ হইল না। তিনি হাসি মুখে লইয়া গেলে তবেই আমার সন্তোষ হইত। এই জন্য আমি দুই কথা উচ্চস্বরে শুনাইয়া দিলাম। "এই ঝকমারি আমার ঘরে চলিবে না"—বলিয়া আমি হুঙ্কার দিয়া উঠিলাম।

এই বাক্য তীরের ন্যায় তাঁহাকে বিঁধিল।

স্ত্রীও চীৎকার করিয়া উঠিলেন—"তাহা হইলে তোমার ঘর তোমারি থাকুক, আমি চলিয়া যাই।"

আমি আত্ম-বিস্মৃত হইলাম। দয়ার বিন্দুমাত্রও আমার ভিতর অবশিষ্ট রহিল না। আমি তাঁহার হাত ধরিলাম। সিঁড়ির সাম্‌নেই বাহিরে যাওয়ার দরজা ছিল। আমি সেই নিরুপায় অবলাকে ধরিয়া দরজা পর্য্যন্ত টানিয়া লইয়া গেলাম। দরজার অর্দ্ধেক খুলিলাম।

চোখ দিয়া তাঁহার গঙ্গা-যমুনার ধারা বহিয়া যাইতেছিল; কস্তুর-বাঈ বলিলেন—"তোমার ত লজ্জা নাই, আমার আছে। একটু লজ্জিত হও। আমি বাহিরে গিয়া কোথায় যাইব? এখানে ত আমার মা বাপ নাই যে, তাঁহাদের কাছে আশ্রয় লইব। আমি মেয়েমানুষ বলিয়াই তোমার লাথি খাইয়াও আমাকে থাকিতে হইবে। এখন তোমার সরম আসুক, দরজাটা বন্ধ কর। কেহ দেখে ত দুইজনের একজনেরও পক্ষে তাহা শোভন হইবে না।"

আমার মুখ লাল রহিল, কিন্তু সত্যই লজ্জিত হইলাম। দরজা বন্ধ করিলাম। স্ত্রী যদি আমাকে ছাড়িতে না পারেন তবে আমিই বা তাঁহাকে ছাড়িয়া কোথায় যাইব? আমাদের মধ্যে কলহ বহুবার ঘটিয়াছে এবং পরিণামও তাহার প্রত্যেক বারেই শুভ হইয়াছে। পত্নীই তাঁহার অদ্ভুত সহ্য-শক্তি দ্বারা জয়লাভ করিতেন।

এই বর্ণনা আমি এখন নির্ব্বিকার ভাবে করিতে পারিতেছি, কেননা এই ঘটনা আমার জীবনের অতীত যুগের। আজ আমি মোহান্ধ পতি নই, শিক্ষকও নই। আজ ইচ্ছা করিলে কস্তুর-বাঈ আমাকে ধমকাইতে পারেন। আজ আমরা পরীক্ষিত মিত্র। একে অন্যের প্রতি অনাসক্ত

হইয়া একত্র বাস করিতেছি। আমার পীড়ার সময় ইনি নিঃস্বার্থ সেবা করিয়া আসিতেছেন।

উপরের ঘটনা ১৮৯৮ সালে ঘটিয়াছিল। তখন ব্রহ্মচর্য্য পালন সম্বন্ধে আমি কিছুই জানিতাম না। সে সময় এ জ্ঞানও আমার স্পষ্ট ছিল না যে, পত্নী কেবল মাত্র সহধর্ম্মিণী, সহচারিণী এবং সুখ-দুঃখেরই সাথী। তখন ভাবিতাম, পত্নী ভোগের সামগ্রী, পতির আজ্ঞা যাহাই হোক তাহাই পালন করিবার জন্য সৃষ্ট। তাই ঐ রকম আচরণও করিতাম।

১৯০০ সাল হইতে আমার ধারণায় গভীর পরিবর্ত্তন হয়। ১৯০৬ সালে এই পরিবর্ত্তন শেষ পরিণামে পঁহুছে। যথাস্থানে এ বিষয়ের চর্চ্চা করিব।

এখানে এই পর্য্যন্ত জানানোই যথেষ্ট যে, ক্রমে ক্রমে যেমন প্রবৃত্তির তাড়না হইতে আমি মুক্তি লাভ করিয়াছি, সঙ্গে সঙ্গে তেমনি আমার সংসার নির্ম্মল, শান্ত ও সুখী হইয়াছে এবং আজও হইতেছে।

এই পুণ্যময় স্মৃতি হইতে কেহ যেন একথা না মনে করেন যে, আমরা আদর্শ দম্পতি, অথবা আমার ধর্ম্ম-পত্নীর কোনও দোষ নাই, অথবা আমাদের উভয়ের আদর্শ একই। কস্তুর-বাঈয়ের কোনও স্বতন্ত্র আদর্শ আছে কিনা বেচারা তাহাও জানেন না। হয়ত আমার সকল আচরণ তাঁহার আজিও পছন্দ হয় না। এ বিষয়ে আমি কদাপি চর্চ্চা করি না, করিয়া লাভ নাই। তাঁহার শিক্ষা তাঁহার পিতা-মাতা দেন নাই, আর সময় মত আমিও দিই নাই। কিন্তু তাঁহার ভিতর একটা গুণ বহুল পরিমাণে আছে যাহা অন্য সকল হিন্দু স্ত্রীর মধ্যেই কম বেশী থাকে। জ্ঞানে হোক, অজ্ঞানে হোক, আমার পদানুসরণ করিয়া চলাই

তিনি তাহার জীবনের সার্থকতা মনে করেন; এবং পবিত্র জীবন যাপন করার চেষ্টায় তিনি আমাকে কখনো বাধা দেন না। ইহাতেই বুদ্ধি-শক্তিতে আমাদের উভয়ের ভিতর অনেক প্রভেদ থাকিলেও আমাদের জীবন সন্তোষময়, সুখী ও উর্দ্ধগামী হইয়াছে বলিয়া আমি মনে করি।

১১

ইংরাজদিগের সহিত অন্তরঙ্গ পরিচয়

এই অধ্যায় লিখিতে বসিয়া মনে হইতেছে, আমার এই আত্মকথা সপ্তাহের পর সপ্তাহ কেমন করিয়া অগ্রসর হইতেছে তাহাব রীতিও পাঠকদিগকে জানানো আবশ্যক।

যখন এই আত্মকথা লিখিতে আরম্ভ করি তখন লেখার ধারা সম্বন্ধে আমার কোনও একটা সুনিশ্চিত পরিকল্পনা ছিল না। কোন পুস্তক, রোজনামচা বা কাগজ-পত্র লইয়া আমি এই অধ্যায়গুলি লিখিতেছি না। লিখিবার সময় অন্তর্যামী আমাকে যেমন চালাইতেছেন আমি তেমনি লিখিতেছি, একথা বলা যায়। যে শক্তি আমাকে পরিচালনা করিতেছে তাহা অন্তর্যামীরই, একথা আমি বলিতে পারি কিনা তাহাও আমি নিশ্চয়পূর্ব্বক জানি না। কিন্তু অনেক দিন হইতে আমি যে কার্য্যই করিতেছি, সে কাজ যত বড়ই হোক্ বা যত ছোটই হোক্, যদি বিচার করিয়া দেখা যায় তবে একথা বলিলে বোধ হয় অন্যায় হইবে না যে, সে সমস্ত কর্ম্মই অন্তর্যামী প্রেরিত।

অন্তর্যামীকে আমি দেখি নাই, আমি তাঁহাকে জানিও না। ঈশ্বর সম্বন্ধে জগতের শ্রদ্ধাকে আমি আমার আপনার করিয়া লইয়াছি। এই শ্রদ্ধা কোনও রকমে পরিত্যাগ করিতেও পারা যায় না। সেই জন্য তাঁহাকে শ্রদ্ধার ভিতর দিয়া অনুভবরূপে জানিতেছি। তাহা হইলেও তাঁহাকে অনুভবরূপে জানিতেছি বলাতেও সত্যের উপর এক প্রকার

ব্যাঘাত করা হয়। তাঁহাকে শুদ্ধরূপে প্রকাশ করার শব্দ আমার ভাণ্ডারে নাই—এই কথা বলাই সর্ব্বতোভাবে সঙ্গত। এই অদৃষ্ট অন্তর্যামীর আদেশের বশবর্ত্তী হইয়া আমি এই কাহিনী লিখিতেছি—ইহাই আমার স্বীকৃতি।

পূর্ব্বের অধ্যায়টি যখন আমি আরম্ভ করি তখন শিরোনামায় তাহার নাম দিয়াছিলাম—"ইংরাজদিগের সহিত পরিচয়।" কিন্তু লিখিতে গিয়া আমি দেখিলাম যে ঐ পরিচয়ের সম্বন্ধে লিখিতে হইলে যে পুণ্য-স্মৃতির কথা পূর্ব্ব অধ্যায়ে লিখিয়াছি তাহাও লেখা আবশ্যক। সেইজন্য পূর্ব্ব অধ্যায়ে তাহা লিখিয়া বর্ত্তমান অধ্যায়টি লিখিতে হইতেছে এবং পূর্ব্বের অধ্যায়ের শিরোনামও বদলাইতে হইয়াছে।

কিন্তু এই অধ্যায়টি লিখিতে গিয়াও নূতন ধর্ম্ম-সঙ্কট উপস্থিত হইয়াছে। ইংরাজদিগের পরিচয় দিতে গিয়া কি বলিব, আর কি না বলিব তাহাও একটা জটিল সমস্যা। যাহা প্রাসঙ্গিক তাহা না বলিলে সত্যে মলিনতা স্পর্শ করে। কিন্তু যেখানে এই আত্মকথা লেখাই প্রাসঙ্গিক কিনা সে সম্বন্ধে প্রশ্ন আছে, সেখানে কি প্রাসঙ্গিক কি অপ্রাসঙ্গিক, তাহা স্থির করিয়া ন্যায্য বিষয়টি মাত্র লেখাও সহজ নহে।

আত্মকথা মাত্রই যে ইতিহাস হিসাবে অপূর্ণ এবং আত্মকথা লেখাও যে কঠিন—সে কথা আমি পূর্ব্বেই পড়িয়াছিলাম। আজ সে কথার অর্থ পূর্ণরূপে বুঝিতেছি। এই "সত্যের প্রয়োগে" বা আত্মকথার মধ্যে যাহা আমার স্মরণ আছে, তাহার সমস্ত কথাই যে আমি লিখিতেছি না—তাহা আমি জানি। কিন্তু সত্য দেখাইবার জন্য আমার কোন্ কথাটা দেওয়া দরকার এবং কোন কথাটা বাদ দেওয়া দরকার তাহাই কি জানি? যে সাক্ষী একতরফা ও অর্দ্ধেক কথা বলে সে সাক্ষীর মূল্য বিচারালয়ে কতটুকু?

যে অধ্যায়গুলি লিখিত হইয়াছে, কেহ যদি সেই অধ্যায়গুলির উপরও জেরা করিতে আরম্ভ করেন, তবে হয়ত অনেক নূতন আলোকের রেখা তিনি তাহাদের উপর ফেলিতে পারিবেন। আবার কেহ যদি গাল পাড়িয়া চর্চ্চা করার জন্য সমালোচকের দৃষ্টিতে প্রশ্ন করেন, তবে আমার উক্তির ভিতর হইতে অনেক ফাঁকি ধরিয়া ফেলিয়াছেন বলিয়া তাঁহার পক্ষে অহঙ্কার অনুভব করাও অসম্ভব নহে।

প্রায় ঘণ্টা খানেক ধরিয়া এইভাবে বিচার করিতেছি এবং ভাবিতেছি যে, অধ্যায়গুলি লেখা একেবারেই বন্ধ করিয়া দেওয়া উচিত কিনা। কিন্তু যে কার্য্য আরম্ভ করা হইয়াছে, উহা নীতি সঙ্গত নহে—এ কথা যে পর্য্যন্ত স্পষ্ট না হইবে সে পর্য্যন্ত তাহা ত্যাগ করা উচিত নহে, ইহাই সাধারণ রীতি এবং এই যুক্তি অনুসারে যে পর্য্যন্ত অন্তর্যামীর আদেশ আমার লেখা বন্ধ করিয়া না দেয় সে পর্য্যন্ত অধ্যায়গুলি লিখিয়াই যাইব—এই সিদ্ধান্তে উপস্থিত হইয়াছি।

এই আত্মকথা সমালোচকদিগকে সন্তুষ্ট করার জন্য লিখিতেছি না। আমার এই আত্মকথা লেখাও আমার পক্ষে সত্যেরই পরীক্ষা বিশেষ। আমার সাথীদের এই আত্মকথা হইতে কিছু আশ্বাস-বাক্য মিলিবে—ইহা লেখার তাহাও একটা হেতু। তাহাদের সন্তোষের জন্যই এই আত্মকথা লেখা আরম্ভ হয়। স্বামী আনন্দ ও জেরাম দাস যদি আমার উপর চাপ না দিতেন, তবে ইহা কদাচ আরম্ভ হইত না। সেই হেতু যদি লেখাতে কোনও দোষ হইয়া থাকে তবে তাঁহারাও উহার ভাগীদার।

এখন শিরোনামার বিষয়ের অনুসরণ করিতেছি। যেমন আমি ভারত-বাসীদিগকে আমার ঘরে আত্মীয়ের ন্যায় রাখিতেছিলাম, তেমনি ইংরাজ-দিগকেও রাখিতেছিলাম। আমার এই ব্যবহারের সম্বন্ধে, আমার সহিত

যাঁহারা বাস করিতেন তাঁহারা সকলেই যে অনুকূল মত পোষণ করিতেন তাহা নহে। তবুও আমি জেদ করিয়াই তাঁহাদিগকে রাখিতাম। সকলকে রাখা বিষয়েই যে আমি বুদ্ধিমানের কার্য্য করিয়াছি, একথাও বলা যায় না। তাহাদেরও কাহারও সম্পর্কে আমাকে তিক্ত অভিজ্ঞতাও সঞ্চয় করিতে হইয়াছে। তবে সে অভিজ্ঞতা ত দেশী বিদেশী উভয়ের বেলাতেই হইয়াছে। কটু অভিজ্ঞতা সত্ত্বেও এবং মিত্রদিগের অসুবিধা হইয়াছে, কষ্ট হইয়াছে জানিয়াও আমার স্বভাব আমি বদলাই নাই, এবং মিত্রেরাও ঐ সকল উদারতাপূর্ব্বক সহ্য করিয়াছেন। নূতন নূতন মানুষের সাথে সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠিত করিতে গিয়া যখন আমার কোনও বন্ধুর কষ্ট হইয়াছে তখন তাঁহাকে সে জন্য দোষ দিতেও আমি দ্বিধা করি নাই। আমার এই অনুভব যে, কোনও আস্তিক মনুষ্যের পক্ষে নিজের মধ্যে অবস্থিত ঈশ্বরকে সকলের মধ্যেই যেমন দেখিতে পারা চাই, তেমনি সঙ্গীদের সহিত অলিপ্ত হইয়া থাকিবার শক্তিও অর্জ্জন করা চাই। অযাচিত অবসর যখন আসে তখন তাহা হইতে দূরে না সরিয়া, নূতন নূতন সম্বন্ধে বাঁধা পড়িয়াও রাগ-দ্বেষ রহিত হইয়া থাকার দ্বারাই এই শক্তি বিকশিত হইতে পারে।

এইজন্য যখন বোয়ার-বৃটিশ যুদ্ধ আরম্ভ হইয়াছিল তখন আমার ঘর পরিপূর্ণ থাকা সত্ত্বেও জোহানেসবর্গ হইতে আগত দুই ইংরাজকে আমি গৃহে স্থান দিয়াছিলাম। দুই জনেই থিয়োসফিষ্ট ছিলেন। তাঁহাদের একজনের নাম ছিল কিচন। ইঁহার প্রসঙ্গ ভবিষ্যতে আসিবে। এই মিত্রদের সহিত বাসের জন্য আমার ধর্ম্ম-পত্নীকে অনেক চোখের জল ফেলিতে হইয়াছে। বস্তুতঃ আমার জন্য তাঁহার অদৃষ্টে চোখের জল ফেলা অনেকবার ঘটিয়াছে। এতটা ঘনিষ্ঠ ভাবে বিনা পর্দ্দায় ইংরাজ-

দিগকে নিজের ঘরে রাখা এই আমার প্রথম। ইংলণ্ডে আমি ইংরাজদের ঘরে থাকিয়াছি সত্য ; কিন্তু সেখানে তাঁহাদের বশেই আমাকে থাকিতে হইত, এবং সেখানে থাকা অনেকটা হোটেলে থাকার মতই ছিল। এখানে তাহার উল্টা ব্যবস্থা ছিল। এই মিত্রেরা আত্মীয় হইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা সর্ব্বাংশে ভারতবর্ষীয় ধরণ-ধারণই অনুসরণ করিয়া চলিতেন। ঘরের বাহ্যিক সাজসজ্জা ইংরাজী ঢং-এর হইলেও ভিতরের ধরণ, আহার ইত্যাদি মুখ্যতঃ ভারতবর্ষীয় ছিল। তাঁহাদিগকে রাখাতে কতকগুলি অসুবিধা হইয়াছিল বলিয়া স্মরণ আছে ; তাহা হইলেও একথা বলিতে পারি যে, ঐ উভয় ব্যক্তিই ঘরের অন্য লোকের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলেন। জোহানেসবর্গে এই প্রকার সম্বন্ধ পূর্ব্বাপেক্ষা অধিকতর পরিপুষ্টি লাভ করিয়াছিল।

১২

ইংরাজদের সহিত পরিচয়

জোহানেসবর্গে এক সময় আমার কেরাণীর সংখ্যা হইয়া গিয়াছিল চার জন। তাহারা কেরাণী হইলেও আমার পুত্রের স্থানই অধিকার করিয়া বসিয়াছিল। কিন্তু চার জনেও তখন আমার কার্য্য চলিত না। টাইপিং না হইলে ত চলেই না। টাইপিং-এর কিছু জ্ঞান এক আমারই ছিল। এই চার জনের মধ্যে দুইজনকে টাইপিং শিখাইলাম কিন্তু ইংরাজী জ্ঞান কাঁচা হওয়ায় তাহাদের টাইপিং কখনো ভাল হইত না। আর ইহাদের মধ্যে একজনকে আমার হিসাব রাখিবার জন্য তৈরী করিতে ইচ্ছা হইয়াছিল। নাতাল হইতে আমার পছন্দ মত কাহাকেও আনাইয়া লওয়া যায় নাই। কেননা পাস ভিন্ন কোন ভারতবাসীকেই জোহানেসবর্গে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইত না। নিজের সুবিধার জন্য আমলাদারদের কৃপা-প্রার্থী হইতে আমি প্রস্তুত ছিলাম না।

আমি গোলে পড়িলাম। কাজ এত বাড়িয়া গিয়াছিল যে, যতই খাটি না কেন, আমার ওকালতী ও সাধারণের জন্য কাজ শেষ করিয়া উঠিতে পারা একা আমার পক্ষে সম্ভব ছিল না। ইংরাজ পুরুষ বা স্ত্রী কেরাণী যদি পাওয়া যায় তবে আমি লইব না, এরূপ সঙ্কল্প আমার ছিল না। কিন্তু কালা মানুষের কাছে সেখানকার গোরারা কি চাকুরী করিতে রাজি হইবে? আমার আশঙ্কা ছিল সেইখানে।

কিন্তু আমি চেষ্টা করিয়া দেখিতে মনস্থ করিলাম। আমি একজন

টাইপরাইটিং-এজেন্টকে জানিতাম। তাঁহার নিকট গেলাম ও বলিলাম যে,'কালা' মানুষের কাছে চাকুরী করিতে অসুবিধা বোধ না করে এমন কোনও ভাল মহিলা বা পুরুষ টাইপিষ্ট যদি পাওয়া যায় তবে যেন আমাকে তিনি সংবাদ দেন। দক্ষিণ আফ্রিকাতে মহিলা-শর্টহ্যাণ্ড টাইপিষ্ট অনেক আছেন। সেইরূপ একজন লোক দেওয়ার চেষ্টা করিবেন বলিয়া এজেন্টটি আমাকে প্রতিশ্রুতি দিলেন এবং তার পরেই মিস্ ডিক্ নাম্নী এক স্কচ্ কুমারীকে তিনি আমার কাছে পাঠাইয়াও দিলেন। মহিলাটি স্কটল্যাণ্ড হইতে কেবল নূতন আসিয়াছেন। যেখানে শুদ্ধ ভাবে চাকুরী করা যায় সেই স্থানেই কাজ লইতে ইনি প্রস্তুত ছিলেন এবং তাঁহার শীঘ্রই কর্ম্ম পাওয়ার আবশ্যকতা ছিল। মহিলাটি এক মুহূর্ত্তেই আমার দৃষ্টি আকর্ষণ করিলেন।

আমি তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"তোমার ভারতবাসীর অধীনে কার্য্য করিতে অসুবিধা হইবে না ?"

তিনি দৃঢ়তা পূর্ব্বক জবাব দিলেন—"মোটেই না।"

"তোমার বেতন কি চাই ?"

"সাড়ে সতের পাউণ্ড কি আপনি বেশী মনে করেন ?"

"তোমার নিকট আমি যে প্রকার আশা করি সে কার্য্য তোমার দ্বারা যদি হয় তবে উহা মোটেই বেশী বলিয়া মনে করি না। কখন তুমি কার্য্যে যোগ দিতে পারিবে ?"

"আপনার ইচ্ছা হইলে, এই মুহূর্ত্তেই।"

আমি খুব সন্তুষ্ট হইলাম ও তাহাকে তৎক্ষণাৎ আমার সামনে বসাইয়া চিঠি লেখাইতে সুরু করিলাম।

ইনি আমার কেরাণী ছিলেন না। অনতিবিলম্বেই ইনি আমার

কন্যা অথবা ভগ্নীর স্থান গ্রহণ করিয়া বসিলেন। আমাকে কখনো তাঁহাকে উচ্চস্বরে কথা বলিতে হয় নাই। আমাকে ক্বচিৎ তাঁহার কাজে ভুল ধরিতে হইয়াছে। এক এক বারে হাজার পাউণ্ডের হিসাব তাঁহার হাতে, পড়িত ও উহার খাতাপত্র রাখিতে হইত। তিনি আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাসপাত্রী ছিলেন এবং আরো বিশেষ কথা এই যে, তিনি তাঁহার গুহ্যতম মনোভাবও আমাকে জানাইতে দ্বিধা করিতেন না। স্বামী পছন্দ করার সময়ও তিনি আমার পরামর্শ লইয়াছিলেন। কন্যাদান করার সৌভাগ্যও আমিই পাইয়াছিলাম। যখন মিস্ ডিক্ মিসেস্ ম্যাকডোনাল্ড হইয়া গেলেন তখন তাঁহার ত আর আমার কাছে থাকা চলে না। তিনি বিদায় লইলেন। কিন্তু তবু বিবাহ হওয়ার পরও, ভিড়ের সময় আমি তাঁহার দ্বারা অনেক কাজ করাইয়া লইয়াছি।

আফিসে এখন একজন স্থায়ী শর্টহ্যাণ্ড রাইটারের দরকার ছিল। একজন পাওয়া গেল। এই মহিলার নাম মিস্ শ্লেশিন্। তাঁহাকে আমার নিকট লইয়া আসিয়াছিলেন মিঃ কলেনবেক্। ইহার সহিত ভবিষ্যতে পাঠকের পরিচয় হইবে। এই মহিলা এক হাইস্কুলে শিক্ষকের কাজ করিতেন। আমার কাছে যখন আসিলেন তখন তাঁহার বয়স সতের বৎসর হইবে। তাঁহার কতকগুলি বিচিত্রতায় মিঃ কলেনবেক্ ও আমি হার মানিতাম। তিনি চাকুরী করিতে আসেন নাই, আসিয়া-ছিলেন অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিতে। তাঁহার ভিতরে অনুমাত্রও বর্ণ-বিদ্বেষ ছিল না এবং তিনি কাহাকে গ্রাহ্যও করিতেন না। তিনি অপমানকে একটুকুও ডরাইতেন না এবং নিজের মনে যাহার সম্বন্ধে যে ধারণা পোষণ করিতেন, তাহা বলিয়া ফেলিতে সঙ্কোচ করিতেন না। এই স্বভাবের

জন্য আমি কতবার মুস্কিলে পড়িয়াছি। কিন্তু তাঁহার অকপট স্বভাবই আবার সকল মুস্কিল দূরও করিত। তাঁহার ইংরাজী জ্ঞান আমার অপেক্ষা বেশী মনে করিতাম বলিয়া এবং তাঁহার দায়িত্বের উপর পূর্ণ বিশ্বাস হওয়ায় তাঁহার টাইপ করা অনেক কাগজ আমি পুনরায় না পড়িয়াই সহি করিতাম।

তাঁহার ত্যাগবৃত্তি অসাধারণ ছিল। বহুদিন পর্য্যন্ত আমার নিকট হইতে প্রতিমাসে তিনি মাত্র ৬।৭ পাউণ্ড হিসাবে লইতেন এবং কখনও ১০ পাউণ্ডের বেশী লইতে পারেন নাই। আমি যদি বেশী লইতে বলিতাম তবে আমাকে ধমকাইয়া বলিতেন—"আমি বেতনের জন্য এখানে থাকিতেছি না, আমার তোমার সঙ্গ ও কাজ ভাল লাগে এবং তোমার আদর্শ আমার ভাল লাগে, সেই জন্যই এখানে আছি।" আমার নিকট হইতে একবারমাত্র প্রয়োজন বশতঃ ৪০ পাউণ্ড তিনি লইয়াছিলেন, কিন্তু তাহাও ধার-স্বরূপে। গত বৎসর সে টাকাও তিনি পরিশোধ করিয়াছেন।

তাঁহার ত্যাগবৃত্তি যেমন তীব্র ছিল, তেমনি ছিল তাঁহার সাহস। স্ফটিকের ন্যায় পবিত্র এবং ক্ষত্রিয়কেও লজ্জা দেয় এমন যে দুই চারি জন বীর রমণীর সহিত মিশিবার সৌভাগ্য আমি পাইয়াছি, তাহাদের মধ্যে এই বালিকাকে আমি একজন বলিয়া গণ্য করি। আজ তিনি বড় হইয়াছেন, প্রৌঢ়া কুমারী হইয়াছেন, আজ তাঁহার মানসিক অবস্থার পুরা খবর আমার জানা নাই, কিন্তু আমার অনুভবের মধ্যে এই বালিকার স্মৃতি একটী পুণ্য স্মারকরূপে জাগিয়া আছে। সেই জন্য তাঁহার সম্বন্ধে আমি যাহা জানি তাহা না লিখিলে সত্যদ্রোহী হইব।

কাজের বেলা তিনি দিনরাতের ভেদ জানিতেন না। অর্দ্ধরাতে বা

মধ্যরাতে যেখানে যাওয়ার প্রয়োজন হইত, সেইখানেই তিনি যাইতেন। যদি সঙ্গে কাহাকেও পাঠাইবার কথা বলিতাম তবে জ্বলিয়া উঠিতেন। হাজার হাজার বিশালকায় হিন্দুস্থানীও তাঁহাকে মায়ের মত দেখিত এবং তাঁহার কথা মানিয়া চলিত। যখন আমরা সকলে জেলে ছিলাম, দায়িত্ববান্ পুরুষ বড় কেহ বাহিরে ছিল না, তখন তিনি একাই ঐ লড়াই সামলাইয়া চালাইয়াছিলেন। লাখো টাকার হিসাব তাঁহার হাতে, সমস্ত পত্র ব্যবহারের কাজ তাঁহার হাতে, 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'ও তাঁহারই হাতে; এই প্রকার অবস্থা হইয়াছিল। তবুও তিনি পরিশ্রান্ত হন নাই।

মিস্ শ্লেশিনের বিষয় লিখিতে গিয়া আমার কথার শেষ হইবে না। সুতরাং গোখলের প্রশংসাপত্র উল্লেখ করিয়া এই প্রসঙ্গ সমাপ্ত করিব। গোখলে আমার সকল সাথীর সঙ্গেই পরিচয় করিয়াছিলেন। পরিচয় ফলে অনেকের উপরেই তিনি অত্যন্ত সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন। তিনি সকলের সম্বন্ধে মতামত্ও প্রকাশ করিয়াছেন। আমার সকল ভারতীয় ও ইউরোপীয়ান সহকর্ম্মীদের মধ্যে এই মিস্ শ্লেশিনকে তিনি প্রধান স্থান দিয়াছিলেন। "এমন ত্যাগ, এমন পবিত্রতা, এমন নির্ভীকতা এবং এমন কুশলতা আমি অল্প লোকের মধ্যেই দেখিয়াছি। আমার দৃষ্টিতে তোমার সাথীদের মধ্যে মিস্ শ্লেশিন প্রথম স্থান অধিকার করিয়া আছেন।"

১৩

'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'

ইউরোপীয়দিগের সহিত গাঢ় পরিচয়ের কথা বলা এখনও আমার শেষ হয় নাই। কিন্তু তাহার পূর্ব্বে আরও দুই তিনটা দরকারী বিষয় সম্বন্ধে বলা আমি আবশ্যক বলিয়া মনে করি। তাহা হইলেও একজনের পরিচয় এইখানেই দিতে হইতেছে। মিস্ ডিক্‌কে কাজে লাওয়াতেই আমার কার্য্য সম্পূর্ণভাবে নিষ্পন্ন হইতেছিল না; আমাকে সাহায্য করিবার জন্য আরও লোকের প্রয়োজন ছিল। মিঃ রিচের বিষয় আমি পূর্ব্বেই উল্লেখ করিয়াছি। তাঁহার সহিত আমার বেশ ভাল পরিচয় ছিল। তিনি এক ব্যবসায়ের ম্যানেজার ছিলেন। সেখান হইতে বাহির হইয়া আমার অধীনে আর্টিকেল ক্লার্ক হইতে তাঁহাকে আমি পরামর্শ দিই। উহা তাঁহার কাছে ভাল লাগে। সুতরাং তিনি আসিয়া আমার আফিসে ভর্ত্তি হইলেন। আমার কাজের বোঝা হাল্‌কা হইল।

এই সময়ে শ্রীযুত মদনজিৎ 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' বাহির করিতে মনস্থ করিয়া আমার পরামর্শ ও সাহায্য চাহিলেন। প্রকাশ করার বিষয়ে আমি সম্মতি দিলাম। ১৯০৪ সালে এই কাগজের উদ্ভব হইল। মনসুখলাল নাজর ইহার সম্পাদক হইলেন, কিন্তু সম্পাদকের সত্যিকার বোঝা আসিয়া পড়িল আমারই উপরে। আমার অদৃষ্টে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রেই দূর হইতে কাগজ চালাইবার ভার পড়িয়াছে। মনসুখলাল নাজর যে পরিচালনা করিতে পারিতেন না এমন নয়। দেশে

থাকিতে তাঁহাকে সংবাদপত্রের কাজ খুবই করিতে হইত। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকার জটিল প্রশ্নসমূহের সম্পর্কে আমার বর্ত্তমানে তিনি লিখিতে সাহস করিলেন না। আমার বিচারশক্তির উপর তাঁহার অতিরিক্ত বিশ্বাস ছিল। এই জন্য যে সমস্ত বিষয়ের উপরে মন্তব্য করা দরকার সেই সমস্ত বিষয়ের উপর লিখিয়া পাঠাইবার ভার তিনি আমার উপর প্রদান করিয়াছিলেন।

এই কাগজখানা সাপ্তাহিক ছিল—আজও তাহাই আছে। প্রথমে উহা গুজরাটী, হিন্দী, তামিল ও ইংরাজীতে বাহির হইত। কিন্তু আমি দেখিলাম যে, তামিল ও হিন্দী বিভাগ নামমাত্র আছে। উহাদ্বারা সম্প্রদায়ের সেবা হইতেছে না। তাহা ছাড়া ঐ বিভাগ রাখাতে মিথ্যা আচরণেরও আভাস আছে। সেইজন্য তাহা বন্ধ করিয়া দিয়া আমি শান্তি লাভ করিলাম।

এই কাগজে আমার টাকা দিতে হইবে, এ কল্পনা আমার ছিল না। কিন্তু অল্প সময়েই আমি দেখিলাম যে, আমি টাকা না ঢালিলে কাগজ চলিবে না। কাগজের আমি সম্পাদক না হইলেও উহার লেখার জন্য সমস্ত দায়িত্ব যে আমার, সে কথা সকল ভারতবাসী ও গোরারা জানিয়া গিয়াছিল। যদি কাগজ না বাহির হইত তাহা হইলে ক্ষতি ছিল না। কিন্তু কাগজ বাহির হইয়া তারপর বন্ধ হইয়া গেলে সম্প্রদায়ের অপমান হইবে এইরূপ আমার মনে হইতে লাগিল।

আমি উহাতে টাকা ঢালিতে লাগিলাম ও শেষে এমন হইল যে, আমার যাহা কিছু বাঁচিত, সে সমস্ত টাকাই উহাতে যাইত। এক সময়ের কথা আমার মনে আছে। তখন প্রতিমাসে ৭৫ পাউণ্ড (১১২৫ টাকা) করিয়া পাঠাইতে হইত।

কিন্তু এতদিন পরেও আমার মনে হয় যে, ঐ কাগজে সম্প্রদায়ের ভালই সেবা করিয়াছে। উহা হইতে পয়সা উপার্জ্জন করার কথা কাহারও ভুলেও মনে হইত না।

আমার হাতে যতদিন ঐ কাগজ ছিল ততদিন আমার জীবনের পরিবর্ত্তনের সঙ্গে সঙ্গে উহার মধ্যেও সেই পরিবর্ত্তন সূচিত হইয়াছে। আজও যেমন 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' ও 'নবজীবন' আমার জীবনের কতক অংশের প্রতিবিম্ব, 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নও' তেমনি ছিল। প্রতি সপ্তাহে আমি আমার হৃদয় উহাতেই ঢালিয়া দিতাম এবং আমি সত্যাগ্রহের যে রূপ দেখিতাম তাহাই বুঝাইবার চেষ্টা করিতাম।

জেলে যে সময় ছিলাম সে সময় বাদ দিলে, দশ বৎসর পর্য্যন্ত অর্থাৎ ১৯১৪সাল পর্য্যন্ত 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' এমন এক সংখ্যাও হয়ত পাওয়া যাইবে না যাহাতে আমার লেখা নাই। ঐ সকল লেখাতে এমন একটা শব্দের কথাও আমার স্মরণ হয় না যাহা আমি বিচার না করিয়া, ওজন না করিয়া ব্যবহার করিয়াছি, যাহা কেবল লোককে খুসী করার জন্য ব্যবহার করিয়াছি, অথবা জানিয়া বুঝিয়া অতিশয় উক্তির জন্য ব্যবহার করিয়াছি। আমার কাছে এই কাগজখানা সংযম শিক্ষা করার বস্তু হইয়া পড়িয়াছিল। উহা মিত্রদিগকে আমার সিদ্ধান্ত জানাইবার বাহন ছিল। সমালোচকেরাও উহাতে সমালোচনা করার মত বিশেষ কিছু পাইতেন না। বস্তুতঃ আমি জানি 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' লেখায় সমালোচকের নিজের কলমই সংযত করার আবশ্যক হইত। এই কাগজখানা না হইলে সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম চালানো যাইত না। ইহার পাঠকগণ এই সংবাদপত্রকে নিজের কাগজ বলিয়াই মনে করিত এবং ইহার ভিতর দিয়া লড়াইয়ের ও দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থার খাঁটি চিত্র পাইতেন।

তাহা ছাড়া, এই কাগজের ভিতর দিয়া আমি রং-বেরং-এর মনুষ্য স্বভাবের পরিচয় পাওয়ার সুযোগ পাইয়াছিলাম। সম্পাদক ও গ্রাহকের মধ্যে একটা ঘনিষ্ঠ এবং পবিত্র সম্বন্ধ প্রতিষ্ঠার দিকে আমার বিশেষ লক্ষ্য ছিল। পাঠকেরা হৃদয় খুলিয়া আমার কাছে পত্র লিখিতেন। এরূপ চিঠি আমি অজস্র পাইতাম। তীক্ষ্ণ, কটু, মধুর নানা রকমের লেখাই আমার কাছে আসিত। সেইগুলি পাঠ করা, বিচার করা, উহা হইতে সিদ্ধান্ত উদ্ধার করিয়া জবাব দেওয়া আমার পক্ষে উত্তম শিক্ষাক্ষেত্র হইয়াছিল। এইরূপে আমি সম্প্রদায়ের সমস্ত কথা ও ভাবনার সম্পর্কে এমন অভিজ্ঞতা লাভ করিতাম যে, মনে হইত যেন সে সমস্তই কানে শুনিতেছি। ইহাতে সম্পাদকের দায়িত্ব-সম্বন্ধেও আমি ভালরকমের জ্ঞান অর্জ্জন করিতেছিলাম। তাহা ছাড়া ইহার দ্বারা সম্প্রদায়ের উপর আমার প্রভাব যেরূপ ভাবে বাড়িয়া উঠিতেছিল, তাহাতেই ভবিষ্যতের সত্যাগ্রহ-সংগ্রাম সুনিয়ন্ত্রিত হইয়া, সুন্দর হইয়া ও শক্তিশালী হইয়া উঠিয়াছিল। সংবাদ-পত্র যে সেবা-ভাবের দ্বারা অনুপ্রাণিত হইয়াই চালাইতে হয়, ইহা আমি 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' প্রথম মাসের পরিচালনাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। সংবাদপত্র একটা প্রচণ্ড শক্তি। উচ্ছৃঙ্খল জলপ্রবাহ যেমন গ্রামকে গ্রাম ডুবাইয়া দেয়, শস্য ধ্বংস করিয়া ফেলে, তেমনি উচ্ছৃঙ্খল লেখার স্রোতও ধ্বংসকারী। যদি উচ্ছৃঙ্খল লেখা বাহিরের শাসনে সংযত হয় তবে তাহা উচ্ছৃঙ্খলতা অপেক্ষাও অধিক বিষ ছড়ায়। ভিতর হইতে যে শাসন আসে তাহাতেই শুভ হয়।

এই বিচারপদ্ধতি যদি সত্য হয়, তবে দুনিয়ার কয়খানা সংবাদপত্র এই বিচারের কষ্টিপাথরে টিকিতে পারে? কিন্তু কে সেই

অকর্ম্মণ্য কাগজগুলির প্রচার বন্ধ করিতে পারে? কেই বা বিচার করিয়া বলিবে যে, কোন্ সংবাদপত্রটা অকাজের? কাজ ও অকাজ সাথে সাথেই চলিতেছে। তাহা হইতেই লোককে নিজের পছন্দ অনুসারে ভাল মন্দ বাছিয়া লইতে হইবে।

১৪

"কুলী লোকেশন" বা অস্পৃশ্য বস্তী

সর্ব্বাপেক্ষা শ্রেষ্ঠ সমাজ সেবা যাহারা করে তাহাদের কোনও কোনও সম্প্রদায়কে—মেথর, ধাঙ্গর প্রভৃতিকে আমরা হিন্দুরা অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য করিয়া থাকি ও তাহাদিগকে গ্রামের বাহিরে ভিন্ন করিয়া রাখি। গুজরাটে ঐ রকম অস্পৃশ্যদের বাসস্থানকে 'ঢেড়বড়ো' বলে এবং লোকে উহার নাম লইতেও ঘৃণাবোধ করে। খৃষ্টান ইউরোপ এক কালে ইহুদীদিগকে এমনি অস্পৃশ্য বলিয়া গণ্য করিত। তাহাদের জন্য যে অস্পৃশ্য বস্তী ছিল তাহাকে 'ঘেটো' বলিত। ঐ 'ঘেটো' শব্দটাই তাহারা খারাপ বলিয়া মনে করিত। তেমনি আজ আমরা ভারতবর্ষীয়েরা দক্ষিণ আফ্রিকায় অস্পৃশ্য হইয়া আছি। এণ্ড্রুজের আত্মত্যাগ ও শাস্ত্রীর যাদুবিদ্যার সোণার কাঠি, দক্ষিণ আফ্রিকায় ভারতীয়দিগকে শুদ্ধ করিবে কিনা এবং পরিণামে আমরা অস্পৃশ্য না হইয়া সভ্য বলিয়া গণ্য হইব কিনা তাহা ভবিষ্যতে বুঝা যাইবে।

ইহুদীরা নিজেদিগকে ঈশ্বরের অনুগৃহীত এবং অপর কেহ অনুগৃহীত নয় এইরূপ মনে করিত এবং এই অপরাধের শাস্তি তাহারা বিচিত্র রীতিতে এমন কি অন্যায় রীতিতেই পাইয়াছে। প্রায় সেই রকমেই ভারতবাসীরা নিজেদিগকে সভ্য ও আর্য্য মনে করিয়া, নিজেদের অপর এক অঙ্গকে প্রাকৃত অনার্য্য বা অস্পৃশ্য বলিয়া মনে করিয়া থাকে এবং সঙ্গে সঙ্গে সেই পাপের ফল বিচিত্র রীতিতে এবং অন্যায় রীতিতে দক্ষিণ আফ্রিকা প্রভৃতি দেশে ভোগ

করে। তাহাদের মুসলমান এবং পার্শী প্রতিবেশিগণও যে এই দণ্ড ভোগ করেন, তাহার কারণ তাহারাও একই দেশের লোক এবং গায়ের রংও তাঁহাদের একরূপ। অন্ততঃ ইহাই আমার অনুভব।

এই অধ্যায়ে যে 'লোকেশন' সম্বন্ধে বলা হইবে, তাহার মানে এতক্ষণ পাঠকেরা হয় ত কিছু বুঝিয়াছেন। আমরা দক্ষিণ আফ্রিকায় 'কুলী' নামে পরিচিত ছিলাম। হিন্দুস্থানে কুলী শব্দের অর্থ ত 'মজুর'। কিন্তু দক্ষিণ আফ্রিকায় এই শব্দটি পঞ্চম (মেথর ধাঙ্গর) ইত্যাদি তিরস্কারবাচক শব্দের ন্যায় ব্যবহৃত হয়। দক্ষিণ আফ্রিকাতে যে স্থান 'কুলী'দের থাকার জন্য আলাদা করিয়া ফেলিয়া রাখা হইয়াছে তাহাকে "কুলী লোকেশন" বলে। এই রকম জোহানেস্‌বর্গেও ছিল। যে সকল স্থানে 'লোকেশন' ছিল তাহাতে ভারতীয়দের মালিকী স্বত্ব হইত না—এখনো নাই। জোহানেস্‌বর্গের এই লোকেশনে জমির জন্য প্রতিবৎসরই নূতন পাট্টা লইতে হইত। এইস্থানে ভারতীয়দের বসতি অত্যন্ত ঘেষাঘেষি ভাবে বসানো হইত। লোকের বসতি বাড়িলেও এই 'লোকেশনের' স্থান বাড়ানো হইত না। এই 'লোকেশনের' পায়খানা কোনও রকমে সাফ করা ছাড়া মিউনিসিপালিটির তরফ হইতে কোন প্রকারেরই দেখাশুনা করা হইত না। যেখানে এইরূপ ব্যবস্থা, সেখানে রাস্তা ও রাস্তার বাতিই বা কেন থাকিবে? আর যেখানে লোকের শৌচাদি সম্বন্ধেই দেখাশুনার কথা মিউনিসিপালিটি দরকার বোধ করিত না, সেখানে সাফ করার কাজই বা কেমন করিয়া হইবে?

যে সব ভারতবাসী এই বস্তীতে বাস করিত, তাহারা স্বাস্থ্য ও পরিষ্কার-পরিচ্ছন্নতা-সম্পর্কে একেবারেই অজ্ঞ ছিল। সুতরাং

মিউনিসিপালিটির সাহায্য ও দেখাশুনার ব্যবস্থা তাহাদের পক্ষে ছিল একান্ত ভাবেই অপরিহার্য্য। জঙ্গলকে মঙ্গল করিতে পারে, ধূলা হইতে ধান করিতে পারে এমন অদ্ভুতকর্ম্মী ভারতবাসী যদি সেখানে গিয়া বাস করিত, তবে ইতিহাস অন্যরূপ হইত। কিন্তু দুনিয়ায় এ ধরণের লোককে কথনো বিদেশে গিয়া ক্ষেত চষিতে দেখা যায় না। সাধারণ লোকই ধন এবং সুখের জন্য বিদেশে গিয়া চাষের কাজ করে। ভারতবর্ষ হইতেও প্রধানতঃ মূর্খ, গরীব, দীন-দুঃখী মজুরেরাই দক্ষিণ আফ্রিকায় গিয়াছিল। ইহাদিগকে পদে পদে রক্ষা করার আবশ্যক হয়। ইহাদের পশ্চাতে যে সকল ব্যবসায়ী বা অন্য শিক্ষিত ভারতবাসী সেখানে গিয়াছিলেন, তাঁহাদের সংখ্যাও ছিল মুষ্টিমেয়।

মিউনিসিপালিটির সাফাই করার বিভাগের অমার্জ্জনীয় অবহেলার জন্য ও ভারতীয়দের অজ্ঞতার জন্য 'লোকেশনের' অবস্থা স্বাস্থ্যরক্ষার দিক্ দিয়া খুবই খারাপ ছিল। উহাকে পরিচ্ছন্ন করার অনুমাত্র চেষ্টাও স্বাস্থ্য বিভাগ হইতে করা হয় নাই। অথচ নিজের অবহেলা হইতে উৎপন্ন এই অপরিচ্ছন্নতাকে নিমিত্ত করিয়াই, 'লোকেশনটিকে' উচ্ছেদ করার জন্য মিউনিসিপালিটি কৃতসঙ্কল্প হইলেন এবং জমিগুলি অধিকার করার জন্য গবর্ণমেণ্ট হইতে আইনও পাস করিয়া লইলেন। আমি যে সময় জোহানেসবর্গে গিয়া বসিয়াছিলাম, ইহাই তখনকার স্থিতি।

জমিতে বাসিন্দাদের নিজ স্বত্ব ছিল। সুতরাং উচ্ছেদ করিতে হইলে ক্ষতিপূরণ-স্বরূপ তাহাদিগকে অর্থও দেওয়া দরকার। তাই ক্ষতি-পূরণের পরিমাণ নির্ণয় করিবার জন্য বিশেষ আদালত বসিয়াছিল। মিউনিসিপালিটি যে ক্ষতিপূরণ দিতে প্রস্তুত, যে তাহা গ্রহণ করিতে

স্বীকার না করিবে—সে আদালত যাহা ধার্য্য করিবে তাহাই পাইবে। মিউনিসিপালিটি হইতে ধার্য্য টাকা অপেক্ষা যদি আদালত অধিক ধার্য্য করে তবে আদালতের খরচা মিউনিসিপালিটিকে দিতে হইবে—এই রকম আইন ছিল।

প্রায় সকল বাসিন্দাই আমাকেই তাহাদের দাবী দেখার জন্য নিযুক্ত করিয়াছিল। এই ব্যাপার হইতে আমার রোজগার করার ইচ্ছা ছিল না। আমি তাহাদিগকে জানাইয়াছিলাম 'যদি তোমাদের মামলায় জিৎ হয় তবে মিউনিসিপালিটি হইতে যে খরচা পাওয়া যাইবে আমি তাহাতেই সন্তুষ্ট হইব। তাহা ছাড়া মামলায় তোমাদের হারই হোক্ আর জিৎই হোক্ আমাকে প্রতি মোকদ্দমায় দশ পাউণ্ড হিসাবে দিলেই যথেষ্ট হইবে। ইহা হইতে অর্দ্ধেক টাকা আমি গরীবদিগের জন্য হাসপাতাল অথবা সার্ব্বজনীন কার্য্যের জন্য আলাদা করিয়া রাখিয়া দিব। স্বভাবতঃই তাহারা ইহাতে খুব খুসী হইয়াছিল। প্রায় ৭০টা মামলার মধ্যে একটাতে মাত্র হারিয়াছিলাম। ইহাতে ফি-বাবদ আমার অনেক টাকা হস্তগত হয়। কিন্তু তখন ত 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' টাকার দাবী আমার উপর লাগিয়াই ছিল। তখন পর্য্যন্ত ১৬০০ পাউণ্ড (২৪০০০৲) উহাতে চলিয়া গিয়াছিল—ইহা আমার স্মরণ আছে।

এই সকল মোকদ্দমায় আমার খুবই পরিশ্রম করিতে হইয়াছিল। মক্কেলের ভীড় ত আমার পাশে লাগিয়াই থাকিত। ইহাদের অধিকাংশই উত্তর ভারতের বিহার ইত্যাদি স্থানের ও দক্ষিণ ভারতের তামিল তেলেগু প্রদেশের লোক। ইহারা প্রায় সকলেই চুক্তিবদ্ধ মজুর হইয়া আসিয়াছিল এবং চুক্তির অন্তে স্বাধীনভাবে উপার্জ্জন করিতেছিল।

বিশেষভাবে নিজেদের দুঃখ কষ্ট মিটাইবার জন্যই ইহারা এক মণ্ডল

সৃষ্টি করে। স্বাধীন ভারতীয় ব্যবসায়ীদের মণ্ডল হইতে এই মণ্ডল ভিন্ন ছিল। ইহাদের মধ্যে কয়েকজন খুব মুক্তহৃদয়, উদারচিত্ত ও চরিত্রবান্ ব্যক্তিও ছিলেন। মণ্ডলের সভাপতির নাম ছিল শ্রীযুত জেরামসিং এবং সভাপতি না হইলেও সভাপতির মতই আর একজন ছিলেন শ্রীযুত বদ্রী। উভয়েরই দেহান্ত হইয়াছে। উভয়ের নিকট হইতেই আমি খুব সাহায্য পাইয়াছি। শ্রীযুত বদ্রীর পরিচয় আমি খুব ভালরকমই পাইয়াছিলাম। তিনি সত্যাগ্রহে সর্ব্বাগ্রভাগে ছিলেন। ইহাদের এবং অন্যান্য বন্ধুদের মারফতে আমি উত্তর-দক্ষিণ ভারতবর্ষের অসংখ্য অধিবাসীর সহিত নিকট-সম্বন্ধে আসিয়াছিলাম। কেবল তাঁহাদের উকীল নয়, আমি তাঁহাদের ভাইও হইয়াছিলাম এবং তাঁহাদের তিন প্রকার দুঃখেরই ভাগীদার হইয়াছিলাম। শেঠ আবদুল্লা আমাকে গান্ধী বলিয়া ডাকিতে অস্বীকার করেন। কে আমাকে 'সাহেব' বলিবে বা মনে করিবে? তাই তিনি অতিশয় প্রিয় এক নাম বাহির করিলেন। তিনি 'ভাই' বলিয়া ডাকিতে আরম্ভ করিলেন। সেই নামই আমার শেষ পর্য্যন্ত দক্ষিণ আফ্রিকায় ছিল। এখনো চুক্তি-মুক্ত ভারতীয়দের কেহ যখন আমাকে 'ভাই' বলিয়া ডাকে তখন তাহা আমার খুবই মিঠা লাগে।

১৫

মড়ক—১

'কুলী লোকেশনের' স্বামিত্ব মিউনিসিপালিটি লইলেও,তখনই সেখান হইতে ভারতীয়দিগকে সরাইয়া দেওয়া হয় নাই। তাহাদিগকে অন্য সুবিধামত জায়গা দেওয়ার কথা হইতেছিল। কিন্তু এইরূপ জায়গা মিউনিসিপালিটি তৎক্ষণাৎ ঠিক করিতে না পারায়,সেই নোংরা 'লোকেশনেই' ভারতীয়দিগকে থাকিতে হইয়াছিল। ঐ 'লোকেশনের' এখন দুইটা পরিবর্তন হইল। ভারতীয়েরা মালিকের পরিবর্তে স্বাস্থ্যবিভাগের ভাড়াটিয়া হইল ও উহার নোংরা আবহাওয়া আরও বাড়িল। যখন ভারতবাসীরা মালিক ছিল, তখন ইচ্ছায় না হোক্, আইনের ভয়েও স্থানটাকে তাহাদের কতকটা সাফ রাখিতে হইত। এখন স্বাস্থ্যবিভাগ মালিক; সুতরাং আর কাহার ভয়ও রহিল না। বাড়ীগুলিতে ভাড়াটিয়ার সংখ্যা বাড়িল ও তাহার সহিত বাড়িল ময়লা ও অব্যবস্থা।

এই অবস্থা চলিতেছিল এবং ভারতীয়েরা অসুবিধায় চঞ্চল হইয়া উঠিতেছিল, এমন সময় কালো প্লেগ হঠাৎ তাহাদের মধ্যে ছড়াইয়া পড়িল। এই প্লেগ মারাত্মক। ইহাতে ফুস্ফুসে প্লেগ হইত। ইহা বিউবনিক প্লেগ অপেক্ষাও অনেক বেশী ভয়ঙ্কর।

সৌভাগ্যবশতঃ এ মড়কের হেতু 'লোকেশন' নহে। জোহানেস্-বর্গের আশেপাশে অনেক সোণার খনি আছে, তাহারই একটায় এই কালো প্লেগের উৎপত্তি হয়। সেখানে প্রধানতঃ নিগ্রোরাই কাজ করিত। তাহাদিগকে পরিচ্ছন্ন রাখার ভার কেবল গোরা মালিকদের

উপরেই ছিল। এই খনির এক অংশে কতকগুলি হিন্দুস্থানীও কার্য্য করিতেছিল। তাহাদের ২৩ জনের হঠাৎ ছোঁয়াচ লাগে ও একদিন সন্ধ্যায় ভয়ঙ্কর প্লেগ লইয়া 'লোকেশনে' নিজেদের থাকার জায়গায় আসিয়া উপস্থিত হয়।

এই সময় ভাই মদনজিৎ "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের" গ্রাহক করিবার জন্য ও চাঁদা আদায় করিবার জন্য সেখানে গিয়াছিলেন। তিনি 'লোকেশনে' ঘুরিতে ছিলেন। তাঁহার মধ্যে নির্ভীকতা গুণ খুব ছিল। এই পীড়িতেরা তাঁহার দৃষ্টিতে পড়িল, তাহাদের জন্য তাঁহার হৃদয় কাঁদিয়া উঠিল। তিনি পেন্সিলে লিখিয়া এক চিঠি আমাকে পাঠাইয়া দিলেন। তাহার ভাবার্থ এই :—

"এখানে হঠাৎ কালো প্লেগ ফাটিয়া পড়িয়াছে। আপনার এই মুহূর্ত্তেই এখানে আসিয়া কিছু করা দরকার, না হইলে পরিণাম ভয়ঙ্কর হইবে। শীঘ্র আসুন।"

একখানি খালি বাড়ী পড়িয়াছিল। মদনজিৎ নির্ভয়ে তাহার তালা ভাঙ্গিয়া তাহার দখল লইয়া এই পীড়িতদিগকে তাহাতে রাখিয়াছিলেন। আমি আমার সাইকেলে চড়িয়া 'লোকেশনে' পঁহুছিলাম। সেখান হইতে টাউন ক্লার্ককে অবস্থা জানাইয়া পাঠাইলাম এবং কি অবস্থায় ঘর দখল করা হইয়াছে তাহাও জানাইলাম। ডাক্তার উইলিয়াম্ গড্‌ফ্রে জোহানেসবর্গে ডাক্তারী করিতেন। তাঁহার নিকট খবর পঁহুছিতেই তিনি ছুটিয়া আসিলেন ও এই পীড়িতদিগের চিকিৎসা ও শুশ্রূষার ভার গ্রহণ করিলেন। কিন্তু ২৩ জন রোগীর জন্য তিনজনের শুশ্রূষা যথেষ্ট নয়।

আমার অভিজ্ঞতার উপর প্রতিষ্ঠিত এই বিশ্বাস রহিয়াছে যে,

যদি মন শুদ্ধ হয়, তবে সঙ্কটে পড়িলে উপযুক্ত লোক ও ব্যবস্থা আপনি আসিয়া উপস্থিত হয়। আমার আফিসে কল্যাণদাস, মোহনলাল এবং আরো দুইজন হিন্দুস্থানী ছিল। সেই দুইজনের নাম এখন মনে নাই। কল্যাণদাসকে তাহার বাপ আমাকে সমর্পণ করিয়াছিলেন। তাঁহার ন্যায় সহৃদয় ও আদেশের অনুবর্ত্তী সেবক আমি সেখানে কমই দেখিয়াছি। সৌভাগ্যবশতঃ কল্যাণদাস তখন ব্রহ্মচারী ছিলেন। সেইজন্য তাঁহাকে বিপদ-সঙ্কুল কোনও কাজ দিতে কখনও আমার সঙ্কোচ বোধ হইত না। আর মোহনলালকে আমি জোহানেসবর্গেই পাইয়াছিলাম। সেও কুমার ছিল বলিয়া আমার মনে পড়ে। এই চারজনকে কেরাণী বল, সাথী বল, পুত্র বল—তাহাদিগকে বলি দিতে কৃতনিশ্চয় হইলাম। কল্যাণদাসকে আর কি জিজ্ঞাসা করিব? অপর সকলকে জিজ্ঞাসা করিতেই তাঁহারা প্রস্তুত হইয়া গেলেন, "তুমি যেখানে, আমরাও সেখানে" এই সংক্ষেপ ও মিষ্ট জবাব তাঁহারা দিলেন।

মিঃ রিচের পরিবার ছিল বড়। তিনি নিজে ঝাঁপাইয়া পড়িতে তৈরী হইয়াছিলেন, কিন্তু আমি তাঁহাকে নিবারণ করিলাম। তাঁহাকে এই সঙ্কটে টানিবার জন্য আমি মোটেই তৈরী ছিলাম না, আমার সাহসও ছিল না। তবে তিনি বাহিরের সমস্ত কার্য্য করিতেন।

শুশ্রূষাকারীদের পক্ষে এই এক রাত্রি বড় ভয়ানক ছিল। আমি অনেক রোগীর শুশ্রূষা করিয়াছি কিন্তু প্লেগের রোগীর শুশ্রূষা করার অবসর কখনো পাই নাই। ডাক্তার গডফ্রের সাহস আমাদিগকে নির্ভয় করিয়া ফেলিল। রোগীদিগের সেবা করার বেশী কিছু ছিল না। যাহা ছিল, তাহা কেবল ঔষধ খাওয়ানো, আশ্বাস দেওয়া, জল-টল দেওয়া, আর তাহাদের মলমূত্রাদি সাফ্ করা।

এই চার যুবকের স্ফূর্ত্তি, শ্রম ও নির্ভীকতায় আমার আনন্দের পার ছিল না। ডাক্তার গড্‌ফ্রের নিঃশঙ্কতা বুঝিতে পারি, মদনজিৎকে বুঝিতে পারি, কিন্তু এই যুবকদিগকে! রাত্রি যেমন তেমন করিয়া কাটিল। আমার স্মরণ আছে সে রাত্রিতে কোনও রোগী মরে নাই।

এই প্রসঙ্গ যেমন করুণ, তেমনি রসপূর্ণ ও আমার দৃষ্টিতে ধর্ম্মময়। সেইজন্য, এই প্রসঙ্গে আরও অন্ততঃ দুইটি অধ্যায় দেওয়া আবশ্যক।

১৬

মড়ক—২

মিউনিসিপালিটীর 'লোকেশন' বাড়ী ঐ প্রকারে রোগীদের দ্বারা দখল করার জন্য টাউন-ক্লার্ক আমাদের নিকট উপকৃত হইয়াছেন—একথা স্বীকার করিয়া পত্রদ্বারা জানাইলেন—"ঐ অবস্থায় হঠাৎ রোগীদের ব্যবস্থা করার মত উপায় আমার নিকট ছিল না। আপনার যাহা সাহায্য চাই জানাইবেন এবং তজ্জন্য যাহা করা যাইতে পারে টাউন কাউন্সিলার সাধ্যমত তাহা করিবেন।" যাহা ঘটিয়াছে তাহা হইতে সাবধান হইয়া মিউনিসিপালিটি অবস্থানুরূপ ব্যবস্থা করিতে বিলম্ব করিলেন না।

দ্বিতীয় দিন একটা খালি গুদাম তাঁহারা আমাদিগকে দিলেন এবং সেই স্থানে রোগীদিগকে লইয়া যাইতে বলিলেন। উহা সাফ করার ভার মিউনিসিপালিটি লইতে পারিলেন না। বাড়ীটা অপরিষ্কার ছিল। আমরা গিয়া উহা সাফ্ করিলাম। খাটিয়া ইত্যাদি সামগ্রী সহানুভূতি-পরায়ণ ভারতবাসীদের সাহায্যে সংগ্রহ করিয়া তখনকার কাজ চালাইবার মত হাসপাতাল খাড়া করা হইল। মিউনিসিপালিটি এক নার্স (শুশ্রূষাকারিণী) পাঠাইলেন এবং তাঁহার সহিত ব্রাণ্ডির বোতল ও রোগীদিগের জন্য অন্য দ্রব্যাদিও পাঠাইলেন। ডাক্তার গড্‌ফ্রে যেমন ভারপ্রাপ্ত ছিলেন তেমনি রহিলেন।

শুশ্রূষাকারিণীর রোগীদিগকে স্পর্শ করিতে হয়। নার্স নিজে স্পর্শ করিতে প্রস্তুত ছিলেন। ইনি স্বভাবতঃই দয়ালু ছিলেন।

কিন্তু আমরা ইঁহাকে যাহাতে বিপদের সংস্পর্শে আসিতে না হয় তাঁহার জন্যই যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছি।

রোগীদিগকে মাঝে মাঝে ব্রাণ্ডী খাওয়ানোর নির্দ্দেশ ছিল। নার্স ছোঁয়াচ হইতে বাঁচিবার জন্য আমাদিগকেও কিছু কিছু ব্রাণ্ডী খাওয়ার নির্দ্দেশ দিলেন এবং নিজেও খাইতে আরম্ভ করিলেন। আমাদের মধ্যে ব্রাণ্ডী খায় এমন কেহ ছিল না। আমার ত রোগীদিগকেও ব্রাণ্ডী দেওয়ার ইচ্ছা হইল না। ডাক্তার গড্‌ফ্রের অনুমতি লইয়া যাহারা ব্রাণ্ডী না খাইতে ও মাটি প্রয়োগ করিতে স্বীকার করিয়াছিল, এমন তিন জনের মাথায় ও বুকে যেখানে ব্যথা হইত সেইখানে মাটির ব্যাণ্ডেজের প্রয়োগ করিলাম। এই তিনজন রোগীর ভিতর দুই জন বাঁচিল, বাকী সকল রোগীরই দেহান্ত হইল। বিশজন রোগী ত সেই গুদামেই প্রাণত্যাগ করিল।

মিউনিসিপালিটি অন্যান্য ব্যবস্থা করিতেছিলেন। জোহানেসবর্গ হইতে সাত মাইল দূরে একটি 'লেজারেটো' অর্থাৎ সংক্রামক রোগের হাসপাতাল ছিল। সেইখানে তাঁবু খাড়া করিয়া এই দুই জন রোগীকে তাঁহারা লইয়া গেলেন। আর যদি নূতন কেহ প্লেগে আক্রান্ত হয় তবে তাহাকেও সেইখানে লওয়ার ব্যবস্থা করা হইল। আমরা এই কার্য্য হইতে মুক্ত হইলাম। অল্পদিনেই আমরা সংবাদ পাইলাম যে, সেই ভাল মানুষ নার্সটীরও প্লেগ হইয়াছিল, তাঁহার দেহান্ত হইয়াছে। কেন যে সেই রোগীরা বাঁচিয়াছিল, আর আমাদিগকেও রোগ স্পর্শ করে নাই তাহা কেহ বলিতে পারে না। তবে ইহার পর মাটির প্রয়োগের উপর আমার শ্রদ্ধা ও ঔষধ হিসাবে ব্রাণ্ডীর উপর আমার অশ্রদ্ধা আরও বাড়িল।

আমি জানি যে, এই শ্রদ্ধা ও অশ্রদ্ধা কোন বিশেষ প্রমাণের উপর প্রতিষ্ঠিত নহে। কিন্তু আমার উপর তখন যে ছাপ পড়িয়াছিল এবং যাহা আজ অবধিও চলিয়া আসিতেছে, তাহা আমি ধুইয়া ফেলিতে পারি না। সেইজন্য এই প্রসঙ্গে উহার উল্লেখ করা আবশ্যক মনে করি।

এই প্লেগ দেখা দেওয়ার পরই আমি সংবাদপত্রে এক কড়া চিঠি লিখি। তাহাতে আমি 'লোকেশন' হাতে লওয়ার পর সমস্ত অব্যবস্থার জন্য ও এই প্লেগের জন্য মিউনিসিপালিটিকেই দায়ী করি। সেই পত্রের জন্যই আমি মিঃ হেনরী পোলককে পাইয়াছিলাম। আর সেই পত্রই, পরলোকগত জোসেফ ডোকের সহিত আমার বন্ধুত্বের অন্যতম কারণ।

পূর্বের এক অধ্যায়ে আমি জানাইয়াছি যে, আমি খাওয়ার জন্য এক নিরামিষ ভোজন-গৃহে যাইতাম। সেইখানে মিঃ আলবার্ট ওয়েষ্টের সহিত আমার পরিচয় হয়। আমার সহিত প্রতি সন্ধ্যায় এই ভোজন-গৃহে তাঁহার দেখা হইত। ওয়েষ্ট এক ছোট ছাপাখানার অংশীদার ছিলেন। তিনি সংবাদপত্রে প্লেগের সম্পর্কে আমার লিখিত পত্রখানি পড়িয়াছিলেন ও আমাকে ভোজনের সময় হোটেলে না দেখিয়া ব্যস্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন।

আমি ও আমার সঙ্গী সেবকেরা প্লেগের সময় এক রকম কিছু খাইতাম না। অনেক দিন হইতে আমার ধারণা ছিল যে, মড়ক আরম্ভ হইলে পেট যত কম ভারী থাকে ততই ভাল। এই জন্য আমি বৈকালে খাওয়া বন্ধ করিয়াছিলাম। দুপুরের খাওয়া ও লোকের সহিত মেলামেশা হইতে দূরে থাকিবার জন্য, কেহ আসিবার

পূর্ব্বে খাইয়া আসিতাম। ভোজনগৃহের মালিকের সহিত আমার প্রগাঢ় পরিচয় ছিল। তাঁহাকে আমি বলিয়া দিয়াছিলাম যে, আমি মড়কের রোগী সেবা করিতেছি, সেইজন্য অপরের সহিত যতটা পারি কম স্পর্শ রাখিতে চাই।

আমাকে হোটেলে না দেখিতে পাওয়ায় দ্বিতীয় কি তৃতীয় দিনের খুব ভোরেই যখন আমি বেড়াইতে বাহির হওয়ার জন্য তৈরী হইতেছিলাম, তখন ওয়েষ্ট আমার দরজায় ঘা দিলেন। বাহির হইতেই ওয়েষ্ট বলিলেন—"তোমাকে হোটেলে না দেখিয়া আমি ভয় পাইয়াছিলাম। ভাবিতেছিলাম—তোমার কিছু হয় নাই ত! সেইজন্যই এসময় তোমার সহিত দেখা করিতে আসিয়াছি। আমার দ্বারা কোনও সাহায্য যদি হইতে পারে তবে বলিও। আমি রোগীদিগকে শুশ্রূষা করার জন্য প্রস্তুত আছি। তুমি ত জান যে, আমার উপর আমার নিজের পেট ভরাইবার ভার ব্যতীত আর কোনও দায়িত্ব নাই।"

আমি ওয়েষ্টকে কৃতজ্ঞতা জানাইলাম এবং এক মিনিটও বিবেচনার সময় না লইয়া বলিলাম:—"তোমাকে নার্সের কাজের জন্য আমি লইব না। যদি আর রোগী না হয়, তবে আমার কাজ দুই এক দিনেই চুকিয়া যাইবে। তবে আর একটি কাজ আছে সত্য।"

"কি সে কাজ?"

"তুমি ডারবানে যাইয়া 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' প্রেসের ব্যবস্থার ভার লইবে? মদনজিৎ ত এখন এইখানেই কাজে আট্‌কা পড়িয়াছেন। সেখানে কাহারও যাওয়া আবশ্যক। তুমি যদি যাও, তবে আমার ওদিক্‌কার চিন্তা হাল্কা হইয়া যায়।"

ওয়েষ্ট জবাব দিলেন—"আমার হাতে ছাপাখানা আছে তাহা ত তুমি

জানি। যাওয়ার জন্য আমি অনেকটা তৈরী আছি। শেষ জবাব বৈকালে দিলে হয় না? বেড়াইতে বাহির হইয়া সেই সময় কথা বলিব।"

আমি আহ্লাদিত হইলাম। সেই দিন সন্ধ্যায় কিছু কথাবার্ত্তা হইল। স্থির হইল—ওয়েষ্টকে প্রতি মাসে দশ পাউণ্ড বেতন ও ছাপাখানায় যদি কোনও লাভ হয় তবে তাহার একটা অংশ দেওয়া হইবে। ওয়েষ্ট টাকার জন্য যাইতেছিলেন না, সেইজন্য তাঁহার নিকট বেতনের প্রশ্ন একটা প্রশ্নই ছিল না। দ্বিতীয় দিবস রাত্রির মেলে ওয়েষ্ট তাঁহার বাকী পাওনা আদায়ের ভার আমার উপর দিয়া ডারবান্ যাওয়ার জন্য রওনা হইলেন। সেই হইতে দক্ষিণ আফ্রিকা ত্যাগ না করা পর্য্যন্ত তিনি আমার সুখ-দুঃখের সাথী ছিলেন।

বিলাতের লাউথের এক কৃষক-পরিবারের ছেলে ওয়েষ্ট। স্কুলে সামান্য শিক্ষা প্রাপ্ত, নিজের পরিশ্রমলব্ধ অভিজ্ঞতার স্কুলে শিক্ষিত, শুদ্ধ, সংযমী, ঈশ্বরভীরু, সাহসী, পরোপকারী ইংরাজ বলিয়া আমি ওয়েষ্টকে বরাবর জানিয়াছি। তাঁহার ও তাঁহার পরিবারের পরিচয় পশ্চাতের অধ্যায় সমূহে বর্ণিত হইবে।

১৭

'লোকেশন' দহন

আমি ও আমার সঙ্গীরা 'লোকেশনের' পীড়িতদের শুশ্রূষা কার্য্য হইতে যেমন মুক্ত হইলাম, তেমনি মড়ক হইতে উৎপন্ন অন্য কার্য্য আসিয়া মাথার উপর চাপিয়া পড়িল।

'লোকেশনের' স্থিতি-সম্বন্ধে মিউনিসিপালিটি অবহেলা করিলেও গোরা-বাসিন্দাদের জন্য ২৪ ঘণ্টাই সজাগ থাকিত। তাহাদের স্বাস্থ্য রক্ষার জন্য টাকা খরচ করিতে তাহার কৃপণতা ছিল না এবং এখন মড়ক যাহাতে আর ছড়াইয়া না পড়ে তাহার জন্য জলের ন্যায় টাকাও ঢালিতে লাগিল। ভারতবর্ষীয়দের প্রতি ব্যবহারে আমি মিউনিসিপালিটির খুবই দোষ দেখিয়াছি, কিন্তু গোরাদের জন্য এই উদ্বেগের জন্য আমি মিউনিসি-পালিটিকে সম্মান না করিয়া থাকিতে পারিলাম না। এবং এই শুভ চেষ্টায় আমার দ্বারা যতটা সাহায্য হইতে পারে তাহাকে তাহা দিলাম। আমার বিশ্বাস, আমি যদি তাহাকে ঐ প্রকার সাহায্য না করিতাম, তবে মিউনিসিপালিটিকে মুস্কিলে পড়িতে হইত, বন্দুক ব্যবহার করিতে হইত, এবং নিজ সঙ্কল্প অনুসারে কার্য্য করিতে গিয়া হয় ত ইহা অপেক্ষাও গুরুতর কোন অন্যায় তাহাকে করিতে হইত।

কিন্তু সে সকল কিছু করিতে হয় নাই। ভারতীয়দের ব্যবহারে মিউনিসিপাল কর্ম্মচারীরা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন এবং তাঁহাদের পক্ষে কাজও ঢের সহজ হইয়া গিয়াছিল। মিউনিসিপালিটির নির্দ্দেশ অনুযায়ী চলার জন্য ভারতবাসীদের উপর আমার সমুদয় প্রভাব প্রয়োগ করিয়াছিলাম।

নির্দেশ পালন করা তাহাদের পক্ষে খুবই কঠিন ছিল। কিন্তু একজনও আমার কথা অমান্য করিয়াছে এমন স্মরণ হয় না।

'লোকেশন' হইতে যাহাতে কেহ বিনা হুকুমে বাহির না হইতে পারে অথবা প্রবেশ না করিতে পারে সেজন্য চারিদিকে পাহারা বসিয়াছিল। কিন্তু আমার সঙ্গীদের ও আমার যাতায়াতের খোলা হুকুম ছিল। মিউনিসিপালিটি সঙ্কল্প করেন যে, 'লোকেশন'বাসী সকলকে জোহানেস্‌বর্গ হইতে তের মাইল দূরবর্ত্তী খোলামাঠে তাঁবু খাটাইয়া তিন সপ্তাহের জন্য বাস করিতে হইবে এবং 'লোকেশন' জ্বালাইয়া দেওয়া হইবে। তাঁবু খাটাইয়া নূতন গ্রাম বসাইতে, সেখানে খাদ্যাদি দ্রব্য লইয়া যাইতে কয়েকদিন প্রয়োজন। আর সেই জন্যই কয়েক দিনের জন্য পাহারা বসানো আবশ্যক ছিল।

লোকে খব ভীত হইয়া পড়ে; তবে আমি তাহাদের নিকটে থাকায় আশ্বাস পাইয়াছিল। ইহাদের মধ্যে অনেক গরীব নিজেদের টাকা পয়সা ঘরের ভিতর পুতিয়া রাখিত। এখন তাহা খুঁড়িয়া তুলিতে হইল। তাহাদের ব্যাঙ্ক ছিল না, ব্যাঙ্কের ব্যবহার তাহারা জানিত না। আমি তাহাদের ব্যাঙ্ক হইলাম। আমার কাছে টাকা পয়সার স্তূপ হইল। এই কার্য্যের জন্য আমার পারিশ্রমিক লওয়ার কথাই উঠিতে পারে না। কষ্টেসৃষ্টে আমি এই কাজের ব্যবস্থা করিয়া ফেলিলাম।

আমার ব্যাঙ্কের ম্যানেজারের সহিত আমার ভাল রকমেরই পরিচয় ছিল। তাঁহার কাছে সমস্ত টাকা পাঠাইতে হইবে তাহা তাঁহাকে জানাইলাম। ব্যাঙ্কসমূহ তামা ও রূপার মুদ্রা জমা লওয়ার জন্য বড় রাজি নয়। তার উপর মড়কক্ষেত্র হইতে আনীত টাকাপয়সা স্পর্শ করিতে কেরাণীদের দ্বিধা হওয়ারও সম্ভাবনা ছিল। ম্যানেজার আমার সকল

অসুবিধা দূর করিয়া দিলেন। টাকাপয়সাগুলি বীজনাশক জলে ধুইয়া ব্যাঙ্কে পাঠানো স্থির হইল। আমার স্মরণ হয়, ইহাতে প্রায় ২০,০০০ পাউণ্ড (নয়লক্ষ টাকা) ব্যাঙ্কে রাখা হইয়াছিল। যাহাদের নিকট কিছু বেশী পরিমাণ টাকা আছে তাহাদিগকে আমি নির্দিষ্ট সময়ের জন্য তাহা সুদে ব্যাঙ্কে স্থায়ী আমানত রাখিবার পরামর্শ দিলাম। এবং তাহারা আমার সে পরামর্শ গ্রহণ করিয়াছিল। ইহার ফলে তাহাদের কাহারও কাহারও ব্যাঙ্কে টাকা রাখার অভ্যাস হইয়াছিল।

জোহানেসবার্গের নিকটেই ক্লিপস্প্রুট ফার্ম নামে জায়গা আছে। সেইখানে 'লোকেশন'বাসীদিগকে স্পেশাল ট্রেনে লইয়া যাওয়া হয়। এখানে তাহাদের খাওয়া-দাওয়ার খরচা মিউনিসিপালিটিই যোগাইয়াছিল। এই তাবুর গ্রাম দেখিতে সিপাহীদের ছাউনীর মত হইয়াছিল। লোকের এই রকমে থাকার অভ্যাস নাই বলিয়া মানসিক দুঃখ কিছু হইয়াছিল সত্য, ও খানিকটা নূতন নূতনও ঠেকিতেছিল, কিন্তু সত্যকারের অসুবিধা কিছু ভুগিতে হয় নাই।

আমি প্রতিদিন একবার বাইসাইকেলে চড়িয়া যাইতাম। তিন সপ্তাহকাল খোলা হাওয়ায় থাকিয়া লোকের স্বাস্থ্যও অবশ্যই ভাল হইয়াছিল। আর মানসিক দুঃখ ত প্রথম ২৪ ঘণ্টা না যাইতেই ভুলিয়া গিয়াছিল। তারপর তাহারা আনন্দে থাকিতে আরম্ভ করিয়াছিল। আমি যখনই গিয়াছি, তখনই দেখিয়াছি ভজন-কীর্তন, আমোদ-আহ্লাদ চলিতেছে।

আমার স্মরণ আছে যে, তাহারা যেদিন 'লোকেশন' খালি করিয়া চলিয়া যায় তাহার পর দিবসেই উহা দগ্ধ করা হয়। উহা হইতে একটা জিনিসও বাঁচাইবার চেষ্টা মিউনিসিপালিটি করে নাই। এই কারণেই

বাজারে মিউনিসিপালিটির নিজের যে কাঠের গোলা ছিল তাহার সমস্ত কাঠও পোড়াইয়া দেওয়া হয়। ইহাতে তাহার প্রায় দশ হাজার পাউণ্ড লোকসান হয়। বাজারে মরা ইন্দুর পাওয়াই এই চূড়ান্ত উপায় গ্রহণ করার হেতু। অজস্র টাকা যেমন খরচ হইয়াছিল, ফলে তেমনি মড়ক আর বাড়িতে পারে নাই। সহর নির্ভয় হইয়াছিল।

১৮

পুস্তকের যাদুমন্ত্র

এই মড়কের জন্য, গরীব ভারতবাসীদের উপর আমার প্রভাব, আমার ব্যবসা ও আমার দায়িত্ব বাড়িল। ইউরোপীয়ানদের মধ্যে আমার যে পরিচয় বাড়িয়া চলিয়াছিল উহাও এই ব্যাপারে এত ঘনিষ্ঠ হইল যে, তাহাতে আমার নৈতিক দায়িত্ব আরও বাড়িয়া গেল।

ওয়েষ্টের মতই পোলকের সঙ্গেও আমার পরিচয় নিরামিষ ভোজন-গৃহেই হয়। আমি যে টেবিলে বসিতাম তাহা হইতে একটু দূরে এক টেবিলে একদিন এক নবযুবক আহার করিতেছিলেন। তিনি আমার সহিত কথা বলার জন্য নিজের নাম পাঠাইয়া দিলেন। আমি তাঁহাকে আমার টেবিলে আসার জন্য নিমন্ত্রণ করিলাম। তিনি আসিলেন।

"আমি 'ক্রিটিক, কাগজের সহকারী সম্পাদক। আপনার মড়ক সম্বন্ধে পত্র পড়িয়াছি, তাহার পর আপনার সহিত দেখা করার আমার খুব ইচ্ছা হইয়াছে। আজ আমার সেই সুযোগ হইয়াছে।"

মিঃ পোলকের অকপট ভাবে আমি তাঁহার দিকে আকৃষ্ট হইলাম। সেই রাতে আমাদের পরস্পর পরিচয় হইয়া গেল, এবং জীবনযাত্রা সম্বন্ধে আমাদের পরস্পরের ধারণার ভিতর যে খুব সমতা আছে তাহাও বুঝিতে পারিলাম। সাদাসিধা জীবনযাত্রা তাঁহার পছন্দ ছিল। তাঁহার বুদ্ধিতে যদি কিছু ভাল লাগে তবে তদনুযায়ী আচরণ করার ক্ষমতা তাঁহার আশ্চর্য্য রকমের ছিল। নিজের জীবনে তিনি কতকগুলি পরিবর্ত্তন ত একেবারে হঠাৎ করিয়া ফেলিয়াছেন।

''ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' খরচ বাড়িয়াই যাইতেছিল। ওয়েষ্টের প্রাথমিক রিপোর্টই আমাকে ভয় পাওয়াইবার মত ছিল। তিনি লিখিয়াছেন—"আপনি যেমন বলিয়াছেন এ কাজে তেমন লাভ নাই, আমি ত লোকসান দেখিতেছি। হিসাবপত্রের অব্যবস্থা আছে, ধার বাকী অনেক আছে, তাহা আদায় হওয়ারও সম্ভাবনা নাই। অনেক পরিবর্ত্তন করিতে হইবে। কিন্তু লাভ নাই বলিয়াই যে কাজ ছাড়িয়া দিব, তাহা নয়।"

লাভ নাই বলিয়া ওয়েষ্ট কাজ অনায়াসেই ছাড়িয়া দিতে পারিতেন, আমিও তাঁহাকে কোনও দোষ দিতে পারিতাম না। কেবল তাহাই নয়, উপযুক্ত প্রমাণ বিনা ঐ কাজকে লাভজনক বলার জন্য আমাকে তিনি দোষও দিতে পারিতেন। কিন্তু তিনি আমাকে কখনো একটা কড়া কথাও শোনান নাই। আমার মনে হয় যে, এই নূতন অনুভব হইতে ওয়েষ্ট আমার সম্বন্ধে এই ধারণা করিয়াছিলেন যে, আমি অল্পেতেই বিশ্বাস করিয়া ফেলি। মদনজিতের কথায় কোনও প্রমাণের অপেক্ষা না করিয়াই আমি ওয়েষ্টকে লাভের কথা বলিয়াছিলাম। আমার মনে হয়, যাঁহারা সাধারণের কাজ করেন, তাঁহাদের এই বিশ্বাসের উপর নির্ভর না করিয়া যাহা নিজে অনুসন্ধান করিয়া জানা গিয়াছে তাহাই বলা উচিত। সত্যের পূজারীর ত খুবই সাবধান হওয়া আবশ্যক। কোনও বিষয়ে পুরা অনুসন্ধান না করিয়া সে বিষয় সম্বন্ধে অপরের বিশ্বাস জন্মাইয়া দেওয়ায় সত্যের উপর আঘাত করা হয়। আমার দুঃখ হয় যে, ইহা জানিয়াও তাড়াতাড়ি বিশ্বাস করিয়া কাজ করিয়া লওয়ার ইচ্ছায় আমার প্রকৃতিগত অভ্যাসকে এখনও সম্পূর্ণ সংশোধন করিতে পারি নাই। শক্তির অপেক্ষা অধিক কাজ করার

লোভের পরিচয় ইহাতে পাওয়া যায়। এই লোভ হইতে আমি গোলে পড়ি ও আমার অপেক্ষা সাথীদিগকে আরও বেশী গোলমালে ফেলি।

ওয়েষ্টের এই পত্র পাইয়া আমি নাতাল রওনা হইলাম। পোলক ত আমার সমস্ত কথাই জানিতেন। আমাকে তুলিয়া দিতে তিনি ষ্টেশনে আসিয়াছিলেন। "এই পুস্তক রাস্তায় পড়ার উপযুক্ত, ইহা পড়িয়া দেখিবেন, আপনার নিশ্চয় ভাল লাগিবে"—এই বলিয়া রাস্কিনের 'আনটু দিস্ লাষ্ট (Unto this last) নামক বইখানা তিনি আমার হাতে দিয়া গেলেন।

পুস্তকখানা পড়িতে লইয়া দেখিলাম উহা আর রাখিতে পারা যায় না। উহা আমার মনকে আকর্ষণ করিয়া লইল। জোহানেসবর্গ হইতে নাতাল ২৪ ঘণ্টার মত রাস্তা। ট্রেণ সন্ধ্যাবেলায় ডারবান পঁহুছে। সেখানে পঁহুছিয়া সারা রাত ঘুম আসিল না। পুস্তকের প্রদর্শিত আদর্শ কার্য্যতঃ গ্রহণ করার জন্য কৃতনিশ্চয় হইলাম।

ইহার পূর্ব্বে রাস্কিনের কোনও বহি আমি পড়ি নাই। বিদ্যাভ্যাস কালে আমি পাঠ্য পুস্তকের বাহিরে কিছুই পড়ি নাই বলা যায়। কর্ম্মক্ষেত্রে প্রবেশ করার পরও খুব কমই পড়িয়াছি। এমন কি আজও একথা বলা যায় যে, আমার পুস্তকের জ্ঞান খুবই কম। এই অনায়াস-লব্ধ বা বাধ্যতামূলক সংযম দ্বারা আমার ক্ষতি হয় নাই বলিয়াই আমি মনে করি। যে অল্পস্বল্প পুস্তক পড়িয়াছি তাহা আমি ভালরকম হৃদগত করিয়াছি একথা বলা যায়। এই সকল পুস্তকের মধ্যে এই খানাই আমার জীবনে তখন তখনই মহত্বপূর্ণ পথ গ্রহণ করার উপযুক্ত পরিবর্ত্তন আনিয়া দিয়াছিল। পরে আমি উহার অনুবাদ করিয়াছিলাম ও তাহার নাম দিয়াছিলাম 'সর্ব্বোদয়'।

যে সমস্ত গভীর বিশ্বাস আমার হৃদয়ে নিহিত ছিল, এই বই খানিতে আমি তাহারই কতকগুলির প্রতিবিম্ব দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেই জন্য এই গ্রন্থ আমার উপর অধিকার বিস্তার করিয়াছিল এবং উহার নির্দ্ধারণ অনুযায়ী আচরণও আমাকে দিয়া করাইয়া লইয়াছিল। নিজের ভিতর যে সকল ভাবনা সুপ্ত থাকে তাহা জাগ্রত করার শক্তি যে ধারণ করে, সেই কবি। সকল কবির সকলের উপর সমান প্রভাব হয় না, কেননা সকলের সকল ভাবনা এক রকমে গঠিত নয়।

সর্ব্বোদয়ের সিদ্ধান্ত আমি এই রকম বুঝিয়াছি :—

১। সকলের ভালতেই নিজের ভাল রহিয়াছে।

২। উকীল ও নাপিতের কার্য্যের মূল্য একই রকম হওয়া চাই, কেননা জীবিকা উপার্জ্জনের অধিকার উভয়েরই সমান।

৩। সাধারণ মজুর ও কৃষকের জীবনই আদর্শ জীবন।

প্রথম বিষয়টি আমি জানিতাম। দ্বিতীয়টি আমি অস্পষ্টভাবে দেখিতে পাইতাম, তৃতীয়টির বিষয় আমি ভাবিই নাই। প্রথমটির ভিতর যে অপর দুইটি সিদ্ধান্তই রহিয়াছে, ইহা "সর্ব্বোদয়" পড়ার পর আমার নিকট দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হইল। প্রাতঃকাল হইলেই আমি ঐ সিদ্ধান্ত অনুযায়ী আচরণ করিতে কৃতনিশ্চয় হইলাম।

১৯

ফিনিক্সের স্থাপনা

প্রাতে আমি প্রথমেই ওয়েষ্টের সহিত কথা বলিলাম। আমার উপর "সর্ব্বোদয়" যে প্রভাব বিস্তার করিয়াছে তাহা শুনাইলাম ও প্রস্তাব করিলাম যে, 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন'কে কোনও এক কৃষি-ক্ষেত্রস্থ বাটিতে লইয়া যাইব। সেখানে সকলেই খাওয়া-পরার জন্য একই রকম উপার্জ্জন করিবে, সকলেই নিজের জন্য চাষ করিবে এবং যে সময় বাঁচিবে তাহা "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের" জন্য ব্যয় করিবে। ওয়েষ্ট এই প্রস্তাবে স্বীকৃত হইলেন। স্থির হইল—প্রত্যেকেই নিজ খরচা সব-চাইতে যত কমে হয় তাহাই করিবেন। সকলেরই মাসিক বৃত্তি তিন পাউণ্ড ধরা হইল। ইহাতে সাদা-কালোর ভেদ রাখা হইবে না।

প্রেসে জনা-দশেক লোক কাজ করিত। প্রথমতঃ, জঙ্গলে যাইয়া বাস করিতে সকলে প্রস্তুত কিনা, দ্বিতীয়তঃ, সকলে এক রকম খাওয়া-পরার যোগ্য রোজগার করিতে রাজি কিনা, ইহাই প্রশ্ন ছিল। আমরা ইহাও স্থির করিলাম যে, এই সর্ত্তে যে রাজি নয়, সে নিজের বেতন পাইবে এবং ক্রমে ক্রমে যাহাতে ঐ সংস্থার অন্তর্ভুক্ত হইয়া যাইতে পারে সেই আদর্শ গ্রহণ করিবে।

এই প্রস্তাব সম্বন্ধে আমি কর্ম্মীদের সহিত কথা আরম্ভ করি। মদনজিৎ ইহা আদৌ গ্রহণ করিতে পারিলেন না। তিনি নিঃসংশয়ে বলিলেন যে, যাহাতে তাঁহার সমস্ত দেহ-মন ঢালিয়া দিয়াছেন তাহা

এক মাসের মধ্যেই ধূলিসাৎ হইয়া যাইবে, 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' চলিবে না, প্রেসও চলিবে না, আর কর্ম্মীরাও পলাইয়া যাইবে। আমার ভাইপো ছগনলাল গান্ধী এই প্রেসে কর্ম করিত। ওয়েষ্টের কাছে প্রস্তাব করার সময়েই আমি তাহার কাছেও ঐ প্রস্তাব করি। তাঁহাকে পরিবার প্রতিপালন করিতে হইত। সে বাল্যকাল হইতে আমার শিক্ষাধীনে থাকিতে ও কাজ করিতে পছন্দ করিত। আমার উপর তাহার গভীর বিশ্বাস ছিল। সে কোনও যুক্তিতর্ক না করিয়াই স্বীকৃত হইল ও আজ পর্যন্তও আমার সাথেই আছে।

তৃতীয় ব্যক্তি গোবিন্দ স্বামী নামে একজন মেশিনম্যান ছিল। সেও রাজি হইল। বাকী সকলে যদিও এক সংস্থা-বাসী হইল না, তথাপি তাহারা প্রেস যেখানেই লইয়া যাই সেখানেই যাইতে রাজি হইল। কর্মীদের সহিত কথাবার্ত্তায় দুই দিনের বেশী লাগিয়াছিল বলিয়া মনে হয় না। আমি সংবাদপত্রে ডারবানের নিকট কোনও রেল ষ্টেশনের কাছে এক টুকরা জমি চাই বলিয়া বিজ্ঞাপন দিলাম। জবাবে ফিনিক্সের জমির প্রস্তাব আসিল। আমি ও ওয়েষ্ট উহা দেখিতে গেলাম। সাতদিনের মধ্যে ২০ একর (৬০ বিঘা) জমি লইলাম। উহাতে একটা ছোট ঝরণা ছিল। কয়েকটা নেবু ও আমের ঝাড় ছিল। এই জমির সংলগ্ন ৮০ একরের আরও এক টুকরা জমি ছিল। উহাতে কিছু গাছ ও একটা ভাঙ্গাঘর ছিল। এই জমিখণ্ডও অল্প দিন পরে খরিদ করিলাম। দুই জমির জন্য দাম পড়িল ১০০০ পাউণ্ড।

শেঠ পার্শী রুস্তমজী আমাকে এই ধরণের সাহসিক কাজের প্রশ্রয় দিতেন। আমার এই ব্যবস্থা তাঁহার মনঃপূত হইল। একটা ঝড়

গুদামের করগেট্ টিন ও গৃহ নির্ম্মাণের অন্য জিনিষপত্র যাহা তাঁহার নিকট ছিল, তিনি বিনামূল্যে দিলেন। তারপর নির্ম্মাণ কার্য্য আরম্ভ করিলাম। কয়েকজন ভারতীয় ছুতার ও রাজমিস্ত্রী লড়াইয়ের সময় আমার সহিত ছিল। তাহাদিগকে ডাকিয়া আনিলাম। তাহাদের সাহায্যে কারখানা তৈরীর কাজ আরম্ভ হইল। এক মাস মধ্যে ঘর তৈরী হইয়া গেল, উহা ৭৫ ফুট লম্বা ও ৫০ ফুট চওড়া ছিল। ওয়েষ্ট প্রভৃতি শারীরিক বিপদের আশঙ্কা-সত্ত্বেও উহাদের সহিত কাজে লাগিয়া গেলেন।

ফিনিক্সে খুব ঘাস ছিল, আর লোকের বাস আদৌ ছিল না। সেই জন্য সাপের উপদ্রব ও ভয় ছিল। প্রথমে সকলেই তাঁবু খাটাইয়া থাকিত। প্রধান ঘরখানা তৈরী হওয়ার এক সপ্তাহের মধ্যেই সব জিনিষপত্র গাড়ী করিয়া সেখানে লইয়া যাওয়া হইল। ডারবান ও ফিনিক্সের মধ্যে ১৪ মাইল ব্যবধান। ফিনিক্স ষ্টেশন হইতে আধ মাইল দূরে অবস্থিত।

মাত্র এক সংখ্যা 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' 'মার্কারি' প্রেসে ছাপাইতে হইয়াছিল।

আমার সাথে যেসকল কুটুম্ব ও বন্ধু ভারতবর্ষ হইতে সেখানে গিয়াছিলেন ও ব্যবসা আরম্ভ করিয়া দিয়াছিলেন, তাঁহাদিগকে আমার মতে আনিতে ও ফিনিক্সে প্রবেশ করাইতে যত্ন করিতে লাগিলাম। তাঁহারা সকলেই টাকা রোজগারের জন্যই দক্ষিণ আফ্রিকায় আসিয়াছিলেন। সুতরাং তাহাদিগকে বোঝানো মুস্কিল ছিল। তবুও অনেককে বুঝাইয়া রাজি করিয়াছিলাম। তাঁহাদের সকলের মধ্যে আমি মগনলাল গান্ধীর নাম বিশেষ করিয়া বলিতেছি; কেননা, আর যাঁহা-

দিগকে বুঝাইয়াছিলাম, তাঁহারা অল্পদিন ফিনিক্সে থাকিয়া আবার অর্থ-সঞ্চয়ে লাগিয়া গিয়াছিলেন। মগনলাল গান্ধী * নিজের ব্যবসা ত্যাগ করিয়া সেই যে আসিয়াছেন, সেই হইতেই আমার সাথে রহিয়াছেন। তিনি নিজের বুদ্ধিবলে, ত্যাগশক্তিতে ও অনন্যভক্তিতে আমার আধ্যাত্মিক পরীক্ষাক্ষেত্রে আমার মূল সাথীদের মধ্যে প্রধান পদ লইয়া আছেন এবং স্বয়ং শিক্ষিত কারিগর বলিয়া তাঁহাদের মধ্যে আমার দৃষ্টিতে অদ্বিতীয় স্থান লাভ করিয়াছেন।

এই প্রকারে ১৯০৪ সালে ফিনিক্সের স্থাপনা হয়। এবং বহু বিড়ম্বনা সত্ত্বেও ফিনিক্স-সংস্থা ও "ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন" আজও টিকিয়া আছে। এই সংস্থার আরম্ভের সময়কার বিঘ্ন ও বাসিন্দাদের আশা-নিরাশার দ্বন্দ্ব আলোচনার যোগ্য। উহা অন্য অধ্যায়ে আলোচিত হইবে।

---

* গত ১৯২৮ সালে তিনি দেহত্যাগ করিয়াছেন।

২০

প্রথম রাত্রি

ফিনিক্স হইতে প্রথম সংখ্যার 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' বাহির করা সহজে সম্ভব হয় নাই। দুইটি বিষয়ে সাবধান হওয়ার খেয়াল আমার না হইলে, এক সংখ্যা এক সপ্তাহ বন্ধ থাকিত অথবা বিলম্বে বাহির হইত। এই সংস্থায় এঞ্জিন দ্বারা প্রেস চালাইবার ব্যবস্থা করার ইচ্ছা আমার ছিল না। যেখানে কৃষিকর্ম হাতেই করা হইবে, সেখানে ছাপার কার্য্যও হাতে চালানো যন্ত্র দ্বারা করাই আমার অভিপ্রায় ছিল। কিন্তু তাহা সম্ভবপর না হওয়ায় ওখানে একটা অয়েল এঞ্জিন লইয়া যাওয়া হয়। কিন্তু এই অয়েল এঞ্জিন যদি বিগড়ায়, তবে তখনকার কাজ চালাইবার অন্য কোনও ব্যবস্থা রাখিতে পারিলে ভাল হয়, এই প্রস্তাব আমি ওয়েষ্টকে দিয়াছিলাম। সেইজন্য তিনি হাতে চালাইবার জন্যও একটা চাকা লাগাইয়া রাখিয়াছিলেন ও তাহাদ্বারা ছাপার মেসিন যাহাতে চালানো যায়, সে ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। কাগজের আকার দৈনিক পত্রের মত ছিল। বড় যন্ত্র যদি বিগড়ায় তবে তাহা শীঘ্র মেরামত হইতে পারে এমন সুবিধা সেখানে ছিল না। তাহা হইলে কাগজ বন্ধ হওয়ার সম্ভাবনা। এই অসুবিধার আশঙ্কায় কাগজের আকার বদলাইয়া সাধারণ সাপ্তাহিকের মত করা হইয়াছিল—যেন অসুবিধা উপস্থিত হইলে ছোট ট্রেডল মেসিনেও কিছু ছাপানো যায়। প্রথম প্রথম 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' প্রকাশের পূর্ব্বরাত্রিতে ছোট বড় সকলকেই জাগিতে হইত। পাতা ভাঁজ

করার কাজে ছোট বড় সকলেই লাগিত। উহা রাত্রি দশ বারটায় শেষ হইত। কিন্তু প্রথম রাত্রির কথা ভুলিবার নয়। ছাপাইবার ব্যবস্থা সব সম্পূর্ণ, কিন্তু এঞ্জিন চলে না। এঞ্জিন বসাইবার ও চালাইবার জন্য একজন এঞ্জিনিয়ার আনা হইয়াছিল। সে ও ওয়েষ্ট অক্লান্ত পরিশ্রম করিয়াও এঞ্জিন চালাইতে পারিল না। সকলেই চিন্তিত হইয়া পড়িল। অবশেষে নিরাশ হইয়া জলভরা চোখে আমার কাছে আসিয়া ওয়েষ্ট বলিল—"এঞ্জিন আজ আর চলিতেছে না, সুতরাং এই সপ্তাহের কাগজ সময়মত বাহির করার কোনও সম্ভাবনা নাই।"

"যদি তাহাই হয় তবে আমরা নাচার। কিন্তু তাহাতে চোখের জল ফেলিবার কারণ নাই। এখনো যদি কিছু করার থাকে তবে তাহাই করা যাক্। সে হাত চাকার কি হইল?" এই বলিয়া আমি তাহাকে আশ্বস্ত করিলাম।

ওয়েষ্ট বলিল—"হাতচাকা চালাইবার লোক আমাদের কাছে কোথায়? আমরা যাহারা আছি তাহাদের দ্বারা চাকা চলিবে না। উহা চালাইবার জন্য এক এক বারে চার চারজন লোক চাই। আমাদের লোক সকলেই অত্যন্ত ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছে।"

ছুতারের কাজ শেষ হইতে তখনও বাকী ছিল। সেইজন্য ছুতারেরা তখনও বিদায় হয় নাই। তাহারা ছাপাখানাতেই শুইয়া থাকিত। তাহাদিগকে দেখাইয়া আমি বলিলাম—"কিন্তু এই সকল মিস্ত্রী আছে, ইহাদের কথা কি বল? আজ এই কাজের জন্য ইহারা ও আমরা সকলে সারা রাত জাগিব। আমার মনে হয়, এই কর্ত্তব্যই বাকী আছে।"

"মিস্ত্রীদিগকে উঠাইতে ও তাহাদের সাহায্য চাহিতে আমার সাহস হয় না, আর আমাদের লোকেরা সত্য সত্যই অত্যন্ত পরিশ্রান্ত।"

আমি বলিলাম, "উহা আমার কাজ।"

"যদি সম্ভব হয় তবে আপনি ব্যবস্থা করুন।"

আমি মিস্ত্রীদিগকে জাগাইয়া তাহাদের সাহায্য চাহিলাম। তাহাদিগকে বেশী বলিতে হইল না। তাহারা বলিল—"এমন সময় যদি আমরা কাজে না লাগি, তবে আমরা কেমন মানুষ? আপনারা আরাম করুন, আমরা চাকা চালাইতে জানি। ইহাতে আমাদের তেমন মেহনৎ হয় না।"

ছাপাখানার লোকেরা ত তৈরী ছিলই।

ওয়েষ্টের আনন্দের পার রহিল না। উহারা কাজ আরম্ভ করিয়া দিলে, তিনি ভজন আরম্ভ করিয়া দিলেন। মিস্ত্রীদের এক দলের পর অপর দলের কাজ করিবার ব্যবস্থা আমি করিয়া দিলাম। কাজ চলিতে লাগিল। প্রাতে ৭টা বাজে। আমি দেখিলাম, কাজ শেষ হইতে তখনও ঢের বাকী। ওয়েষ্টকে বলিলাম,—"এখন ইঞ্জিনিয়ারকে জাগানো যায় না? দিনের আলোতে যদি চেষ্টা করে, আর যদি এঞ্জিন চলে, তবে সময়মত কার্য্য শেষ হইবে।

ওয়েষ্ট ইঞ্জিনিয়ারকে উঠাইয়া দিল। সে তখনই উঠিয়া এঞ্জিন ঘরে চলিয়া গেল। এবার চেষ্টা করিতেই এঞ্জিন চলিতে আরম্ভ করিল। প্রেস আনন্দের কলরবে ভরিয়া উঠিল। এ কেমন করিয়া হইল? রাত্রিতে এত পরিশ্রম করাতেও এঞ্জিন চলিল না, আর এখন যেন কোন দোষই ছিল না এমনি ভাবে চালানো মাত্রই চলিতে লাগিল?"

ওয়েষ্ট অথবা ইঞ্জিনিয়ার জবাব দিলেন,—"ইহার উত্তর দেওয়া মুস্কিল। যন্ত্রেরও, মনে হয় আমাদের মতই বিশ্রাম দরকার এবং সেই জন্য এতক্ষণ হয়ত এঞ্জিনটি ঐরকম অবস্থায় ছিল।"

আমি মনে করি, এই এঞ্জিন না চলার ভিতর দিয়া আমাদের সকলের পরীক্ষাই হইতেছিল, আর এখন ঠিকভাবে চলায় শুদ্ধভাবে খাটার শুভ ফলই আমরা পাইয়াছিলাম।

কাগজ নিয়মমত ষ্টেশনে পঁহুছিল ও সকলে নিশ্চিন্ত হইল।

এই আগ্রহের পরিণামে কাগজ যে নিয়মমত বাহির হওয়াই চাই, সকলের মনে এই ভাব জাগ্রত হইল। ইহাতে ফিনিক্সে শ্রম করার আবহাওয়াও গড়িয়া উঠিল। এই সংস্থায় ইহার পর এমন এক সময় আসিয়াছিল যখন ইচ্ছাপূর্ব্বক এঞ্জিন চালানো বন্ধ করিয়া দৃঢ় নিষ্ঠার সহিত হাতে চালাইয়াই কাগজ বাহির করা হইয়াছে। ফিনিক্সের ঐ সময়টাই শ্রেষ্ঠ হইতেও শ্রেষ্ঠ নৈতিক উন্নতির কাল ছিল বলিয়া আমি মনে করি।

২১

পোলক ঝাঁপ দিলেন

ফিনিক্সের মত সংস্থা স্থাপন করিয়া আমি তাহাতে অল্প সময়ই বাস করিতে পারিয়াছি, এ দুঃখ আমার বরাবর রহিয়া গিয়াছে। স্থাপনার সময় আমার কল্পনা ছিল আমি নিজেও ঐখানেই থাকিব, আমার জীবিকা ঐ স্থান হইতেই উপার্জ্জন করিব, ফিনিক্সে থাকিয়া যে সেবা করা যায় তাহাই করিব ও ফিনিক্সের সফলতাকেই আনন্দরূপে গণ্য করিব। কিন্তু এই সঙ্কল্প কাজে পরিণত করিতে পারি নাই। আমার অভিজ্ঞতায় আমি ইহা অনেকবার দেখিয়াছি যে, নিজের ইচ্ছার কোথাও না কোথাও অন্যথা হয়। কিন্তু এই সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আমার অভিজ্ঞতা হইয়াছে যে, যেখানে সত্যের সাধনা ও উপাসনা রহিয়াছে, সেখানে আমাদের ইচ্ছার অনুরূপ ফল না হইলেও, ইচ্ছার বিপরীত ফল হইলেও তাহার পরিণাম অশুভ হয় না। কতবার যাহা ইচ্ছা করিয়াছিলাম তাহার চেয়ে অনেক ভাল ফল হইয়াছে। ফিনিক্স সম্বন্ধে এই অনভীপ্সিত পরিণাম হওয়ায় ও ফিনিক্স যে অপ্রত্যাশিত রূপ লইয়াছিল তাহাতে অশুভ হয় নাই, একথা আমি নিশ্চয়পূর্ব্বক বলিতে পারি ; তবে সর্ব্বাংশে ভাল হইয়াছিল কিনা একথা নিশ্চয় করিয়া বলা যায় না। আমরা কেবল হাত-পায়ে খাটিয়াই দিন কাটাইব এই ধারণায় ছাপাখানার আশে পাশে প্রত্যেক অধিবাসীর জন্যই তিন তিন একর করিয়া জমির টুক্‌রা রাখিয়া দিয়াছিলাম। আমার জন্য এমনি এক টুক্‌রা নির্দ্দিষ্ট ছিল। ঐ সকল স্থানে আমাদের ইচ্ছার বিরুদ্ধেও টিনের ঘর করিতে হইয়াছিল।

ইচ্ছা ত ছিল যে, চাষাদের পক্ষে যাহা মানায় তেমনি মাটি ও খড়ের ঘর করা, অথবা ইটের দেওয়ালের উপর পাতার ছাউনী দেওয়া। তাহা হইতে পারে নাই। তাহাতে ব্যয় পড়িত বেশী ও সময়ও অনেক বেশী লাগিত। সকলে তাড়াতাড়ি গৃহী হইতে ও কাজে লাগিয়া পড়িতে ব্যগ্র হইয়া পড়িয়াছিল।

সম্পাদক বলিয়া মনসুখলাল নাজরকেই ধরা হইত। তিনি এই ব্যাপারে প্রবেশ করিলেন না। তাঁহার থাকার স্থান ডারবানেই রহিল। ডারবানে 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নের' এক ছোট শাখা ছিল।

কম্পোজ করার কাজের জন্য বেতনভোগী লোক ছিল। দেখা গিয়াছিল যে, ছাপার কাজের মধ্যে সব চাইতে বেশী সময় লাগে অথচ সব চাইতে সোজা কাজ হইতেছে কম্পোজ করা। এইজন্য দৃষ্টি ছিল যাহাতে সকল বাসিন্দাই ঐ কাজটি শিখিয়া লয়। তাই যে উহা জানিত না, সেও শিখিতে লাগিল। আমি ঐ কার্য্যে শেষ পর্য্যন্ত একেবারে সকলের চাইতে বোকা ছিলাম এবং মগনলাল গান্ধী সকলের শ্রেষ্ঠ ছিলেন। ইহা আমি বরাবর মনে করিয়া আসিয়াছি যে, মগনলাল নিজের ভিতরের শক্তির খবর রাখিতেন না। ছাপাখানার কাজ তিনি পূর্ব্বে কখনো করেন নাই, তবুও তিনি তাড়াতাড়ি ভাল কম্পোজিটার হইয়া গেলেন ও কেবল তাহাই নয়, অল্প সময় মধ্যেই ছাপাখানার সকল কাজই ভাল করিয়া আয়ত্ত করিয়া আমাকে আশ্চর্য্য করিয়া দিলেন।

ওখানকার কাজে তখনো স্থিতি আসে নাই, ঘরগুলি তৈরী শেষ হয় নাই, এই অবস্থাতেই নূতন গঠিত পরিবারকে সেখানে রাখিয়া আমি জোহানেসবর্গে ফিরিলাম। সেখানকার কাজ দীর্ঘ দিনের জন্য ফেলিয়া রাখিতে পারি, এরকম অবস্থা ছিল না।

পোলক ঝাঁপ দিলেন

জোহানেস্‌বর্গে আসিয়া এই মহা পরিবর্ত্তনের কথা পোলককে বলিলাম। নিজের দেওয়া বহিখানা হইতে এই পরিণাম হইয়াছে দেখিয়া তাঁহার আনন্দের সীমা রহিল না। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন—"আমি কি সেখানে কোনও কাজে লাগিতে পারি না?"

আমি বলিলাম—"আপনি অবশ্যই সেখানকার কাজের মধ্যে থাকিতে পারেন, ইচ্ছা করেন ত এই জিনিষটার সহিত যুক্তও হইতে পারেন।"

পোলক জবাব দিলেন—"আমাকে যদি গ্রহণ করেন তবে আমি প্রস্তুত আছি।"

এই দৃঢ়তায় আমি মুগ্ধ হইয়া গেলাম। পোলক "ক্রিটিকের" কাজ হইতে মুক্ত হওয়ার জন্য মালিককে একমাসের নোটীশ দিলেন এবং ঐ সময় পার হইলে ফিনিক্সে আসিয়া উপস্থিত হইলেন। মিশুক স্বভাবের জন্য সকলের হৃদয় অধিকার করিয়া লওয়া তাঁহার পক্ষে কঠিন হইল না। তিনি আত্মীয়ের ন্যায় বাস করিতে লাগিলেন। সহজ জীবন-যাপন তাঁহার মজ্জাগত ছিল। সেইজন্য ফিনিক্সের জীবনধারা তাঁহার নিকট একটুকুও নূতন বা কঠিন লাগে নাই, স্বাভাবিক ও রুচিকর হইয়াছিল।

আমি কিন্তু তাঁহাকে সেখানে দীর্ঘ সময় রাখিতে পারি নাই। মিঃ রিচ্‌ বিলাত যাইয়া আইন শিক্ষা শেষ করার সঙ্কল্প করিলেন। একা আমি আফিসের সমস্ত কাজ করিতে পারিব, ইহা সম্ভব ছিল না। সেইজন্য আমি পোলকের কাছে আফিসে থাকার ও উকীল হওয়ার জন্য প্রস্তাব উপস্থিত করিলাম। ভাবিয়াছিলাম, কিছুদিন পরে আমরা দুইজনেই ফিনিক্সে বাস করিব। কিন্তু এ কল্পনা আর কার্য্যে পরিণত হয় নাই।

পোলকের স্বভাবে এমন একটা সরলতা ছিল যে, যাঁহার উপর তিনি একবার বিশ্বাস স্থাপন করিতেন, তাঁহার সঙ্গে যুক্তি-তর্ক না করিয়া তাঁহার ইচ্ছানুসারে চলিবারই চেষ্টা করিতেন। পোলক আমাকে লিখিলেনঃ—"আমার কাছে এ জীবন ভালই লাগিতেছে, আমি এখানে বেশ সুখেই আছি। এই সংস্থাকে আমরা বিকশিত করিয়া তুলিতে পারিব এরূপ আশাও আছে। কিন্তু আপনি যদি মনে করেন যে, আমি সেখানে গেলে আমাদের আদর্শ সফলতার দিকে বেশী অগ্রসর হইবে, তবে আমি এস্থান ত্যাগ করিতেও প্রস্তুত আছি। এই পত্র পাইয়া আমি সুখী হইলাম। পোলক ফিনিক্স ছাড়িয়া জোহানেস্‌বর্গে আসিলেন এবং আমার আফিসে উকীলের সহকারী-রূপে নিযুক্ত হইলেন।

এই সময় একজন স্কচ্ থিয়োসফিষ্টকে আমি আইন পরীক্ষার জন্য তৈরী হইতে সাহায্য করিতেছিলাম। তাঁহাকে আমি পোলকের অনুসরণ করিতে নিমন্ত্রণ করিলাম ও তিনিও নিযুক্ত হইলেন। তাঁহার নাম ম্যাকিণ্টায়ার।

এইরূপে ফিনিক্সের আদর্শ শীঘ্র শীঘ্র গ্রহণ করিবার উদ্দেশ্যের ভিতর দিয়াই আমি উক্ত আদর্শের বিরোধী জীবনে আরো গভীরভাবে ডুবিয়া যাইতে লাগিলাম। যদি ঈশ্বরের অভিপ্রায় অন্য রকম না হইত, তাহা হইলে সরল জীবনযাত্রা পরিহার করিয়া আমি যে মোহজালেই জড়াইয়া পড়িতাম তাহাতেও সন্দেহ নাই। কিন্তু আমার ধারণার অতীত ভাবেই আমিও আমার আদর্শ রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম। কিরূপে, তাহা বর্ণনা করার পূর্ব্বে আরও কয়েকটী অধ্যায় লেখা প্রয়োজন।

২২
"রাম যারে রাখে"

শীঘ্র দেশে যাওয়ার আশা, অথবা দেশে গিয়া স্থির হইয়া বসার আশা আমি ছাড়িয়া দিয়াছিলাম। আমি ত আমার স্ত্রীকে এক বৎসরের সময় দিয়া বলিয়াছিলাম—উহার পরই ফিরিয়া আসিব। বৎসর অন্ত হইয়া গেল, আমার ফেরা তখনও বহুদূরে, সেই জন্য ছেলে-পেলেদিগকে লইয়া আসাই স্থির করিলাম।

ছেলেপেলে আসিল, তাহাদের মধ্যে আমার তৃতীয় পুত্র রামদাসও ছিল। সে ষ্টীমারের কাপ্তেনের সাথে খুব মিশিয়া গিয়াছিল। তাঁহার সাথে খেলিতে গিয়া তাহার হাত ভাঙ্গিয়া যায়। কাপ্তেন তাহার খুবই যত্ন লইতেন। ডাক্তারে হাড় ঠিক করিয়া দিয়াছিলেন। যখন সে জোহানেস্‌বর্গ পঁহুছে, তখন তাহার হাত ব্যাণ্ডেজ-বাঁধা অবস্থায় রুমাল দিয়া গলা হইতে ঝোলানো ছিল। ষ্টীমারের ডাক্তার পরামর্শ দিয়াছিলেন যে, এই ঘা কোনও ডাক্তারকে দিয়া চিকিৎসা করানো উচিত।

এই সময় আমি বিশেষ ভাবে মাটি চিকিৎসার পরীক্ষা করিতে-ছিলাম। আমার যে সকল মক্কেলের আমার হাতুড়ে বিদ্যার উপর বিশ্বাস ছিল তাহাদের উপরে আমি মাটি ও জল চিকিৎসার প্রয়োগ করিতাম। রামদাসের বেলায় অন্য আর কি হইবে? তখন রামদাসের বয়স আট বৎসর ছিল। আমি তাহাকে জিজ্ঞাসা করিলাম—"আমি তোমার জখম ভাল করার জন্য যাহা করিব

তাহাতে ভয় পাইবে না ত?" রামদাস হাসিয়া আমাকে পরীক্ষা করার সম্মতি দিল। যদিও এই বয়সে ভালমন্দ বোঝার ক্ষমতা তাহার ছিল না, তথাপি ডাক্তার ও হাতুড়ের মধ্যে ভেদ সে ভাল রকমেই জানিত। তাহা হইলেও সে আমার পরীক্ষার পদ্ধতি জানিয়া এবং আমাকে বিশ্বাস করিয়া নির্ভয়ে থাকিল।

কাঁপিতে কাঁপিতে আমি তাহার ব্যাণ্ডেজ খুলিলাম, জখম সাফ্ করিলাম ও সাফ্ মাটির পুল্‌টিশ দিয়া, পূর্ব্বে যেমন বাঁধা ছিল সেইরূপ ব্যাণ্ডেজ বাঁধিয়া দিলাম। এই রকম প্রতিদিন আমি জখম সাফ্ করিতাম ও মাটির পুল্‌টিশ লাগাইতাম। এক মাসে জখম একেবারে আরোগ্য হইয়া গেল। কোনও দিন কোনও বিঘ্ন হয় নাই এবং দিনে দিনে জখম আরাম হইতেছিল। ডাক্তারের মলম দিলেও আরোগ্য হইতে এই সময়ই লাগিত—একথা ষ্টীমারের ডাক্তারও বলিয়াছিলেন।

এইরূপে ঘরোয়া চিকিৎসার সম্বন্ধে বিশ্বাস ও উহা প্রয়োগের সাহস আমার বাড়িল। পরীক্ষার ক্ষেত্র ইহার পর আমি খুব বাড়াইয়া দিলাম। জখম, জ্বর, অজীর্ণ, কামলা ইত্যাদি রোগে মাটি, জল ও উপবাস দ্বারা চিকিৎসা ছোট বড়, স্ত্রী-পুরুষের সকলেরই করিতে লাগিলাম ও অধিকাংশ ক্ষেত্রে সফলও হইলাম। তাহা হইলেও দক্ষিণ আফ্রিকায় এ বিষয় আমার যে সাহস ছিল, আজ তাহা নাই। অভিজ্ঞতার দ্বারা আমি দেখিতেছি যে, ইহাতে বিপদ্ আছে।

আমার মাটি-চিকিৎসার সফলতা প্রমাণ করার জন্য আমি এই পরীক্ষার বর্ণনা করিতেছি না। কোনও রকম পরীক্ষাতেই সর্ব্বাংশে সফল হইয়াছি, এমন দাবী আমি করিতে পারি না। ডাক্তারেরাও এই

দাবী করিতে পারেন না। তাহা হইলেও ইহা বলিতে হয় যে, যদি কোনও নূতন অপরিচিত পরীক্ষা করিতে হয় তবে তাহা নিজের উপরই আরম্ভ করা সঙ্গত। এই প্রকার হইলে সত্য শীঘ্র প্রকাশ হইয়া পড়ে। তাহার প্রয়োগকারীকে ঈশ্বর রক্ষা করেন।

মাটির চিকিৎসা পরীক্ষায় যেমন বিপদ্ ছিল, ইউরোপীয়ানদের সহিত নিকট আত্মীয়তাতেও সেইরকম বিপদ্ ছিল। ভেদ ছিল কেবল রকমের। কিন্তু এই শেষোক্ত বিপদের কথা আমি কখনো ভাবিও নাই।

পোলককে আমার সহিত বাস করার জন্য নিমন্ত্রণ দিলাম এবং আমরা আপন ভায়ের মত থাকিতে লাগিলাম। যে মহিলার সহিত পোলকের বিবাহ স্থির ছিল তাঁহার সহিত কয়েক বৎসর হইতে বন্ধুত্ব ছিল। উভয়েই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন যে, যখন সময় হইবে তখন বিবাহ করিবেন। আমার স্মরণ হয় যেন পোলক কিছু অর্থ-সংগ্রহের জন্য অপেক্ষা করিতেছিলেন। রাস্কিনের পুস্তকের সহিত পরিচয় আমার অপেক্ষা তাঁহার অনেক পূর্ব্বেই হইয়াছিল। কিন্তু পাশ্চাত্য সভ্যতার প্রভাবের জন্যই রাস্কিনের সিদ্ধান্ত পুরাপুরি ভাবে তিনি কাজে লাগাইতে পারিতেছিলেন না। আমি যুক্তি দিলাম যে, "যাহার সহিত হৃদয়ের মিল হইয়াছে তাহার সহিত কেবল টাকার অভাবে বিচ্ছিন্ন থাকা সঙ্গত নহে। যদি দারিদ্র্য প্রতিবন্ধক হয় তবে তো গরীবের বিবাহই করা হয় না। তাহা ছাড়া এখন আপনি আমার সাথে আছেন। এখন ত সংসার-খরচের প্রশ্নই নাই। আপনার শীঘ্র বিবাহ করাই আমি সঙ্গত মনে করি।"

পোলকের সহিত আমার কখনো দুইবার যুক্তি করিতে হয় নাই। তিনি তখনই আমার যুক্তি গ্রাহ্য করিয়া লইলেন। ভাবী মিসেস্

পোলক বিলাতে ছিলেন। তাঁহার নিকট পত্র লিখিলেন। তিনিও সন্তুষ্ট হইলেন ও কয়েক মাস মধ্যেই বিবাহ করার জন্য জোহানেস্‌বর্গে আসিয়া পঁহুছিলেন।

বিবাহের কোনও খরচই ছিল না। বিবাহের জন্য কোনও বিশেষ পোষাকও তৈরী করা হইল না। ইঁহাদের ধর্ম্ম অনুষ্ঠানেরও আবশ্যক ছিল না। মিসেস্ পোলক জন্মিয়াছিলেন খৃষ্টানের ঘরে, আর পোলক ছিলেন ইহুদী। উভয়ের মধ্যে যে সাধারণ-ধর্ম্ম তাহা নীতিধর্ম্ম ছিল।

এই বিবাহ-প্রসঙ্গে একটা মজার কথা লিখিতেছি। ট্রান্সভালে গোরাদের বিবাহের রেজেষ্ট্রী যে কর্ম্মচারী করে সে কালাদের বিবাহ রেজেষ্ট্রী করে না। এই বিবাহে মিত-বর ছিলাম আমি। কোনো গোরা মিত্র অনায়াসেই মিত-বর রূপে পাওয়া যাইত, কিন্তু পোলক তাহা সহ্য করার লোক ছিলেন না। সেইজন্য আমরা তিন জন রেজিষ্ট্রারের নিকট হাজির হইলাম। আমি যে বিবাহে মিত-বর সে বিবাহে উভয় পক্ষই যে গোরা একথা রেজিষ্ট্রার কি করিয়া জানিবেন? তাই তিনি অনুসন্ধান করিবেন বলিয়া বিবাহ মুলতুবী রাখিতে চাহিলেন। পরদিন নাতালের নববর্ষের বন্ধ। বিবাহের সমস্ত ব্যবস্থার পর এই রকমে রেজেষ্ট্রী করার তারিখ বদলানো সকলের অসহ্য বোধ হইল। বড় ম্যাজিষ্ট্রেটের সহিত আমার পরিচয় ছিল। তিনিই এই বিভাগের কর্ত্তা ছিলেন। আমি এই দম্পতীকে লইয়া তাঁহার সম্মুখে হাজির হইলাম। তিনি হাসিয়া আমাকে চিঠি দিয়া দিলেন। এই রকমে বিবাহ রেজেষ্ট্রী হইল।

আজ পর্য্যন্ত যে সব গোরা পুরুষ আমার সঙ্গে থাকিতেন তাঁহারা সকলেই অল্পবিস্তর পূর্ব্বের পরিচিত লোক। এখন এক অপরিচিতা

ইংরাজ-মহিলা পরিবারভুক্ত হইলেন। ইঁহাদের সহিত আমার নিজের কখনো কোনও বিরোধ হইয়াছে এমন কথা স্মরণ নাই। আমার পত্নীর সহিত মিসেস্ পোলকের যদি কখনও কোনরূপ মনোমালিন্য হইয়া থাকে, তবে তাহাও কর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। তেমন মনোমালিন্য একান্ত সুনিয়ন্ত্রিত এক জাতীয় পরিবারের ভিতরেও হইয়া থাকে। এখানে একথাও বলিয়া রাখা দরকার যে, আমার পরিবার ছিল বিভিন্ন জাতির দ্বারা গঠিত একটি পরিবারের মত, তাহাতে সকল রকমের, সকল মনোবৃত্তির লোককেই গ্রহণ করা হইত। বস্তুতঃ, স্বজাতীয় ও বিজাতীয় এ কেবল মনের ঢেউ। আমরা সকলেই একই পরিবারের।

ওয়েষ্টের বিবাহের কথাও এইখানেই সারিয়া লই। জীবনের এই সময়টায় ব্রহ্মচর্য্য-সম্বন্ধে আমার বিচার-পূর্ণতা লাভ করে নাই। সেই জন্য তখন আমার কাজ ছিল কুমার বন্ধুদিগকে বিবাহবন্ধনে আবদ্ধ করা। তাই ওয়েষ্ট তাঁহার পিতামাতাকে দেখিতে যখন দেশে যাইতেছিলেন, তখন তাঁহাকে বিবাহ করিয়া ফিরিবার পরামর্শ দিলাম। ফিনিক্সে আমাদের সকলেরই বাড়ী, আর আমরা সকলেই চাষা হইয়া বসিতেছি, সেইজন্য বিবাহ, বংশবৃদ্ধি ভয়ের বিষয় ছিল না।

ওয়েষ্ট, লিষ্টার নামক স্থান হইতে এক সুন্দরীকে বিবাহ করিয়া লইয়া আসিলেন। এই কন্যার আত্মীয়েরা লিষ্টারের এক বড় জুতার কারখানায় কাজ করিতেন। মিসেস ওয়েষ্টও কিছুকাল জুতার কারখানায় কাজ করিয়াছিলেন। তাঁহাকে আমি সুন্দরী বলিয়াছি, কেননা আমি তাঁহার গুণের পূজারী। সত্যকার সৌন্দর্য্য গুণই নয় কি? ওয়েষ্ট নিজের শ্বাশুরীকেও সঙ্গেই আনিয়াছিলেন। এই বৃদ্ধা এখনো জীবিত আছেন। তাঁহার কর্ম্মশক্তি এরূপ ছিল, তাঁহার স্বভাব এমন মধুর ও

হাসি খুসী পূর্ণ ছিল যে, তাঁহাকে দেখিয়া আমাদের সকলের লজ্জা পাওয়ার কথা।

যেমন আমি অবিবাহিত বন্ধুদিগকে বিবাহ দেওয়াইতেছিলাম, তেমনি ভারতীয় বন্ধুদিগকেও নিজের আত্মীয় পরিবার লইয়া আসিবার জন্য উৎসাহিত করিতেছিলাম। কাজেই ফিনিক্স ছোট একটা গ্রামের মত হইয়া পড়িল। সেখানে পাঁচ-সাত ঘর ভারতীয় পরিবার বাস করিতেন। ক্রমে ক্রমে তাঁহাদের পরিবার বৃদ্ধি পাইতে লাগিল।

২৩

গৃহস্থালীতে পরিবর্ত্তন ও বালশিক্ষা

ডারবানেই গৃহস্থালীর ব্যবস্থার পরিবর্ত্তন সুরু হয়। সেখানে মোটা টাকা খরচ হইলেও ধরণ সাদাসিধা ছিল। কিন্তু জোহানেসবর্গে সর্ব্বোদয়ের সিদ্ধান্ত-অনুসারে ব্যবস্থার আগাগোড়া পরিবর্ত্তন হইয়া গেল।

ব্যারিষ্টারের বাড়ী যতটা সাদাসিধা রাখা যায় তাহাই করা হইল। তাহা হইলেও আসবাব-পত্র কিছু রহিল। নতুবা চলে না। পরিবর্ত্তন বাহির হইতে বেশী হইল ভিতরের। প্রত্যেক কাজ নিজ হাতে করার সখ বাড়িয়াছিল, এবং বালকদিগের দ্বারাও হাতের কাজ করানো আরম্ভ করিলাম। বাজার হইতে রুটি না কিনিয়া কুহ্নের প্রথা অনুসারে বিনা খামিরায় হাতে রুটি তৈরী করিতে আরম্ভ করিলাম। ইহা মিলের আটায় হয় না। তাহা ভিন্ন মিলের আটা ব্যবহার করা অপেক্ষা হাতের পেষাই আটাতে সাদাসিধা ভাব ও স্বাস্থ্যকর দ্রব্য অনেক বেশী আছে এইরূপ মনে করি। এইজন্য হাতে চালাইবার একটি চাকিও সাত পাউণ্ড খরচ করিয়া খরিদ করিলাম। উহার চাকাটা ভারি ছিল। একজনের পক্ষে চালানো কঠিন ছিল, কিন্তু দুইজনে উহা সহজেই চালাইতে পারিত। এই যাঁতা আমি, পোলক ও ছেলেরা সাধারণতঃ চালাইতাম। কখনো কখনো কস্তুর-বাঈও আসিতেন, যদিও ঐ সময়টা সাধারণতঃ তাঁহাকে রান্না করার জন্য নিযুক্ত থাকিতে হইত। যখন মিসেস্ পোলক আসিলেন তখন তাঁহাকেও ঐ কাজে

লাগাইলাম। এই শ্রম ছেলেদের পক্ষে খুব ভাল হইয়াছিল। কখনো এই কাজ কি অন্য কোনও কাজ তাহাদের দ্বারা জোর করিয়া করানো হয় নাই। বরঞ্চ তাহারা সহজ আনন্দদায়ক খেলা মনে করিয়াই এসব কাজ করিত। ক্লান্ত হইয়া পড়িলেই তাঁহাদের কাজ ছাড়িয়া দিবার স্বাধীনতা ছিল। কিন্তু কে জানে কেন এই বালকেরা এবং পরে যাহাদের সহিত পরিচয় করিব তাহারা কেহই আমাকে ফাঁকি দেয় নাই। সাধারণতঃ সহিষ্ণু ছেলেই আমার ভাগ্যে জুটিত এবং অনেকেই, যে কাজ করিতে দেওয়া হইত তাহা বুদ্ধি সহকারে করিত। "আর পারি না" এমন কথা এই সময়ের অল্প ছেলেই আমাকে বলিয়াছে।

বাড়ী সাফ্ করার জন্য কেবল একজন চাকর ছিল। সেও পরিবারের একজনের মত হইয়াই থাকিত এবং ছেলেরা তাহার কাজে পুরা ভাগ লইত। পায়খানা সাফ্ করার জন্য মিউনিসিপালিটির লোক আসিত। কিন্তু পায়খানার ঘর সাফ্ করা এবং উহার বসিবার স্থান সাফ্ করার কাজ চাকরকে দিতে মন উঠিত না। তাহারা মনেও করিত না যে, ঐ কাজ তাহাদের। এই কার্য্য আমরা নিজেরাই করিতাম ও ইহাতে বালকেরা শিক্ষা পাইত। ইহার পরিণাম হইয়াছিল এই যে, আমার একটি ছেলেও প্রথম হইতেই পায়খানা সাফ্ করিতে কষ্ট বোধ করিত না ও স্বাস্থ্য-সম্বন্ধে সাধারণ নিয়ম সহজেই তাহাদের আয়ত্ত হইয়াছিল। জোহানেস্‌বর্গে কোনও পীড়া বড় ছিল না, তবে যদি কেহ পীড়িত হইতেন তবে সেবার কাজ বালকদের ছিল, আর তাহারাও খুসী হইয়া এই কাজ করিত।

তাহাদের অক্ষরজ্ঞান-বিষয়ে আমি উদাসীন ছিলাম একথা বলিতে

পারি না। তবে উহা ত্যাগ করিতেও আমার সঙ্কোচ ছিল না। এই অসম্পূর্ণতার জন্য আমার ছেলেরা আমার বিরুদ্ধে অভিযোগ করিতে পারে। বস্তুতঃ তাহারা কয়েকবার নিজেদের অসন্তোষ প্রকাশও করিয়াছে। এ বিষয়ে কতক অংশে আমাকে আমার নিজের দোষ স্বীকার করিতে হয়—একথা মানি। তাহাদিগকে পুঁথিগত বিদ্যা দেওয়ার ইচ্ছা আমার খুবই ছিল—চেষ্টাও করিতাম, কিন্তু এই কার্য্যে সব সময় কোনও না কোন বিঘ্ন আসিয়া উপস্থিত হইত। এই রকমে ঘরে আর দ্বিতীয় কোনও প্রকার লেখা-পড়ার ব্যবস্থা না হওয়ায় তাহাদিগকে আমি আমার সাথে হাঁটাইয়া আফিসে লইয়া যাইতাম। আফিস আড়াই মাইল দূরে ছিল। ইহাতে সকাল সন্ধ্যায় তাহাদের ও আমার কম করিয়া পাঁচ মাইল হাঁটার শ্রম হইত। রাস্তায় চলিতে চলিতে কিছু শিখাইবার চেষ্টা করিতাম, তাহাও যদি আমার সহিত আর কেহ না থাকিত তবে। আফিসে তাহারা মক্কেল ও মুহুরীদের সংসর্গে আসিত; কিছু যদি পড়িতে দেওয়া হইত তবে পড়িত, বাজারে সামান্য কিছু খরিদ করিতে হইলেও তাহা করিত। সকলের বড় হরিলাল ভিন্ন আর সব ছেলেই এই রকমে গড়িয়া উঠিয়াছে। হরিলাল দেশে রহিয়া গিয়াছিল। যদি আমি তাহাদের পুস্তক পাঠে সাহায্য করিবার জন্য এক ঘণ্টা করিয়াও সময় দিতে পারিতাম তবে তাহাদিগকে আদর্শ শিক্ষা দেওয়া হইয়াছে বলা যাইত। ঐ আগ্রহ আমি করি নাই, এজন্য আমার ও তাহাদের দুঃখ রহিয়া গিয়াছে। সকলের বড় ছেলে এবিষয়ে তাহার অভিযোগ অনেকবার আমার কাছে এবং প্রকাশ্যভাবে করিয়াছে। অন্যেরা হৃদয়ের উদারতাবশতঃ ঐ ত্রুটি অনিবার্য্য বুঝিয়া ক্ষমা করিয়াছে। এই অসম্পূর্ণতার জন্য আমার

অনুশোচনা নাই, আর যদি থাকেও তবে তাহা এই মাত্র যে, আমি আদর্শ বাপ হই নাই। আমার একথা বলার উদ্দেশ্য এই যে, তাহাদের পুঁথি-পড়া বিদ্যার বলিদান আমার অজ্ঞতাবশতঃ হয় ত হইয়াছে, কিন্তু সদ্‌ভাবে আমি যাহা সেবা-কার্য্য বলিয়া বুঝিয়াছি এ বলিদান হইয়াছে তাহারই নিকট। তাহাদের চরিত্র যাহাতে গড়িয়া উঠে তাহা করার জন্য আমি কোনও ত্রুটি করি নাই। চরিত্রগঠন প্রত্যেক মা-বাপের পক্ষে অনিবার্য্য ও বাধ্যতা-মূলক কার্য্য বলিয়া আমি মনে করি। আমার চেষ্টা সত্ত্বেও আমার ঐ ছেলেদের চরিত্রে যে ত্রুটি দেখিতে পাওয়া যায় তাহা আমাদের স্বামী-স্ত্রীর ত্রুটির প্রতিবিম্ব—ইহাই আমার দৃঢ় বিশ্বাস।

সন্তান যেমন পিতামাতার আকৃতি উত্তরাধিকারসূত্রে লাভ করে, তাহাদের গুণ-দোষও তেমনি পাইয়া থাকে। আশপাশের প্রভাব অনেক পরিবর্ত্তন করে সত্য, তবুও সন্তানেরা যে বাপ-দাদার নিকট হইতে তাহাদের চরিত্রের মূলধন পায় ইহাও সত্য। এই রকম দোষের উত্তরাধিকার লাভ করিয়াও কত ছেলে নিজেকে বাঁচাইয়া লয়—ইহাও আমি দেখিয়াছি। তাহার কারণ এই যে, পবিত্রতা আত্মার সহিত নিত্যসম্বন্ধযুক্ত গুণ, ইহাই আত্মার চমৎকারিত্ব।

পোলক ও আমার মধ্যে ছেলেদের ইংরাজী শেখানো লইয়া কতবার তীব্র বাদানুবাদ হইয়া গিয়াছে। আসলে আমি এই বিশ্বাস করি যে, ভারতীয় মা-বাপ যদি ছেলেদিগকে বাল্যকাল হইতে ইংরাজী ভাষায় কথা বলায়, তবে তাহারা উহাদের প্রতি এবং দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করে। আমি ইহা পর্য্যন্ত বিশ্বাস করি যে, ঐরূপ করিলে ছেলেরা নিজের দেশের ধার্ম্মিক ও মানসিক উত্তরাধিকার হইতে বঞ্চিত হয় এবং সেই পরিমাণে দেশের ও জগতের সেবা করার অযোগ্য হয়।

এইরকম বিশ্বাস থাকার জন্য আমি সব সময়ে ইচ্ছা করিয়াই ছেলেদের সাথে গুজরাটীতে কথা বলিতাম। পোলকের ইহা ভাল লাগিত না। আমি বালকদের ভবিষ্যৎ নষ্ট করিতেছি, এই রকম তাঁহার যুক্তি ছিল। ইংরাজীর ন্যায় ব্যাপক ভাষা ছেলেরা যদি বাল্যকাল হইতে শিখিয়া লয়, তবে জগতে জীবনযাত্রার দৌড়ে তাহারা অনেকটা পথ আগাইয়া যায়—এই রকম কথা তিনি আমাকে আগ্রহভরে প্রেমপূর্ব্বক বুঝাইতেন। এই যুক্তি আমি গলাধঃকরণ করিতে পারিতাম না। আমার স্মরণ নাই যে, অবশেষে আমার উত্তরই তিনি মানিয়া লইয়াছেন, অথবা তিনি আমার জিদ দেখিয়া শান্ত হইয়াছিলেন। ইহার পর প্রায় বিশ বৎসর গিয়াছে। তাহা হইলেও আমার ঐ সিদ্ধান্ত পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতায় আরও দৃঢ় হইয়াছে। সেইজন্য এক দিকে যেমন আমার পুত্রেরা পুস্তকের বিদ্যায় কাঁচা রহিয়া গিয়াছে, অপর দিকে তবুও মাতৃভাষার সাধারণ জ্ঞান সহজেই পাইয়াছে। তাহাতে দেশের এই লাভ হইয়াছে যে, তাহারা এখন নিজ দেশে বিদেশীর ন্যায় নাই। দুইটি ভাষার সহিত পরিচয় তাহাদের সহজেই হইয়াছিল। একটা বড় ইংরাজ-সমাজের সহবাসে তাহারা ছিল ও এমন দেশে ছিল যেখানে ইংরাজীই প্রধান কথিত ভাষা। সেইজন্য তাহারা ইংরাজী বলিতে ও লিখিতে শিখিয়াছিল।

২৪

জুলু বিদ্রোহ

ঘর করিয়া বসিয়াছি যখন মনে করিলাম, তখন দেখিলাম যে, ঘর করা আমার অদৃষ্টে নাই। জোহানেস্‌বর্গেই যখন সব ঠিকঠাক করিয়া বসিলাম তখন অপ্রত্যাশিত ঘটনা ঘটিল। নাতালে জুলু 'বিদ্রোহের' সংবাদ পড়িলাম। আমার জুলুদের সাথে কোন বৈর ছিল না। জুলুরা একজন ভারতবাসীরও ক্ষতি করে নাই। তাহাদের 'বিদ্রোহ' করার ক্ষমতা সম্বন্ধেও আমার সন্দেহ ছিল। কিন্তু ইংরাজ রাজত্ব তখন আমি জগতের কল্যাণকারী রাজত্ব বলিয়া মানিতাম। আমার এ অনুরাগ হৃদয়ের বস্তু ছিল। সুতরাং সে রাজত্বের ক্ষয় আমি ইচ্ছা করিতাম না। সেই জন্যেই বল ব্যবহার করার নীতি-অনীতি সম্বন্ধে আমার সিদ্ধান্ত, আমাকে আমার সংকল্প হইতে নিরস্ত করিতে পারিল না। নাতালে যদি বিপদ আসে সে জন্য নাতালে স্বয়ং-সেবক লস্কর ছিল, এবং বিপদের সময় উহাতে আরো লোক লওয়ার ব্যবস্থা ছিল। আমি পড়িলাম যে, এই স্বয়ং-সেবক লস্কর এই 'বিদ্রোহ' দমনের জন্য বাহির হইয়া পড়িয়াছে।

আমি নিজেকে নাতালবাসী বলিয়া গণ্য করিতাম এবং নাতালের সহিত আমার সম্বন্ধও ছিল। সেই জন্য আমি গভর্ণরকে লিখিলাম যে, যদি আবশ্যক হয় তবে আহতদের শুশ্রূষার জন্য ভারতীয় দল লইয়া আমি যাইতে প্রস্তুত আছি। গভর্ণর তৎক্ষণাৎ স্বীকার করিয়া জবাব দিলেন। আমি অনুকূল জবাব পাওয়ার অথবা এত শীঘ্র জবাব

ওয়ার আশা করি নাই। তবুও পত্র লিখিবার পূর্ব্বে আমি সব গোছাইয়া রাখিয়াছিলাম। এইরূপ স্থির করিয়াছিলাম যে, গভর্ণরের তরফ হইতে যদি আহ্বান আসে, তবে জোহানেস্‌বর্গের বাড়ী ভাঙ্গিয়া ফেলিব। মিঃ পোলক আর একটা ছোট বাড়ী লইয়া থাকিবেন, আর কস্তুর-বাঈ ফিনিক্সে যাইয়া থাকিবেন। এই ব্যবস্থায় কস্তুর-বাঈয়ের পূর্ণ সম্মতি পাইয়াছিলাম। আমার এই ধরণের কাজে তিনি কোনও দিন বাধা দিয়াছেন এমন স্মরণ হয় না। গভর্ণরের জবাব পাইতেই আমি বাড়ীর মালিককে রীতি অনুযায়ী বাড়ী ছাড়িয়া দিব বলিয়া এক মাসের নোটিশ দিলাম। কতক জিনিষপত্র ফিনিক্স গেল, কতক মিঃ পোলকের নিকট রহিল।

ডারবান পঁহুছিয়াই আমি সাধারণের নিকট লোকের জন্য নিবেদন জানাইলাম। বেশী লোকের দরকার ছিল না। আমরা ২৪জন তৈরী হইলাম। ইহাদের মধ্যে আমাকে বাদ দিয়া ৪ জন গুজরাটী ছিল, বাকী লোক ছিল এগ্রিমেণ্ট-মুক্ত মাদ্রাজী, এবং একজন পাঠান।

সম্মান দেওয়ার জন্য ও যাহাতে কাজের সুবিধা হয় সেজন্য সেখানকার প্রথা অনুযায়ী চিকিৎসা-বিভাগের প্রধান কর্ত্তা আমাকে "সার্জেণ্ট মেজরের" সামরিক পদ দিলেন এবং আমার পছন্দমত অপর তিনজনকে 'সার্জেণ্ট' ও একজনকে 'করপোরাল পদ দিলেন। পোষাক সরকার হইতেই পাওয়া গেল। এই দল ছয় সপ্তাহকাল সর্ব্বদা সেবা করিয়াছিল বলা যায়।

বিদ্রোহের স্থানে পঁহুছিয়া আমি দেখি যে, ইহাকে বিদ্রোহ বলা যায় না। বিপক্ষের কাহাকেও দেখিতে পাওয়া গেল না। বিদ্রোহ বলার কারণ এই যে, এক জুলু সর্দ্দার জুলুদের উপর স্থাপিত নূতন কর না

দেওয়ার জন্য পরামর্শ দিয়াছিল, এবং যে সার্জেণ্ট কর আদায় করিতে গিয়াছিল তাহাকে কাটিয়া ফেলিয়াছিল। যাহা হোক্ আমার হৃদয় জুলুদের তরফেই ছিল। আমরা হেডকোয়ার্টারে পঁহুছিলে যখন আমাদের উপর জুলু আহতদিগকে সেবা করার ভার পড়িল, তখন আমি সন্তুষ্ট হইলাম। ডাক্তার কর্ম্মচারী আমাদিগকে স্বাগত করিয়া লইলেন। তিনি বলিলেন—"কোনও গোরা এই জখমীদিগকে শুশ্রূষা করিতে রাজি হয় না। আমি একা কি ব্যবস্থা করিব? উহাদের জখম পচিয়া উঠিয়াছে। এখন তোমরা আসিয়াছ, ঈশ্বর দেখিতেছি নির্দ্দোষ লোকগুলির উপর কৃপা করিয়াছেন।" এই বলিয়া আমাকে ব্যাণ্ডেজ, জীবাণুনাশক জল ইত্যাদি দিলেন ও তিনি রোগীদিগের নিকট লইয়া গেলেন। রোগীরা আমাদিগকে দেখিয়া খুসি হইয়া গেল। গোরা সিপাহীরা জালের অপর পাশ হইতে আমাদিগকে দেখিয়া, আমরা যাহাতে ঘা সাফ্ করা বন্ধ করি তাহার চেষ্টা করিতেছিল। আমরা তাহাদের কথা না শোনায় তাহারা বিরক্ত হয় ও জুলুদের প্রতি এমন অশ্রাব্য খারাপ বাক্য বলে যে, কানের পীড়া বোধ হয়।

ধীরে ধীরে এই সিপাহীদের সহিত আমার পরিচয় হয় এবং তাহারা আমাদিগকে বাধা দেওয়ার চেষ্টা বন্ধ করে। এই লস্করের সঙ্গে ছিলেন কর্ণেল স্পার্কস্ ও কর্ণেল ভায়লী। তাঁহাদের সহিত আমার ১৮৯৬ সালে খুব বিরোধ হইয়াছিল। তাঁহারা আমার এই কার্য্য দেখিয়া আশ্চর্য্য হইয়া গেলেন। আমাকে নিজেরা ডাকিয়া লইয়া উপকার স্বীকার করিলেন। আমাকে জেনারেল মেকেঞ্জীর নিকট লইয়া গেলেন ও তাঁহার সহিত পরিচয় করাইয়া দিলেন।

ইঁহারা পেশাদার সিপাহী একথা যেন পাঠক মনে না করেন।

কর্ণেল ভায়লী খ্যাতনামা উকীল ছিলেন। কর্ণেল স্পার্কস্ এক কসাইখানার নামজাদা মালিক ছিলেন। জেনারেল মেকেঞ্জী নাতালের খ্যাতনামা কৃষিক্ষেত্র-স্বামী ছিলেন। ইহারা সকলেই স্বয়ং-সেবক ছিলেন এবং লস্করী-শিক্ষা ও অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছিলেন।

যে রোগীদিগকে আমাদের শুশ্রূষা করিতে হইত, তাহারা লড়াইতে জখম হইয়াছে একথাও যেন কেহ না মনে করেন। ইহাদের কতক ছিল সন্দেহবশে ধৃত কয়েদী। ইহাদিগকে জেনারেল চাবুক খাওয়ার সাজা দিয়াছিলেন। সেই চাবুকের ঘা, শুশ্রূষার অভাবে পাকিয়া উঠিয়াছিল। আর অন্য ভাগে ছিল সেই সব জুলু যাহারা মিত্র ছিল। এই মিত্রপক্ষীয়েরা মিত্রতার চিহ্ন পরিধান করা সত্ত্বেও তাহাদিগকে ভুল করিয়া সিপাহীরা ঘায়েল করিয়াছিল।

ইহা ছাড়া আমাকে গোরা সিপাহীদের জন্যও ঔষধ রাখা ও ঔষধ দেওয়ার ভার দেওয়া হইয়াছিল। ডাক্তার বুথের ছোট হাসপাতালে আমি এই কার্য্যে বৎসরকাল শিক্ষা লইয়াছিলাম, সেইজন্য এই কাজ আমার পক্ষে খুব সহজ ছিল। এই কার্য্যে অনেক গোরার সহিত আমার ভাল পরিচয় হয়।

লড়াইতে নিযুক্ত লস্কর কোনও এক জায়গায় বসিয়া থাকিত না। যেখান হইতে বিপদের খবর আসিত সেইখানেই দৌড়াইয়া যাইত। অনেকে ত ঘোড়সওয়ারই ছিল। আমাদের ছাউনী হেডকোয়ার্টার হইতে উঠিয়া গেল এবং আমাদিগকে তাহাদের পিছনে পিছনে ডুলীগুলি বাঁধিয়া লইয়া চলিতে হইল। দুই তিনবার ত একদিনেই ৪০ মাইল কুচ করিতে হয়। কিন্তু যেখানেই যাই না কেন—ভগবান্‌কে ধন্যবাদ যে, তাঁহার অভিপ্রেত কাজ ছাড়া অন্য কোনও কাজ

আঁমাদিগকে করিতে হয় নাই। যে জুলু মিত্রেরা ভুলে আহত হইত তাহাদিগকেই আমাদের ডুলীতে তুলিয়া লইয়া ছাউনীতে পঁহুছিতে হইত ও সেখানে তাহাদের শুশ্রূষা করিতে হইত।

২৫

হৃদয়মন্থন

জুলু 'বিদ্রোহে' আমার অনেক অভিজ্ঞতা লাভ হইয়াছিল এবং অনেক চিন্তা করার অবকাশ পাইয়াছিলাম। বোয়ার যুদ্ধে গিয়াও যুদ্ধের ভয়ঙ্করত্ব আমার কাছে তত স্পষ্ট হয় নাই, যতটা এই জুলু 'বিদ্রোহ' হইয়াছিল। এতো যুদ্ধ নয়, এ কেবল মানুষ শিকার করা হইতেছিল। এই রকম অনুভব কেবল আমার নয়, আমি যেসকল ইংরাজের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়াছি তাহাদেরও হইয়াছিল, দেখিয়াছি। প্রাতঃকালেই সৈন্যেরা গ্রামের মধ্যে গিয়া পটকা ফাটানোর মত বন্দুকের আওয়াজ করিত; আমরা দূর হইতে শুনিতে পাইতাম। এই আওয়াজ আমার কানে বড় বিষম বাজিত। আমি এই ব্যথা দায়ে পড়িয়া সহ্য করিতাম। আমাদের হাতে পড়িয়াছিল জুলুদিগকেই সেবা করার কাজ। আমরা যদি এই কার্য্যভার না লইতাম, তবে এই সেবা যে কেহই করিত না তাহা আমি দেখিতে পারিতেছিলাম। ইহাতেই আমার আত্মা শান্ত হইত।

এখানে বসতি খুবই কম ছিল। দূরে দূরে পাহাড় ও খাদ, তাহার মধ্যে মধ্যে এই সরল ও তথাকথিত জঙ্গলী জুলুদের বসতি। ইহা ছাড়া আর কিছু ছিল না। এই দৃশ্য গাম্ভীর্য্যপূর্ণ ছিল। মাইলের পর মাইল জনশূন্য স্থানের উপর দিয়া কোনও আহত জুলুকে বহন করিয়া যখন আমাদিগকে যাইতে হইত, তখন আমি চিন্তায় ডুবিয়া যাইতাম।

এইখানেই আমার ব্রহ্মচর্য্য-সম্বন্ধে ধারণা পরিপক্ক হয়। আমার সাথীদের লইয়াও এ বিষয় আমি কিছু আলোচনা করি। ব্রহ্ম-দর্শনের জন্য ব্রহ্মচর্য্য যে অনিবার্য্য আবশ্যক বস্তু, তাহা তখনও আমার কাছে

ধরা পড়ে নাই। উহা যে সেবার জন্য আবশ্যক তাহাই আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইয়াছিলাম। আমার মনে হইল যে, এই প্রকারের সেবার কাজ ত আমার কাছে ক্রমশঃই বেশী করিয়া আসিবে, আর যদি আমি ভোগবিলাসে, সন্তান উৎপাদনে ও তাহাদের পোষণ কার্য্যে মগ্ন থাকি, তাহা হইলে আমাদ্বারা সম্পূর্ণ সেবা হইয়া উঠিবে না। আমি ত দুই নৌকায় পা দিয়া চলিতে পারিব না। যদি এই সময় আমার স্ত্রী গর্ভবতী থাকিতেন, তবে নিশ্চিন্ত মনে এই সেবায় আমি কি ঝাঁপ দিয়া পড়িতে পারিতাম? ব্রহ্মচর্য্য পালন না করিলে পরিবার প্রতিপালন ও জন-সেবা—এই দুইটি মানুষের পক্ষে পরস্পরবিরোধী বস্তু হইয়া পড়ে। বিবাহিত হইয়াও ব্রহ্মচর্য্য পালন করিলে, পরিবার প্রতিপালন কার্য্য সমাজ-সেবার বিরোধী হয় না। এইপ্রকারের ভাবের বশীভূত হইয়া আমি ব্রত লওয়ার জন্য কতকটা অধীর হইয়া পড়িলাম! আমার মনে এক প্রকারের আনন্দ আসিল, আমার উৎসাহ বাড়িল। কল্পনায় আমার সেবাক্ষেত্র খুব বিশাল করিয়া ফেলিলাম। এই রকম যখন মনের মধ্যে বিচার চলিতেছিল ও শরীরে ক্লেশ চলিতেছিল তখনই সংবাদ আসিল যে, যুদ্ধ শেষ হইয়া আসিয়াছে এবং আমাদের দল ভাঙ্গিবার হুকুম পাওয়া যাইবে। দ্বিতীয় দিনে আমরা ঘরে ফিরিবার আদেশ পাইলাম ও তারপর অল্প দিনেই সকলে নিজ নিজ ঘরে ফিরিলাম। ইহার পর অল্প সময়ের মধ্যে গবর্ণর উক্ত সেবার জন্য আমাকে সম্মান জানাইয়া নিজে পত্র দিয়াছিলেন।

ফিনিক্সে আসিয়াই আমি আনন্দের সহিত ব্রহ্মচর্য্যের কথা ছগন-লাল, মগনলাল, ওয়েষ্ট ইত্যাদিকে বলি। সকলের কাছে কথাটা ভাল লাগিল। সকলেই উহার আবশ্যকতা স্বীকার করিল, কিন্তু সকলের

কাছেই উহা পালন করা বড় কঠিন বলিয়া বোধ হইল। কয়েকজন পালন করিতে চেষ্টা করার সাহস করিলেন এবং তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ সফল হইয়াছেন বলিয়াই আমার বিশ্বাস।

আমি ব্রত লইয়া ফেলিলাম যে, এখন হইতে যাবজ্জীবন ব্রহ্মচর্য্য পালন করিব। এই ব্রত কত মহৎ ও উহা পালন করা কত কঠিন তাহা আমি সে সময় সম্পূর্ণরূপে বুঝিতে পারি নাই। কিন্তু উহা পালন করা যে কঠিন তাহা আমি আজ পর্য্যন্তও অনুভব করিতেছি। উহার মহত্ত্ব দিন দিন বেশী করিয়া দেখিতেছি। ব্রহ্মচর্য্য ব্যতীত জীবন আমার কাছে শুষ্ক ও পশুজীবনের মত লাগে। পশুরা স্বভাবতঃই অসংযত। মানুষের মনুষ্যত্ব হইতেছে স্বেচ্ছায় সংযমের বশীভূত হওয়া। ব্রহ্মচর্য্যের যে স্তুতিবাদ ধর্ম্মগ্রন্থে দেখিতে পাওয়া যায় তাহা পূর্ব্বে আমার কাছে অতিশয়োক্তি বলিয়া মনে হইত। কিন্তু এখন দেখিতেছি, সেই সকলই ঠিক কথা। যত দিন যাইতেছে ততই বুঝিতে পারিতেছি যে, সে সেব কথা অভিজ্ঞতা হইতে প্রাপ্ত।

যে ব্রহ্মচর্য্যের শক্তি এত অদ্ভুত, সে ব্রহ্মচর্য্য সহজ নয়, উহা কেবল শারীরিক বস্তু নয়। শারীরিক সংযম দ্বারা ব্রহ্মচর্য্যের আরম্ভ মাত্র হয়। কিন্তু শুদ্ধ ব্রহ্মচর্য্যে বিচারের মলিনতাও থাকা সম্ভব নহে। সম্পূর্ণ ব্রহ্মচারীর স্বপ্নেও বিকারযুক্ত বিচার হয় না, যতক্ষণ পর্য্যন্ত বিকারযুক্ত স্বপ্ন দেখা সম্ভব থাকে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত ব্রহ্মচর্য্য অনেক দূরে রহিয়াছে এইরূপ মানিতে হইবে।

আমাকে কায়িক ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতেই মহাকষ্ট করিতে হইয়াছে। এতদিনে একথা বলিতে পারি যে, সে সম্বন্ধে এখন আমি নির্ভয় হইয়াছি। কিন্তু আমার বিচারশক্তির উপর আমার

যে জয়লাভ করা আবশ্যক তাহা আমি এখনো পাই নাই। আমি চেষ্টার ক্রটি করিতেছি—এরকম মনে হয় না। কেমন করিয়া কোথা হইতে, নিজের অনিচ্ছায় বিকারযুক্ত বিচার আমার উপর যে আসিয়া পড়ে তাহা আজও জানিতে পারি নাই।

চিন্তাকে সংযত করার চাবি যে মানুষের কাছেই আছে, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই। আর এই চাবি প্রত্যেককেই নিজের জন্য খুঁজিয়া লইতে হয়, এই সিদ্ধান্তে আমি এখন পঁহুছিয়াছি। মহাপুরুষেরা আমাদের জন্য তাঁহাদের নিজেদের অভিজ্ঞতা রাখিয়া গিয়াছেন। তাঁহারা পথ-প্রদর্শক। কিন্তু তাঁহাদের অভিজ্ঞতাও পূর্ণ বস্তু নয়। সম্পূর্ণতা কেবল ঈশ্বর-প্রসাদের মধ্যেই আছে। সেইজন্য ভক্তেরা নিজের তপশ্চর্য্যায় লব্ধ মন্ত্র, যাহা তাঁহাদের নিজেদিগকে পবিত্র করিয়াছে, সেই রামনামাদি মন্ত্র রাখিয়া গিয়াছেন। সম্পূর্ণভাবে ঈশ্বরকে আত্ম-সমর্পণ করা ছাড়া বিচারশক্তির উপর সম্পূর্ণ জয়লাভ করা যায় না। এই শিক্ষাই সমস্ত ধর্মপুস্তকে রহিয়াছে। ব্রহ্মচর্য্য পরিপূর্ণ ভাবে পালনের চেষ্টার দ্বারা আমি যে অভিজ্ঞতা লাভ করিয়াছি, ইহার সত্যতা তাহার ভিতর দিয়াই আমার কাছে ধরা পড়িয়াছে। আমার অন্তরের সেই সংগ্রামের অল্প বিস্তর ইতিহাস পরবর্ত্তী অধ্যায় গুলিতে আসিবেই। এ অধ্যায়ের অন্তে কেবল এতটুকুই বলিয়া রাখি যে, আমার উৎসাহ-বশতঃ প্রথমে আমার কাছে ব্রতপালন সহজই লাগিয়াছিল। ব্রত লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি একটা পরিবর্ত্তন করিয়া ফেলিলাম। পত্নীর সহিত এক শয্যায় বা একান্তে থাকা ত্যাগ করিলাম। যে ব্রহ্মচর্য্য ইচ্ছায়-অনিচ্ছায় ১৯০০ সাল হইতে পালন করিয়া আসিতেছিলাম, তাহাই ব্রতরূপে ১৯০৬ সালের মধ্যভাগ হইতে এইরূপে আরম্ভ হইল।

২৬

সত্যাগ্রহের উৎপত্তি

আমার জন্য জোহানেস্‌বর্গে যে ঘটনার সৃষ্টি হইতেছিল তাহাতে সত্যাগ্রহ অবলম্বন করার জন্যই এই প্রকার আত্মশুদ্ধি (ব্রহ্মচর্য্য ব্রত গ্রহণ) আমার হইয়াছিল কিনা কে বলিতে পারে। আজ আমি দেখিতেছি যে, সেদিনকার ব্রহ্মচর্য্যব্রত লওয়ার পূর্ব্ববর্ত্তী আমার জীবনের সমস্ত প্রধান ঘটনাই আমাকে অলক্ষিতে ঐদিনের সেই ব্রতের জন্য তৈরী করিতেছিল।

সত্যাগ্রহ শব্দের উৎপত্তি হওয়ার পূর্ব্বেই সত্যাগ্রহ বস্তুর উৎপত্তি হইয়াছিল। সত্যাগ্রহের উৎপত্তির সময়েও এ জিনিষটা যে কি, আমি নিজেও তাহার পরিচয় পাই নাই। গুজরাটী ভাষাতেও আমরা ইংরাজী "প্যাসিভ রেজিষ্টান্স" শব্দ দ্বারা উহাকে পরিচিত করিতেছিলাম। যখন গোরাদের এক সভায় আমি দেখিলাম যে, 'প্যাসিভ রেজিষ্টান্স' শব্দের সঙ্কীর্ণ অর্থ করা হইয়া থাকে, উহা দুর্ব্বলের অস্ত্র বলিয়াই কল্পিত, উহাতে দ্বেষ থাকিতে পারে, উহার অন্তিম স্বরূপ হিংসায় প্রকট হইতে পারে, তখন ঐ সকল অস্বীকার করিয়া ভারতবাসীদের লড়াইয়ের প্রকৃত স্বরূপ খোলাসা করিয়া বুঝাইতে হইয়াছে। সেইজন্য ভারতীয়দের এই লড়াইয়ের সত্য-স্বরূপ সূচিত করার নিমিত্ত নূতন শব্দ-সৃষ্টি আবশ্যক হইয়া পড়িল।

তেমন নূতন শব্দ কি হইবে তাহা আমি বুঝিয়া উঠিতে পারিতেছিলাম না। তাই 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়নে'র পাঠকদের কাছে একটা নাম

বাছিয়া দিবার জন্য নামমাত্র পুরস্কারের ঘোষণা করিলাম। এই প্রতিযোগিতার ফলে সৎ+আগ্রহ মিলাইয়া 'সদাগ্রহ' শব্দ সৃষ্টি করিয়া মগনলাল গান্ধী পাঠাইয়া দিলেন। তিনিই পুরস্কার পাইলেন। কিন্তু 'সদাগ্রহ' শব্দকে সম্পূর্ণ স্পষ্ট করার জন্য আমি একটী 'য'-ফলা মধ্যে দিয়া "সত্যাগ্রহ" এই গুজরাটী শব্দ বানাইলাম ও এই নামেই এই লড়াই পরিচিত হইতে লাগিল।

এই লড়াইয়ের ইতিহাস আমার দক্ষিণ আফ্রিকার জীবনের, বিশেষ করিয়া আমার সত্যের প্রয়োগের ইতিহাস বলা যায়। এই ইতিহাসের অধিকাংশই য়েরোড়া জেলে লিখিয়া ফেলিয়াছিলাম ও বাকীটা বাহিরে আসিয়া পূর্ণ করি। উহার সমস্তটা 'নবজীবনে' প্রকাশিত হইয়াছিল, পরে "দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস" নামে পুস্তকাকারে প্রকাশ হইয়া গিয়াছে। তাহার ইংরাজী অনুবাদ* শ্রীভালজী গোবিন্দজী দেশাই 'কারেণ্ট থট্' এর জন্য করিতেছেন। ভবিষ্যতে উহা শীঘ্রই পুস্তক আকারে প্রকাশ করার ব্যবস্থা করিতেছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার প্রধান প্রধান পরীক্ষার সমস্ত কথা, যাঁহার ইচ্ছা হয় এই গ্রন্থ হইতেই তিনি জানিতে পারিবেন। গুজরাটী (আত্মকথার) পাঠকের মধ্যে যাঁহার দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস পড়া হয় নাই তাঁহাকে উহা দেখিয়া লইবার পরামর্শ দিতেছি। অতঃপর পরবর্ত্তী আর কয়েকটি অধ্যায়ে উক্ত ইতিহাসের অন্তর্গত মুখ্য কথাভাগ বাদ দিয়া, দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার জীবনের যে অল্পস্বল্প ব্যক্তিগত প্রসঙ্গ

* দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাসের ইংরাজী অনুবাদ মাদ্রাজের শ্রীগণেশ পুস্তকাকারে এক্ষণে প্রকাশ করিয়াছেন।

রহিয়া গিয়াছে তাহাই সন্নিবিষ্ট করিব ভাবিতেছি। তাহার পরেই আমার ভারতবর্ষে সত্যের পরীক্ষার প্রসঙ্গ পাঠকগণের কাছে উপস্থিত করিব। সেইজন্য, প্রয়োগের প্রসঙ্গের ক্রম অবিচ্ছিন্ন রাখার নিমিত্ত, দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাস জানিয়া লওয়া আবশ্যক।*

*'দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহে'র বাংলা অনুবাদ শীঘ্রই প্রকাশিত হইবে।

২৭

আহারে অধিকতর পরীক্ষা

আমার এক চিন্তা ছিল—মন, বাক্য ও দেহ দ্বারা কেমন করিয়া ব্রহ্মচর্য্য পালন করা যায়, সত্যাগ্রহ যুদ্ধের জন্য কেমন করিয়া অধিক হইতে অধিকতর সময় বাঁচানো যায়। অধিকতর আত্মশুদ্ধি কেমন করিয়া হয়—ইহাই ছিল দ্বিতীয় চিন্তা। এই দুই চিন্তার জন্য খাদ্য সম্বন্ধে অধিক সংযম এবং অধিক পরিবর্ত্তন করার প্রেরণা আসিল।

আমার জীবনে অল্পাহার এবং উপবাস অনেকখানি স্থান লইয়াছে। যাহাদের বিষয়-বাসনা আছে তাহাদের মধ্যে জিহ্বার স্বাদও ভাল রকমেই থাকে। আমার নিজের বিষয়েই এই কথা বলিতেছি। জননেন্দ্রিয় ও স্বাদেন্দ্রিয়কে দমন করার জন্য আমাকে অনেক বিড়ম্বনা ও বাধা সহ্য করিতে হইয়াছে। আজও ঐ উভয়ের উপর পুরাপুরি জয় লাভ করিতে পারিয়াছি বলিয়া আমি দাবী করিতে পারি না। আমি নিজেকে অত্যাহারী মনে করিতাম। মিত্রেরা যাহা আমার ভিতর সংযম বলিয়া মনে করিয়াছেন, তাহাকে কদাচ আমি সংযম মনে করি নাই। যতটা সংযম আমি রাখিয়াছি ততটা যদি না রাখিতে পারিতাম, তবে আমি পশুরও অধম হইয়া যাইতাম এবং কবে নষ্ট পাইতাম। আমার দোষ আমি ঠিক দেখিতে পারিয়াছিলাম বলিয়া আমি তাহা দূর করার জন্য খুব চেষ্টা করিতাম এবং সেই জন্যই আমি এত বৎসর পর্য্যন্ত এই শরীরকে টিকাইয়া রাখিতে পারিয়াছি এবং তাহার দ্বারা কাজও আদায় করিতে পারিয়াছি।

এইরকম জ্ঞান হওয়ার জন্য এবং অনুকূল সঙ্গ অপ্রত্যাশিত ভাবে

পাইয়া আমি একাদশীতে ফলাহার অথবা উপবাস পালন করিতাম। জন্মাষ্টমী ইত্যাদি অন্য তিথিও পালন করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, কিন্তু সংযমের দৃষ্টিতে আমি ফলাহার এবং অন্নাহারের মধ্যে বেশী ভেদ দেখিতে পাইলাম না। যে রসাস্বাদ আমরা সাধারণ খাদ্যাদিতে পাইয়া থাকি, সেই রসাস্বাদই ফলাহারেও পাওয়া যায় ও অভ্যাস হইয়া গেলে উহা হইতে অধিক রসাস্বাদও পাওয়া যায়। সেই হেতু পালনীয় তিথিতে সম্পূর্ণ উপবাস অথবা একবার মাত্র আহার আমি অধিক শ্রেষ্ঠ গণ্য করিতাম। আর যদি প্রায়শ্চিত্তাদির নিমিত্ত হইত, তবে সেজন্য আমি পুরা উপবাসই পালন করিতাম।

আমি ইহাও দেখিলাম যে, শরীর খুব হালকা হওয়ায় রসাস্বাদ বাড়িল, ক্ষুধা খুব বাড়িল। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও দেখিলাম যে, উপবাসাদি যতটা সংযমের সাধন, ততটাই ভোগেরও সাধন হইতে পারে। এই জ্ঞান হওয়ার পরে, একথা সমর্থন করে এমন অনেক অভিজ্ঞতা আমার নিজেরও হইয়াছে এবং অন্যেরও হইয়াছে, এরূপ দেখিয়াছি। আমার শরীর ভাল ও পটু করার জন্য ও প্রধানতঃ সংযম শিক্ষা করার জন্য, রসাস্বাদন জয় করিতে হইয়াছিল। সেই জন্য, আহার্য্য বস্তুর ও তাহার পরিমাণের অদল-বদল করিতে লাগিলাম। কিন্তু এই আস্বাদ আমার পিছনে পিছনে লাগিয়াই ছিল। যে বস্তু ত্যাগ করিতাম ও তাহার পরিবর্ত্তে যাহা গ্রহণ করিতাম, তাহাতেই নূতন এবং অধিকতর রস পাইতাম।

আমার এই পরীক্ষায় জনকয়েক সঙ্গী ছিলেন। তাঁহাদের মধ্যে হারমান কলেনবেক ছিলেন প্রধান। তাঁহার পরিচয় দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ ইতিহাস গ্রন্থে আমি দিয়াছি বলিয়া পুনরায় এখানে দেওয়া অনাবশ্যক। তিনি প্রত্যেক উপবাসে ও একবেলা আহারে অথবা অন্য

খাদ্য-পরিবর্ত্তনে আমার সঙ্গী হইতেন। যখন লড়াই ভাল রকম চলিতেছিল তখন আমি তাঁহার বাড়ীতেই থাকিতাম। আমরা উভয়েই আমাদের খাদ্য-পরিবর্ত্তনের আলোচনা করিতাম এবং নূতন পরিবর্ত্তনে পুরাতন অপেক্ষা অধিক রস পাইতাম। তখন এই আলোচনা ভালই লাগিত। উহাতে যে কোন অন্যায় ছিল তাহা মনে হইত না। অভিজ্ঞতার দ্বারা শিখিয়াছি যে, এই রকম রসচর্চ্চা অসঙ্গত। অর্থাৎ রসের জন্য না খাইয়া কেবল শরীর রক্ষার জন্য খাওয়াই উচিত। প্রত্যেক ইন্দ্রিয় যখন শরীর দ্বারা আত্মার দর্শনের জন্য কার্য্য করে, তখন রস শূন্যবৎ হইয়া যায় ও তখন সেই ইন্দ্রিয় স্বাভাবিকতা প্রাপ্ত হয়—ইহা বলা যায়।

ইন্দ্রিয়ের এই স্বাভাবিকতা পাওয়ার জন্য যতই পরীক্ষা করা হোক্ না কেন, কিছুই যথেষ্ট নহে এবং উহা করিতে যদি শরীরকেও আহুতি দিতে হয়, তবে তাহাও আমাদের তুচ্ছ গণ্য করিতে হইবে। ইদানীং এই ভাবের বিপরীত স্রোতই চলিয়াছে। নাশবান্ শরীরকে সুন্দর দেখানোর জন্য, তাহার আয়ুষ্কাল বাড়াইবার জন্য আমরা অনেক প্রাণীকে বলিদান করিতেছি, এবং তাহা করিয়া শরীর ও আত্মা উভয়-কেই হনন করিতেছি। এক রোগের চিকিৎসা করিতে গিয়া ইন্দ্রিয়ের ভোগ সুখ দেওয়ার জন্য, অনেক নূতন রোগ উৎপন্ন করিতেছি, আর এই ক্রিয়া যে নিজের চক্ষের সম্মুখেই চলিতেছে তাহা দেখিয়াও দেখি না।

আহার সম্বন্ধে পরীক্ষার কথা বর্ণনা করিবার জন্য কিছু স্থান লওয়া স্থির করিয়াছি, এবং এই কথাগুলি যাহাতে বুঝিতে পারা যায়, সেজন্য সেই আহার্য্য-বিষয়ক পরীক্ষার উদ্দেশ্য এবং তাহার পশ্চাতে যে বিচার-শৃঙ্খল রহিয়াছে তাহা সম্মুখে ধরিয়া দেখানোও আবশ্যক বলিয়া মনে করিতেছি।

২৮

পত্নীর দৃঢ়তা

কস্তুরবাঈ-এর উপর দিয়া তিনবার জীবন-সংশয় রোগ হইয়া গিয়াছে। আর, তিনবারই তিনি ঘরোয়া চিকিৎসায় বাঁচিয়া গিয়াছেন। তাহার মধ্যে প্রথমটির সময় সত্যাগ্রহ সংগ্রাম চলিতেছিল। তাঁহার বারংবার রক্তস্রাব হইত। একজন ডাক্তার বন্ধু অস্ত্রোপচার করার পরামর্শ দিয়াছিলেন। অনেক দ্বিধার পরে তিনি উহাতে সম্মত হন। শরীর খুবই ক্ষীণ হইয়া গিয়াছিল। ডাক্তার ক্লোরোফর্ম না করিয়াই অস্ত্র করিলেন। অস্ত্র করার সময় খুব ব্যথা পাইয়াছিলেন, কিন্তু যে ধৈর্য্যের সহিত কস্তুর-বাঈ এই ব্যথা সহ্য করিয়াছিলেন, তাহাতেও আমি আশ্চর্য্য হইয়া যাই। অস্ত্র-ক্রিয়া নির্ব্বিঘ্নে সম্পন্ন হয়। ডাক্তার ও তাঁহার স্ত্রী কস্তুর-বাঈয়ের খুব শুশ্রূষা করিয়াছিলেন।

এই ঘটনা ডারবানে ঘটিয়াছিল। দুই কি তিন দিন পরে ডাক্তার আমাকে নিশ্চিন্তমনে জোহানেস্‌বর্গে যাওয়ার অনুমতি দিলেন। আমি চলিয়া গেলাম। অল্পদিন পরেই সংবাদ আসিল যে, কস্তুর-বাঈ-এর শরীর মোটেই ভাল না, বিছানায় উঠিয়া বসার শক্তিও নাই। একবার মূর্চ্ছাও গিয়াছিল। ডাক্তার জানিতেন যে, আমাকে না জিজ্ঞাসা করিয়া কস্তুর-বাঈকে ঔষধের সহিত মদ অথবা মাংস খাইতে দেওয়া যায় না। ডাক্তার আমাকে জোহানেস্‌বর্গে টেলিফোন করিলেন—"আপনার স্ত্রীকে মাংসের সুরুয়া অথবা 'বীফ্‌টী' দেওয়ার প্রয়োজন দেখিতেছি। আমাকে অনুমতি দিন।"

আমি উত্তর দিলাম—"আমাদ্বারা এই অনুমতি দেওয়া চলিবে না, কিন্তু কস্তুর-বাঈ এ বিষয়ে স্বাধীন। তাঁহাকে জিজ্ঞাসা করার মত অবস্থা থাকে ত জিজ্ঞাসা করিবেন, আর তিনি যদি খাইতে চাহেন তবে অবশ্যই উহা দিবেন।"

"রোগীকে এসময় আমি জিজ্ঞাসা করিতে পারিব না। আপনার নিজেরই এখানে আসা আবশ্যক। আমার যাহা সঙ্গত মনে হয় তাহা খাইতে দিতে যদি স্বাধীনতা না দেন, তবে আপনার স্ত্রীর জন্য আমি দায়ী নই।"

আমি সেই দিনই ডারবানের ট্রেণ ধরিয়া ডারবানে পঁহুছিলাম। ডাক্তার সমাচার দিলেন—"আমি সুরুয়া খাওয়াইয়াই আপনাকে টেলিফোন করিয়াছিলাম।"

"ডাক্তার, ইহাকে ত আমি ধোকা দেওয়া বলি।"

"চিকিৎসা করার সময় আমি ধোকা-টোকা বুঝি না। বস্তুতঃ আমরা, ডাক্তারেরা, এমন সময় রোগীকে ও তাহার আত্মীয়কে ঠকানোই পুণ্য বলিয়া মনে করি। আমার ধর্ম্ম যেমন করিয়া পারি রোগীকে বাঁচানো।"—ডাক্তার দৃঢ়তার সহিত এই জবাব দিলেন।

আমার বড়ই দুঃখ হইল। আমি শান্ত রহিলাম। ডাক্তার লোক ভাল ছিলেন এবং তিনি আমার বন্ধু। তিনি এবং তাঁহার পত্নী আমার খুব উপকার করিয়াছেন। কিন্তু এরকম ব্যবহার আমি সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলাম না।

"ডাক্তার, এখন সাফ্ করিয়া বলুন আপনি কি করিতে চান? আমার পত্নীকে তাঁহার স্বেচ্ছায় ভিন্ন কখনও মাংস খাইতে দিব না। উহা না খাইলে যদি তাঁহার মৃত্যু হয় তাহাও সহ্য করিতে প্রস্তুত আছি।"

ডাক্তার বলিলেন—"ও সব ফিলজফি আমার ঘরে চলিবে না। আপনার স্ত্রীকে যদি আমার চিকিৎসাধীনে রাখেন, তবে মাংস বা যাহাই খাওয়ানো দরকার মনে করিব তাহা অবশ্যই খাওয়াইব। যদি ইহা না করিতে দেন, তবে আপনি আপনার স্ত্রীকে লইয়া যান। আমার ঘরে ইচ্ছা করিয়া তাঁহাকে মরিতে দিতে পারিব না।"

"তাহা হইলে আপনি কি এই বলিতেছেন যে, আমার স্ত্রীকে এখনই লইয়া যাইব?"

"আমি কি আপনাকে লইয়া যাইতে বলিতেছি? আমি বলিতেছি—আমার চিকিৎসার উপর কোনও রকম হাত দিতে পারিবেন না। আমার ও আমার স্ত্রীর দ্বারা যতটা হয় তাহা করিব এবং আপনি ফিরিয়া যাইতে পারেন। কিন্তু এই সোজা কথাটা যদি বুঝিতে না পারেন, তবে নাচার হইয়া বলিতে হইবে যে, আপনার স্ত্রীকে আমার ঘর হইতে লইয়া যান।"

আমার মনে হয় যে, সেই সময় আমার সহিত আমার এক ছেলে ছিল। তাহাকে আমি জিজ্ঞাসা করিলাম। সে আমার সহিত সম্পূর্ণ একমত হইয়া বলিল—"মাকে ত মাংস দেওয়া যায় না।"

তার পর আমি কস্তুর-বাঈয়ের নিকটে গেলাম। তিনি বড়ই কাতর হইয়া পড়িয়াছিলেন। তাঁহাকে কোনও কথা জিজ্ঞাসা করাও দুঃখদায়ক ছিল। আমি তাঁহাকে সংক্ষেপে বুঝাইলাম। তিনি দৃঢ়তার সহিত জবাব দিলেন—"আমার দ্বারা মাংসের সুরুয়া খাওয়া চলিবে না। মানবজন্ম বারে বারে হয় না। তোমার কোলে আমি মরিয়া যাই ভাল, কিন্তু আমার এই দেহ যেন অপবিত্র করা না হয়।"

আমি যতদূর বুঝাইবার বুঝাইলাম ও বলিলাম—"তুমি আমার সঙ্কল্প

অনুসরণ করিতে বাধ্য নও, আমার পরিচিত ভারতীয়দের ভিতরেও কতজন ঔষধের জন্য মাংস ও মদ খাইয়াছে।"

কিন্তু তিনি এতটুকুও না টলিয়া বলিলেন—"আমাকে এখান হইতে লইয়া যাও।"

আমি খুব সন্তুষ্ট হইলাম। লইয়া যাইতে ভয় পাইতেছিলাম, তবুও লইয়া যাওয়াই স্থির করিলাম। ডাক্তারকেও আমার স্ত্রীর সঙ্কল্পের কথা বলিলাম। ডাক্তার রাগ করিয়া বলিলেন—"বেচারীকে এ রকম কথা বলিতে আপনার লজ্জা হইল না? আমি ত আপনাকে বলিয়াছি যে, আপনার স্ত্রীর অবস্থা এখান হইতে লইয়া যাওয়ার মত নয়, এতটুকুও ঝাঁকুনী সহ্য করার শক্তি তাঁহার নাই। রাস্তাতেই যদি তাঁহার প্রাণ যায় তাহাতে আমি আশ্চর্য্য হইব না। তবুও আপনি যদি জেদ করিয়া না মানেন, তবে যাহা ইচ্ছা করিতে পারেন। যদি সুরুয়া না দিতে দেন, তবে আমার এখানে একরাত্রি রাখার ঝক্কিও আমি লইতে পারিব না।"

ছিঁটা ছিঁটা বৃষ্টি হইতেছিল। ষ্টেশন দূরে ছিল। ডারবান্ হইতে ফিনিক্স রেলে, তারপর রেলষ্টেশন হইতে প্রায় আড়াই মাইল রাস্তা যাইতে হয়। ঝক্কি খুবই ছিল। তবে ঈশ্বর সহায় আছেন বলিয়া মানিয়া লইলাম। ফিনিক্সে একজনকে পূর্ব্বেই পাঠাইয়া দিলাম। ফিনিক্সে আমাদের 'হ্যামক্' ছিল। হ্যামক কাপড়ের তৈরী এক রকম ঝোলা। উহার দুই দিক্ বাঁশে বাঁধিয়া লইলে রোগী উহাতে আরামে ঝুলিয়া থাকিতে পারে। ওয়েষ্টকে বলিয়া পাঠাইলাম যে, হ্যামক, এক বোতল গরম দুধ, এক বোতল গরম জল ও লোক লইয়া যেন তিনি ষ্টেশনে আসেন।

যখন ট্রেণের সময় হইল তখন রিক্‌শা আনাইলাম আর তাহাতেই

এই ভয়ঙ্কর পীড়িতাবস্থায় স্ত্রীকে লইয়া রওনা হইলাম। পত্নীকে আমার সাহস দেওয়ার দরকার ছিল না, উল্টা তিনিই আমাকে সাহস দিতে ছিলেন—"আমার কিছুই হয় নাই, তুমি চিন্তা করিও না।"

তাঁহার দেহ অস্থিচর্ম্মসার হইয়াছিল, ওজন ছিল না। কিছু দিন হইতে খাওয়া ছিল না। ট্রেণের কাম্‌রা পর্য্যন্ত বিশাল লম্বা প্লাট-ফরমের উপর দিয়া যাইতে হইত, রিক্‌সা সেখানে যাইতে পারে না। আমি তাঁহাকে কোলে করিয়া কাম্‌রা পর্য্যন্ত লইয়া গেলাম। ফিনিক্সে সেই ঝোলা আসিয়াছিল। তাহাতে রোগীকে আরামে লইয়া গেলাম। সেখানে গিয়া কেবল জল-চিকিৎসায় ধীরে ধীরে তাঁহার শরীর ভাল হইতে লাগিল।

ফিনিক্সে পঁহুছার দুই তিন দিন পরে এক স্বামীজী আসিলেন, তিনি আমার 'জেদে'র কথা শুনিয়াছিলেন। দয়াপরবশ হইয়া আমাদের দুই জনকে বুঝাইতে আসিলেন। আমার মনে আছে যে, যখন স্বামীজী আসিতেন তখন মণিলাল ও রামদাসও হাজির হইত। স্বামীজী মাংসাহারের নির্দ্দোষতার উপর ব্যাখান চালাইতেন। মনুস্মৃতির শ্লোক আওড়াইতেন। পত্নীর সম্মুখে এই রকম কথাবর্ত্তা আমার ভাল লাগিত না, কিন্তু ভদ্রতার খাতিরে কথা চলিতে দিতাম। আমার মাংসাহারের মত সম্পর্কে মনুস্মৃতির প্রমাণ-অপ্রমাণের আবশ্যকতা ছিল না। সে সকল শ্লোকই আমি জানিতাম। আমি জানিতাম, এক পক্ষ আছেন যাঁহারা উহাকে প্রক্ষিপ্ত মনে করেন। আর যদি উহা প্রক্ষিপ্ত না-ই হয়, তবুও নিরামিষাহার সম্বন্ধে আমার বিচার স্বাধীন ভাবেই গঠিত হইয়া গিয়াছিল। কস্তুর-বাঈয়ের শ্রদ্ধাতেই তাঁহারও কাজ চলিয়া যাইত। সে বেচারী শাস্ত্রের প্রমাণ কি জানে? তাঁহার কাছে পিতা-

পিতামহের আচরণই ধর্ম্ম ছিল। পিতার ধর্ম্মের উপর ছেলেদের বিশ্বাস ছিল, সেইজন্য উহারা তাঁহার সহিত কথা-বার্ত্তায় মজা উপভোগ করিত। অবশেষে এই কথাবার্ত্তা কস্তুর-বাঈ এই বলিয়া বন্ধ করিয়া দিলেন :—

"স্বামীজী, আপনি যাহাই বলুন আমার মাংসের সুরুয়া খাইয়া ভাল হওয়ার দরকার নাই। আপনার পায় পড়ি, আমার মাথার ব্যথা ধরাইয়া দিবেন না। আর যদি কথা বলিতে হয়, তবে ছেলেদের বাপের সহিত পরে বলিবেন, আমার এই কথা আপনাকে জানাইয়া দিলাম।"

২৯

ঘরোয়া সত্যাগ্রহ

১৯০৮ সালে আমার প্রথম জেলের অভিজ্ঞতা হয়। * তাহাতে আমি দেখি যে, জেলে যে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হয়, তাহা সংযমী অথবা ব্রহ্মচারীর স্বেচ্ছায় পালন করা উচিত। যেমন—কয়েদীদিগকে সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বেই, পাঁচটার মধ্যেই, খাইতে হয়। ভারতীয় ও নিগ্রো কয়েদীদিগকে কফি দেওয়া হয় না, আর দরকার হয়ত খাদ্যের সহিত লবণ খাইতে পারে। স্বাদের জন্য ত তাহাদের কোন দ্রব্যই খাওয়া নয়। যখন আমি জেলের ডাক্তারের নিকট ভারতীয়দের জন্য "কারী পাউডার" বা মশলার গুঁড়া চাহিয়াছিলাম, এবং রান্নার সময়েই লবণ দিতে বলিয়াছিলাম, তখন তিনি বলিয়াছিলেন—"এখানে ত তোমরা সুস্বাদু দ্রব্য খাইতে আস নাই। স্বাস্থ্যের দিক দিয়া মশলার কোনই আবশ্যক নাই। আর স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া নুন আলাদাই খাওয়া হোক্, অথবা রান্নার সময়ই দেওয়া হোক্—একই কথা।"

অনেক মেহনৎ করিয়া অবশেষে ঐ নিয়মের পরিবর্ত্তন করাইতে

* আমার জেলের অভিজ্ঞতা পুস্তকাকারে বাহির হইয়া গিয়াছে। মূল গুজরাটিতে লেখা হইয়াছিল এবং তাহাই ইংরাজীতে বাহির করা হইয়াছে আমার মনে হয় দুই ভাষাতেই এই বহি পাওয়া যায়। মোঃ কঃ গান্ধী।

এই পুস্তক নবজীবন কার্য্যালয়ে পাওয়া যায় না। বোম্বাইয়ের পুস্তক বিক্রেতাদের নিকট পাওয়া যায়। ব্যবস্থাপক, নবজীবন।

পারিয়াছিলাম। কিন্তু কেবল সংযমের দৃষ্টিতে বিচার করিলে, ঐ দুই সংযম ভালই ছিল। জোর করিয়া করানো সংযম কাজের নয়, কিন্তু স্বেচ্ছায় এই সংযম লইলে খুবই ভাল ফল দেয়। সেইজন্য জেল হইতে বাহির হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই আমি এই পরিবর্ত্তন করিলাম। তখন যতটা পারা যায় চা খাওয়া বন্ধ করিলাম ও সন্ধ্যার পূর্ব্বে আহারের অভ্যাস করিলাম। আজ উহা স্বাভাবিক হইয়া পড়িয়াছে।

আবার এমন এক ব্যাপার হইল, যাহাতে নুনও ত্যাগ করিলাম এবং প্রায় দশ বৎসর পর্য্যন্ত একটানা এই অবস্থায় চলিয়াছিল। আহার-সম্বন্ধে কতকগুলি বহিতে পড়িয়াছি যে, লোকের নুন খাওয়ার দরকার নাই, বরঞ্চ না খাইলেই স্বাস্থ্যের দৃষ্টিতে লাভ আছে। ব্রহ্মচারীর উহাতে লাভই হইবে—এইরূপ আমি বুঝিয়াছিলাম। যাহাদের শরীর দুর্ব্বল তাহাদের ডালও খাইতে নাই—এই রকম পড়িয়াছিলাম ও বুঝিয়াছিলাম। কিন্তু আমি উহা তৎক্ষণাৎ ছাড়িতে পারি নাই। ঐ দুইটা জিনিষই আমার প্রিয় ছিল।

অস্ত্র করার পর কিছুদিন কস্তুর-বাঈয়ের রক্তস্রাব বন্ধ ছিল, কিন্তু পরে খুব বাড়িয়াছিল। উহা কিছুতেই থামিত না। ঠাণ্ডা জলের চিকিৎসাতেও কিছু হইল না। আমার জল-চিকিৎসার উপর পত্নীর বিশেষ শ্রদ্ধা ছিল না, তবে খারাপও বলিতেন না। আমার অন্য যে সব চিকিৎসা করার ছিল তাহাতে যখন কোনও ফল হইল না, তখন তাঁহাকে লবণ ও ডাল ত্যাগ করার জন্য অনুরোধ করিলাম। কিন্তু অনেক মিনতি করাতেও আমার কথা সমর্থনের জন্য পুস্তক পড়িয়া শুনানো সত্ত্বেও তিনি মানিলেন না। শেষে

বলিলেন—"তোমাকে যদি কেহ নূন ও ডাল ছাড়িতে বলে তবে তুমিও ছাড়িবে না।" আমার দুঃখ হইল, আনন্দও হইল। আমার প্রেম তাহার উপর বর্ষণ করার সুযোগ পাইলাম। সেই আনন্দে আমি তৎক্ষণাৎ বলিলাম—"তুমি ভুল মনে করিয়াছ, আমার যদি অসুখ হয়, আর বৈদ্য ঐ জিনিষ, কি আর কিছু ছাড়িতে বলে তবে অবশ্যই ছাড়িব। কিন্তু সে কথা যাক্। ডাক্তারের নিষেধ ছাড়াই আমি এক বৎসরের জন্য লবণ ও ডাল ছাড়িয়া দিলাম। তুমি ছাড় আর না ছাড় সে আলাদা কথা।"

পত্নীর বড়ই অনুতাপ হইল। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আমাকে মাফ্ কর। তোমার স্বভাব জানিয়াও আমি কেনই বা একথা তোমাকে বলিতে গেলাম। এখন আমি আর নূন ও ডাল খাইব না—কিন্তু তুমি তোমার কথা ফিরাইয়া লও। ইহাতে আমাকে বড়ই সাজা দেওয়া হইবে।"

"তোমার নূন ও ডাল ছাড়িয়া দেওয়া খুব ভাল। আমার বিশ্বাস উহাতে তোমার উপকারই হইবে। কিন্তু আমি যে প্রতিজ্ঞা একবার লইয়াছি তাহা আর ফিরাইব না। আমার ত লাভই হইবে। যে কারণেই হোক্ সংযম পালন করিলে লাভই হইয়া থাকে। তুমি সেজন্য অনুরোধ করিও না। আমার দিক্ হইতে ইহাতে আমার পরীক্ষাই হইতেছে। এই দুই বস্তু যাহা ছাড়িতে সঙ্কল্প করিলাম তাহাতে তোমার সাহায্য যেন পাই।"

ইহার পর আমাকে অনুরোধ করার কিছুই ছিল না। "তুমি বড়ই জেদী, কাহারও কথাই শোন না।"—এই কথা বলিয়া কস্তুর-বাঈ খুব চোখের জল ফেলিয়া শান্ত হইলেন।

ইহাকেই আমি সত্যাগ্রহ বলিয়া পরিচয় দিতে চাই, ইহাই আমার জীবনের মধুর স্মৃতির মধ্যে এক স্মৃতি।

ইহার পর কস্তুর-বাঈয়ের শরীর খুব ভাল হইল। ইহা নূন ও ডাল ত্যাগ করার জন্যই হোক্, অথবা আংশিক সে জন্যই এবং আংশিক তাঁহার ত্যাগবৃত্তি হইতে আহারে ছোট-বড় নানা পরিবর্ত্তনের জন্যই হোক্, অথবা স্বাস্থ্যের নিয়ম পালন করাইবার জন্য তাঁহার উপর আমার কড়া দৃষ্টি রাখার জন্যই হোক্, কিংবা উপরি উক্ত ঘটনায় মানসিক উল্লাস-বশতঃই হোক্—কেন যে হইয়াছিল তাহা বলিতে পারি না। কস্তুর-বাঈয়ের অসুখ সারিল, রক্তস্রাব বন্ধ হইল ও "বৈদ্যরাজ" বলিয়া আমার খ্যাতি বাড়িল।

আমার নিজের উপর এই দুই দ্রব্য ত্যাগের প্রভাব খুব ভাল হইয়াছিল। উহা ত্যাগ করার পর নূনের জন্য বা ডালের জন্য ইচ্ছাও রহিল না। এক বৎসর ত চট্ করিয়া কাটিয়া গেল। ইন্দ্রিয়-সমূহের শান্তভাব বেশী অনুভব করিতে লাগিলাম, আর সংযম বাড়াইবার জন্য মন দৌড়াইয়া চলিতে লাগিল। বৎসর শেষ হওয়ার পরেও নূন ও ডালের ত্যাগ দেশে আসার পূর্ব্ব পর্য্যন্ত চলিয়াছিল। মাত্র একবার, বিলাতে ১৯১৪ সালে নূন ও ডাল খাইতে হইয়াছিল। সে কথা ও দেশে ফিরিয়া আসার পর ঐ দুই জিনিষ কেমন করিয়া খাইতে আরম্ভ করিয়াছিলাম, সে কথা পরে হইবে।

নূন ও ডাল ছাড়িয়া দেওয়ার পরীক্ষা আমি অন্য সাথীদের উপরও ভালরকমেই করিয়াছিলাম ও দক্ষিণ আফ্রিকায় উহার পরিণাম ভালই হইয়াছিল। চিকিৎসকের দৃষ্টিতে উভয় জিনিষের সম্বন্ধেই দুই মত আছে। কিন্তু সংযমের দৃষ্টিতে উভয় বস্তু ত্যাগের যে লাভ আছে

তাহাতে আমার সন্দেহ নাই। ভোগী ও সংযমীর আহার্য্য ভিন্ন ও তাহাদের পথ ভিন্ন রকম হওয়া আবশ্যক। ব্রহ্মচর্য্য পালন করিতে ইচ্ছুক হইয়া যদি ভোগীর জীবন-ধারা লওয়া যায় তবে ব্রহ্মচর্য্য রাখা কঠিন, এমন কি কখন কখন তাহা অসম্ভব হইয়াই দাঁড়ায়।

৩০

সংযম অভিমুখে

কস্তুর-বাঈয়ের অসুখের জন্য আহারে কতকগুলি পরিবর্ত্তন হইয়া গিয়াছে, তাহা পূর্ব্বের অধ্যায়ে বলিয়াছি। কিন্তু এখন দিনের পর দিন ব্রহ্মচর্য্যের দৃষ্টিতে আহারের পরিবর্ত্তন হইতে লাগিল।

ইহার মধ্যে প্রথম পরিবর্ত্তন হয় দুধ ত্যাগ করা। দুধ যে ইন্দ্রিয় বিকার উপস্থিতকারী বস্তু তাহা আমি প্রথমে রায়চাঁদ ভাইয়ের নিকট হইতে বুঝিয়াছিলাম। নিরামিষ সম্বন্ধে ইংরাজী পুস্তক পড়িয়া সেই বিচার আরো দৃঢ় হয়। কিন্তু যতদিন ব্রহ্মচর্য্য ব্রত লই নাই ততদিন পর্য্যন্ত দুধ ছাড়িবই এরকম স্থির করিতে পারি নাই। শরীর-যাত্রা নির্ব্বাহের জন্য দুধের যে আবশ্যক নাই একথা আমি বহুদিন হইতে বুঝিয়া আসিতেছিলাম। কিন্তু চট্ করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া যায় ইহা এমন বস্তু নয়। ইন্দ্রিয়-দমনের জন্য দুধ ছাড়া যে আবশ্যক একথা যখন আমার অনুভূতিতে ধরা পড়িতেছিল, সেই সময়েই গোয়ালারা কি প্রকার প্রাণঘাতী কষ্ট গরু-মহিষকে দেয় সে সম্বন্ধে কিছু সাহিত্য কলিকাতা হইতে আমার নিকট আসে। এই সাহিত্যের প্রভাব চমৎকার হইল। আমি এই বিষয়ে মিঃ কলেনবেকের সহিত আলোচনা করিলাম।

যদিও মিঃ কলেনবেকের পরিচয় আমি সত্যাগ্রহের ইতিহাসে দিয়া রাখিয়াছি, এবং পূর্ব্বের অধ্যায়ে প্রাসঙ্গিক ভাবে তাঁহার নাম উল্লেখ করিয়াছি, তথাপি তাঁহার সম্বন্ধে দুই এক কথা এখানে বলিব। তাঁহার সহিত আমার হঠাৎ পরিচয় হয়। তিনি মিঃ খানের মিত্র ছিলেন।

তাঁহার অন্তরের গভীরতম প্রদেশে যে বৈরাগ্য প্রবৃত্তি রহিয়াছে, মিঃ খানের নিকট তাহা ধরা পড়ে এবং সেইজন্য তিনি আমার সহিত কলেনবেকের পরিচয় করাইয়া দেন। যখন পরিচয় হইল, তখন তাঁহার সখ ও খরচের বহর দেখিয়া আমি ভড়কাইয়া গেলাম। কিন্তু প্রথম পরিচয়েই তিনি আমাকে ধর্ম্মবিষয়ে প্রশ্ন করিলেন। তাহা হইতে ভগবান্ বুদ্ধের ত্যাগের কথা সহজেই উঠিল। এই কথার পর আমাদের ত্যাগ বিষয়ে কথা বাড়িয়াই চলিল। এই আলোচনার ফলে তিনি স্থির করিলেন যে, আমি যেরকম চলিতেছিলাম তিনিও সেই রকম ভাবেই চলিবেন। তিনি একা লোক ছিলেন। কেবল নিজের জন্য বাড়ীভাড়া ছাড়া প্রতি মাসে তাঁহার প্রায় ১২০০৲ টাকার উপর খরচ হইত। এই অবস্থা হইতে ক্রমে তিনি এমন সাদাসিধা চালে আসিয়াছিলেন যে, তাঁহার মাসিক খরচ ১২০৲ টাকায় আসিয়া পঁহুছিয়াছিল। ঘর সংসার ভাঙ্গিয়া দেওয়ার পর এবং প্রথমবার জেল হইতে ফিরিয়া, আমি তাঁহার সঙ্গেই থাকিতে আরম্ভ করি। সে সময় আমাদের উভয়ের জীবনযাত্রার পদ্ধতি বেশ কঠোর রকমের ছিল।

আমাদের এই একত্র বাসকালে দুধের বিষয় উক্তরূপ চর্চ্চা হইত। মিঃ কলেনবেক প্রস্তাব করিলেন—"দুধের সম্বন্ধে ত আমরা অনেকবার কথাবার্ত্তা বলিয়াছি, তবে আমরা দুধ ছাড়িয়া দিই না কেন? ইহার আবশ্যক ত নাই।" আমি এই অভিপ্রায়ে আনন্দ-মিশ্রিত আশ্চর্য্য বোধ করিলাম। প্রস্তাবটি আমার কাছে খুব ভাল লাগিল এবং আমি উহা অনুমোদন করিলাম। এ ঘটনা টলষ্টয় ফার্ম্মে ১৯১২ সালে ঘটিয়াছিল।

এইটুকু ত্যাগেই শান্তি হইল না। দুধ ত্যাগ করার সঙ্কল্পের অল্পকাল পরেই কেবল ফলাহার করার সঙ্কল্প করিলাম। আমাদের এই

ফলাহার মানে, যে সকল ফল খুবই সস্তা তাহারই উপরে নির্ভর করা। দীন-দরিদ্র যেভাবে জীবন-যাপন করে, আমরা সেইরূপ গরীবের জীবন যাপন করা স্থির করিলাম। ফলাহারে আমরা খুব সুবিধাই পাইয়াছিলাম। ফলাহারে বড় একটা উনুন জ্বালাইবার দরকার হয় না। কাঁচা মুগফলী, কলা, খেজুর ও জলপাইয়ের তেল—ইহাই আমাদের সাধারণ খাদ্য হইয়া পড়িল।

ব্রহ্মচর্য্য-পালনেচ্ছুদিগের প্রতি এই স্থানে এক সাবধানবাণী দেওয়ার আবশ্যকতা আছে। যদিও আমি ব্রহ্মচর্য্যের সহিত আহার ও উপবাসের নিকট-সম্বন্ধ দেখাইয়াছি, তবুও এটা নিশ্চিত যে, মনের উপরই হইতেছে ব্রহ্মচর্য্যের মুখ্য আশ্রয়। ময়লা মন উপবাস দ্বারা শুদ্ধ হয় না। খাদ্যের সরলতা মনের উপর প্রভাব বিস্তার করিতে পারে না। মনের ময়লা বিচার দ্বারা, ঈশ্বর-ধ্যান দ্বারা এবং ঈশ্বর-প্রসাদ দ্বারাই দূর হয়। কিন্তু মন আবার শরীরের সহিত নিকট সম্বন্ধ-যুক্ত, বিকার-গ্রস্ত মন বিকার-দানকারী খাদ্যই খুঁজিয়া বেড়ায়। বিকারগ্রস্ত মন অনেক প্রকার স্বাদের ভোগ করিতে চায়। তারপর সেই আহার ও ভোগের প্রভাব মনের উপর হয়। সেই হেতু এবং সেই পরিমাণে খাদ্যাদির উপর সংযম রাখার ও নিরাহারের আবশ্যকতা অবশ্যই আছে। বিকারগ্রস্ত মন শরীরের উপর, ইন্দ্রিয়সমূহের উপর কর্ত্তৃত্ব করিতে পারে না, তাহার পরিবর্ত্তে শরীর ও ইন্দ্রিয়সমূহেরই বশবর্ত্তী হয়। সেই হেতু শরীরের পক্ষে শুদ্ধ ও সর্ব্বাপেক্ষা কম বিকারী আহার্য্যের প্রয়োজন আছে এবং প্রসঙ্গতঃ নিরাহারের ও উপবাসাদিরও আবশ্যকতা আছে। যদি বলা যায় যে, সংযমীর পক্ষে আহার্য্যের মর্য্যাদা ও উপবাসাদির আবশ্যকতা নাই, তাহা হইলে যেমন ভুল করা হইবে, তেমনি আবার আহারের বিচার

এবং উপবাসই সর্ব্বস্ব মানিলেও সমান ভুল হইবে। আমার অভিজ্ঞতা আমাকে ইহাই শিখাইয়াছে যে, যখন মন সংযমের দিকে ঝুঁকিয়া পড়ে, তখন আহারের সংযম ও উপবাস খুব সাহায্য করে। উহাদের সাহায্য ব্যতীত মনের নির্ব্বিকারত্ব লাভ অসম্ভব।

৩১

উপবাস

দুধ ও শস্য আহার ত্যাগ করিয়া ফলাহারের পরীক্ষা আরম্ভ করিলাম। সেই অবকাশে সংযমের জন্য উপবাসও আরম্ভ করিলাম। মিঃ কলেনবেক্‌ও যোগ দিলেন। পূর্ব্বে যে উপবাস করিতাম তাহা কেবল স্বাস্থ্যের দিক্‌ দিয়া উপকারের জন্য। দেহ-প্রবৃত্তিকে দমন করার জন্যও যে উপবাস করার আবশ্যকতা আছে, তাহা একজন বন্ধুর প্রেরণায় বুঝিলাম। বৈষ্ণব পরিবারে জন্ম বলিয়া এবং মাতা কঠিন ব্রতপালনকারিণী ছিলেন বলিয়া, একাদশী ইত্যাদি ব্রত দেশে থাকিতে পালন করিতাম। তবে সে কেবল দেখাদেখি অথবা পিতামাতাকে সুখী করার জন্যই করিতাম। ঐসকল ব্রত হইতে কিছু লাভ হয় কিনা বুঝিতাম না, লাভ হয় না—ইহাই মানিতাম। সেই মিত্রটি ঐ সকল উপবাস পালন করেন বলিয়া এবং আমার ব্রহ্মচর্য্যব্রতে সাহায্য পাওয়ার জন্য, আমি তাঁহার অনুকরণ আরম্ভ করিলাম এবং একাদশীর দিনে উপবাস করিব স্থির করিলাম। সাধারণতঃ লোকে একাদশীর দিনে দুধ ও ফল খাইয়া একাদশী করিয়া থাকে। ফলাহারের যে উপবাস তাহা ত আমি প্রতিদিনই পালন করিতেছিলাম। সেইজন্য আমি কেবল জল ছাড়া আর কিছুই না খাইয়া উপবাস আরম্ভ করিলাম।

উপবাসের প্রয়োগের আরম্ভের সময়টা শ্রাবণ মাস ছিল। সেই বৎসর রমজান ও শ্রাবণ মাস এক সাথে পড়িয়াছিল। গান্ধী পরিবারে

বৈষ্ণব ব্রতের সহিত শৈব ব্রতেরও অনুষ্ঠান হইত। আত্মীয়েরা যেমন বৈষ্ণব দেবালয়ে যাইতেন, তেমনি শৈব দেবালয়েও যাইতেন।

শ্রাবণ মাসে পরিবারের কেহ কেহ প্রতিবৎসরই 'প্রদোষ'* পালন করিতেন। আমিও এই শ্রাবণ মাস পালন করা স্থির করিলাম।

এই সব গুরুতর প্রয়োগ টলষ্টয়-ফার্ম্মে আরম্ভ হইয়াছিল। সেই স্থানে সত্যাগ্রহী কয়েদীদের পরিবারের দেখাশোনার জন্য কলেনবেক ও আমি থাকিতাম। উহাদের মধ্যে বালক ও যুবক ছিল। তাহাদের জন্য একটা স্কুল ছিল। এই যুবকদিগের মধ্যে ৪।৫ জন মুসলমান ছিল। তাহাদিগকে ইস্‌লামের নিয়ম পালন করিতে আমি সাহায্য করিতাম ও উৎসাহ দিতাম। নামাজ ইত্যাদির সুবিধা করিয়া দিয়াছিলাম। আশ্রমে পার্শী এবং খৃষ্টানও ছিল। ইহাদের সকলকেই নিজ নিজ ধর্ম্মানুযায়ী চলিতে উৎসাহিত করাই নিয়ম ছিল। এইজন্য মুসলমান যুবকদিগকে আমি রোজা রাখিতে উৎসাহ দিলাম। আমার ত প্রদোষই পালন করিতে হইত। আমি হিন্দু, পার্শী ও খৃষ্টানদিগকেও মুসলমানদের সহিত যোগ দিতে বলি। সংযমের কাজে সকলেরই যোগ দেওয়া প্রশংসনীয়—এইরূপ আমি সকলকে বুঝাইয়া দিয়াছিলাম। সকল আশ্রম-বাসীই আমার প্রস্তাব আনন্দের সহিত গ্রহণ করিল। হিন্দু ও পার্শী যুবকগণ মুসলমানদের সম্পূর্ণ অনুকরণ করিত না, করার আবশ্যকতাও ছিল না। মুসলমানেরা সূর্য্যাস্ত পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিত ও সেইজন্য আর সকলে তাহার পূর্ব্বেই খাইয়া লইত, যাহাতে মুসলমানদিগকে তাহারা পরিবেশন করিতে ও তাহাদের জন্য ভাল খাবার তৈরী করিয়া দিতে পারে। মুসলমানেরা সূর্য্যোদয়ের পূর্ব্বে খাইতেন। অন্য সম্প্রদায়-

* সন্ধ্যা পর্য্যন্ত উপবাসে থাকা।

ভুক্তদের এই ভোজনে যোগ দিতে হইত না। আবার মুসলমানেরা দিনে জলও খাইতেন না, কিন্তু আর সকলের ইচ্ছামত জল খাওয়ায় বাঁধা ছিল না।

এই প্রয়োগের একটা ফল এই হইল যে, উপবাস ও একাহারের মহত্ত্ব সকলেই বুঝিতে লাগিলেন। একের প্রতি অন্যের উদারতা ও প্রেমভাবও বাড়িল। আশ্রমে নিরামিষাহারের নিয়ম ছিল। এই নিয়ম আমার মনের দিকে চাহিয়া সকলে স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন, ইহা এখানে ধন্যবাদের সহিত স্বীকার করিব। রোজার সময় মুসলমানের পক্ষে মাংসাহার ত্যাগ ভাল না লাগারই কথা—কিন্তু নবযুবকদিগের মধ্যে কেহ আমার কাছে সে বিষয়ে কখনও কোন অভিযোগ করে নাই। তাহারা আনন্দের সহিত ও স্বাদপূর্ব্বক নিরামিষাহার করিত। হিন্দু বালকেরা, আশ্রমের পক্ষে অশোভন না হয়, তাহাদের জন্য এই রকম সুস্বাদ রান্না করিয়া দিত।

আমার উপবাস বর্ণনা করিতে গিয়া এই অবান্তর বিষয় আমি ইচ্ছা-পূর্ব্বকই আনিয়াছি। কেননা, এই মধুর প্রসঙ্গ আমি অন্য স্থানে বর্ণনা করিতে পারিব না। তাহা ছাড়া এই বিষয়ান্তরের ভিতর দিয়া আমার এক অভ্যাসের বর্ণনাও আমি করিয়া ফেলিয়াছি। যখন কোনও ভাল কাজ আমি করিতেছি বলিয়া আমার মনে হয়, তখন আমার সাথে যাহারা থাকে তাহাদিগকেও উহার সহিত যুক্ত করিতে প্রযত্ন করি। এই উপবাস ও একাহারের প্রয়োগ উহাদের পক্ষে নূতন। তবু প্রদোষ ও রমজানের উপলক্ষে আমি উহাদিগকে সেদিকে টানিয়াছিলাম।

এই ভাবে আশ্রমে সংযমের আবেষ্টন সহজেই বাড়িল। অন্য উপবাস ও একাহারে আশ্রমের বাসিন্দারা একত্র মিশিতে লাগিল। ইহাতে

পরিণাম শুভ হইয়াছিল বলিয়াই আমি মনে করি। সংযমের প্রভাব সকলের হৃদয়ের উপর কতটা হইয়াছিল, অন্য সকল বিষয়ের সংযমের পক্ষে উপবাসাদি কতটা অংশ লইয়াছিল, তাহা নিশ্চয় করিয়া আমি বলিতে পারি না। কিন্তু আমার উপর স্বাস্থ্যের দিক্ দিয়া এবং মানসিক দিক্ দিয়া ইহার প্রভাব খুব ভাল হইয়াছিল—ইহাই আমার অভিজ্ঞতা। তাহা হইলেও উপবাসাদির এই প্রভাব সকলের উপরেই হইবে, এমন একটা অনিবার্য্য নিয়ম যে নাই তাহা আমি জানি। ইন্দ্রিয়সংযমের ইচ্ছায় উপবাস করিলে, তবেই ভোগের বিষয় ত্যাগ করার পক্ষে সেই উপবাসের প্রভাব হয়। কোনও কোনও মিত্রের অভিজ্ঞতায় আবার ইহাও ধরা পড়িয়াছে যে, উপবাসের অন্তে ভোগের ইচ্ছা ও স্বাদের ইচ্ছা তীব্রতর হয়। সেই জন্য উপবাস-কালে ভোগের ইচ্ছা দমন করার ও স্বাদ জয় করার ভাবনা সর্ব্বদা থাকিলে তবে শুভফল আসিয়া থাকে। যাহার কোনও হেতু নাই, যাহাতে মন নাই, এমন শারীরিক উপবাসের ফলে বিষয়-বাসনা আটকাইবে এরূপ মনে করা একেবারে ভুল। গীতার দ্বিতীয় অধ্যায়ের শ্লোক এই জায়গায় খুব বিচার করিবার বিষয়—

বিষয়া বিনিবর্ত্তন্তে নিরাহারস্য দেহিনঃ।
রসবর্জ্জং রসোঽপ্যস্য পরং দৃষ্ট্বা নিবর্ত্ততে॥

উপবাসীর (উপবাস কালে) বিষয় সকল শান্ত হয়। তাহার রস যায় না। রস ত ঈশ্বর-দর্শন হইতে, ঈশ্বর-প্রসাদ হইতেই শান্ত হয়।

এই হেতু উপবাসাদি সংযম-মার্গের এক সাধন রূপে আবশ্যক। কিন্তু উহাই সবটা নয়। যেখানে শরীরের উপবাসের সাথে মনের উপবাস হয় না, সেখানে দম্ভেই উপবাসের পরিণতি হয় এবং উহা ক্ষতিকারক হয়।

৩২

মাষ্টার মহাশয়

"সত্যাগ্রহের ইতিহাসে" যাহা দেওয়া যায় না, অথবা অল্পমাত্র উল্লেখ করা যায়, সেই ধরণের বিষয় এই অধ্যায়ে লেখা হইতেছে। এই কথাটি যদি পাঠকেরা স্মরণ রাখেন, তবেই এই অধ্যায়ের সহিত পূর্ব্বাপর অধ্যায়গুলির সম্বন্ধ বুঝিতে পারিবেন।

টলষ্টয়-ফার্ম্মে বালক-বালিকাদিগের জন্য শিক্ষার ব্যবস্থার আবশ্যক ছিল। আমার সহিত হিন্দু, মুসলমান, পার্শী ও খৃষ্টান বালক ছিল; আর কিছু হিন্দু বালিকাও ছিল। বিশেষ কাজে কোনও শিক্ষক রাখিতে অপারগ ছিলাম এবং রাখা আমি অনাবশ্যকও মনে করিতাম। অপারগ এই জন্য যে, যোগ্য হিন্দুস্থানী শিক্ষক দুষ্প্রাপ্য ছিল, আর যদি পাওয়াও যায়, তবে মোটা বেতন না হইলে জোহানেস্‌বর্গ সহর হইতে ২১ মাইল দূরে কে আসে? আমাদের কাছে টাকারও সচ্ছলতা ছিল না। বাহির হইতে শিক্ষক আনা অনাবশ্যক মনে করিতাম, যেহেতু, প্রচলিত শিক্ষা-পদ্ধতির উপর আমার আস্থা ছিল না। সত্যিকার শিক্ষাপদ্ধতি কি, সে বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা ছিল না বলিয়া অভিজ্ঞতা অর্জ্জন করার ইচ্ছা ছিল। এইটুকু বুঝিয়াছিলাম যে, আদর্শ স্থিতিতে, সত্যকার শিক্ষা পিতামাতার নিকট হইতেই হয় এবং বাহিরের সাহায্য খুব কম লওয়াই সঙ্গত। টলষ্টয় আশ্রম একটা পরিবার, আর সেখানে পিতারূপে আমি আছি, সেই জন্য এই যুবকদিগের শিক্ষার দায়িত্ব আমারই হাতে যথাশক্তি লওয়া উচিত বলিয়া মনে করিলাম।

এই কল্পনায় অনেক দোষ অবশ্যই ছিল। ছেলেরা আমার কাছে জন্মাবধি ছিল না। অনেক ভিন্ন ভিন্ন আবেষ্টনের মধ্যে লালিত হইয়াছে। সকলের ধর্ম্মও এক ছিল না। এই অবস্থায় আমি বালক-বালিকাদের পিতা হইলে কেমন করিয়া তাহাদের প্রতি ন্যায় ব্যবহার করা হইবে?

কিন্তু আমি হৃদয়ের বিকাশকে ও চরিত্র-গঠনকে বরাবরই প্রধান স্থান দিয়া আসিয়াছি। বয়স যতই ভিন্ন হোক্ না কেন, যে প্রকার আবেষ্টনের মধ্যেই বড় হোক্ না কেন, বালক-বালিকাদিগকে ঐ শিক্ষা দেওয়া যায়—এইরূপ বিচার করিয়া বালক-বালিকাদের সহিত দিনরাত্র পিতারূপে থাকা স্থির করিলাম। চরিত্র-গঠন অন্য সকল শিক্ষার ভিত্তি বলিয়া আমি মানিতাম। সেই ভিত্তি যদি পাকা হয়, তবে বালকেরা অন্য সকল শিক্ষাই, অবকাশমত সাহায্য লইয়া, নিজেরাই গ্রহণ করিতে পারিবে।

তবুও অক্ষরজ্ঞান যে এক-আধটুকু দেওয়া চাই—ইহা আমি বুঝিতাম। সেই জন্য আমি ক্লাশ করিলাম ও তাহাতে মিঃ কলেনবেক্ ও প্রাগজী দেশাইয়ের সাহায্য লইলাম।

শারীরিক শিক্ষার আবশ্যকতা আমি বুঝিতাম। সে শিক্ষা তাহারা স্বভাবতঃই কার্য্যের ভিতর দিয়া পাইত। আশ্রমে চাকর ছিল না। পায়খানা সাফ্ হইতে আরম্ভ করিয়া রান্না করা পর্য্যন্ত সকল কার্য্য আশ্রমবাসীদেরই করিতে হইত। গাছপালা অনেক ছিল, তাহাদের যত্ন লইতে হইত। মিঃ কলেনবেকের কৃষির সখ ছিল। নিজে সরকারী আদর্শ কৃষিক্ষেত্রে কিছুদিন শিক্ষা লইয়া আসিয়াছিলেন। রোজ নির্দ্দিষ্ট সময়ে ছোট বড় সকলকেই, যাহারা রান্নাঘরের কাজে

আছে তাহারা বাদ, বাগিচার কাজ করিতে হইত। ইহাতে বালকেরাই বেশী কাজ করিত। বড় গর্ত্ত খোঁড়া, গাছ কাটা, বোঝা উঠানো ইত্যাদি কাজে তাহাদের শরীরের অনুশীলন ভাল ভাবেই হইত। উহাতে তাহারা আনন্দ পাইত এবং তাহাদের অন্য ব্যায়ামের বা খেলার আবশ্যক হইত না। কাজ করিতে কেহ কেহ, অথবা কখন কখন সকলেই দুষ্টামি করিত, আলস্য করিত। অনেক সময় উহাতে আমি চোখ বুঁজিয়া থাকিতাম, আবার কখনও বা কঠিন হইয়া তাহাদের নিকট হইতে কাজ আদায় করিতাম। যাহাদের উপর কঠিন হইতাম, তাহারা তাহা পছন্দ করিত না, ইহাও আমি লক্ষ্য করিতাম। কিন্তু কেহ ঐ কাঠিন্যের বিরোধিতা করিয়াছে—এমন স্মরণ হয় না। যখনই আমি কঠিন হইতাম, তখনই আমি তাহাদিগকে তাহার কারণ বুঝাইয়া দিতাম এবং তাহাদিগকে দিয়া স্বীকার করাইয়া লইতাম যে, কাজের সময় খেলা করার অভ্যাস ভাল নয়। তাহারাও তখনকার মত তাহা বুঝিত, কিন্তু পরক্ষণেই ভুলিয়া যাইত—এমনি ভাবে চলিতেছিল। কিন্তু সে যাহাই হোক্ তাহাদের শরীর গড়িয়া উঠিয়াছিল।

আশ্রমে ব্যারাম পীড়া কদাচিৎ হইত। জলবায়ু ছাড়া নিয়মিত আহার যে তাহার বড় একটা কারণ ছিল তাহা বলা যায়। জীবিকার্জ্জনকেও আমি শারীরিক শিক্ষারই একটা বলিয়া গণ্য করি। সকলকেই কোন না কোনও উপযোগী কাজ শিখাইবার চেষ্টা হইত। সেই জন্য মিঃ কলেনবেক্ এক মঠে গিয়া চটী জুতা তৈরী শিখিয়া আসিলেন। তাঁহার নিকট হইতে আমি শিখিয়াছিলাম, আর আমি যে ছেলেরা এই কাজ শিখিতে চাহিয়াছিল, তাহাদিগকে শিখাইয়াছিলাম। মিঃ কলেনবেকের ছুতারের কাজের কিছু অভিজ্ঞতা ছিল

এবং আশ্রমে ছুতারের কাজ জানে এমন একজন সাথীও ছিল। সেইজন্য ছুতারের কাজও কিছু কিছু শিক্ষা দেওয়া হইত। রান্নার কাজ ত প্রায় সকলেই শিখিয়াছিল।

এ সকল কাজই বালকদিগের পক্ষে নূতন। বস্তুতঃ তাহাদের এসকল কাজ স্বপ্নেরও অগোচর ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকাতে ভারতীয় ছেলেরা যে শিক্ষা পাইত তাহা প্রাথমিক অক্ষর-জ্ঞান মাত্র। টলষ্টয় ফার্মে প্রথম হইতেই এই দস্তুর ছিল যে, যে-কাজ কোনও শিক্ষক করিবেন না, সে কাজ বালকদিগকে দিয়াও করানো হইবে না, ও তাহাদের সাথে সাথে কাজ করার জন্য একজন শিক্ষক থাকাই চাই। এই জন্য ছেলেরা আনন্দ করিয়া শিখিত।

চরিত্র ও অক্ষরজ্ঞান সম্বন্ধে পরে বলিতেছি।

৩৩

অক্ষর শিক্ষা

পূর্ব্বের অধ্যায়ে শারীরিক শিক্ষা এবং তাহার সহিত কিছু হাতের কাজ শিখানোর ব্যবস্থা টলষ্টয়-ফার্ম্মে কেমন ভাবে আরম্ভ করিয়াছিলাম তাহার কতকটা আভাস দিয়াছি। যদিও যেমনটি হইলে আমার তৃপ্তি হইত ঠিক সেভাবে এই কাজ করিতে পারিতাম না, তবুও তাহাতে মোটামুটি সফলতা পাইয়াছিলাম। কিন্তু অক্ষর-জ্ঞান দেওয়াই কঠিন ব্যাপার ছিল। আমার কাছে উপযুক্ত ব্যবস্থা ছিল না। আমি যতটা সময় দিতে ইচ্ছা করিতাম ততটা সময়ও দিতে পারিতাম না—শিক্ষা-পদ্ধতি-সম্বন্ধে জ্ঞানও ততটা ছিল না। সারাদিন শারীরিক কাজ করিয়া আমি ক্লান্ত হইয়া পড়িতাম, আর যে সময় একটু আরাম লওয়ার ইচ্ছা হয়, সেই সময়ই ক্লাস লইতে হইত। সেইজন্য আমাকে জোর করিয়া জাগিয়া থাকিতে হইত। সকালবেলা ক্ষেতের কাজে ও ঘরের কাজে যাইত বলিয়া দুপুরের খাওয়ার পরই স্কুলের ক্লাস চলিত। ইহা ছাড়া আর কোনও অনুকূল সময় খুঁজিয়া পাওয়া যায় নাই।

অক্ষর-জ্ঞানের জন্য খুব বেশী হইলেও তিনঘণ্টার বেশী সময় দেওয়া হইত না। ক্লাসে হিন্দী, তামিল, গুজরাটী ও উর্দ্দু শিখাইতে হইত। প্রত্যেক বালককেই তাহার মাতৃভাষার সাহায্যে শিক্ষা দেওয়ার আগ্রহ ছিল। ইংরাজী সকলকেই শিক্ষা দেওয়া হইত। ইহার উপর গুজরাটী, হিন্দুবালকদিগকে কিছু 'সংস্কৃত' এবং সকলকেই কিছু হিন্দী পড়ানো হইত। ক্লাসে সকলের জন্যই ইতিহাস, ভূগোল ও অঙ্ক-সম্বন্ধে প্রাথমিক শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা ছিল। তামিল ও উর্দ্দু আমি পড়াইতাম।

অক্ষর শিক্ষা

আমি যেটুকু তামিল জানিতাম, তাহা ষ্টীমারে ও জেলে শিখিয়াছিলাম। পোপের "তামিল স্বয়ং-শিক্ষক" বইখানা ছাড়া আর কোনও বই হইতে তামিল শিখিবার সুযোগ আমার হয় নাই। উর্দ্দু লিপির জ্ঞান যাহা ষ্টীমারে পাইয়াছিলাম, সেইটুকুই। আর খাস ফরাসী আরবী শব্দের জ্ঞান, যতটুকু মুসলমান মিত্রদের সহিত পরিচয় হইতে পাইয়াছিলাম কেবল ততটুকু। সংস্কৃত-জ্ঞান হাই-স্কুল পর্য্যন্ত, গুজরাটীও স্কুলের বিদ্যা পর্য্যন্ত।

এই পুঁজি লইয়া আমাকে কাজ চালাইতে হইত। সাহায্য যাহারা করিতেন তাঁহারা আমার চাইতেও কম জানিতেন। দেশের ভাষার প্রতি আমার প্রেম, আমার শিক্ষা-পদ্ধতির উপর আমার শ্রদ্ধা, বিদ্যার্থীদের অজ্ঞতা, এবং তাহা হইতেও অধিক তাহাদের উদারতা আমাকে আমার কার্য্যে সাহায্য করিত।

তামিল বিদ্যার্থীরা দক্ষিণ আফ্রিকাতেই জন্মিয়াছিল। সেইজন্য তামিল খুবই কম জনিত। তাহারা লিখিতে মোটেই জানিত না। এইজন্য তাহাদিগকে লিখিতে ও ব্যাকরণের মূল-তত্ত্ব শিখাইতে হইত। উহা সহজ ছিল। বিদ্যার্থীরা জানিত যে, তামিল কথাবার্ত্তায় তাহারা আমাকে সহজেই হারাইয়া দিবে। তামিলভাষী লোক যখন আমার সহিত দেখা করিত, তখন বিদ্যার্থীরাই আমার দোভাষীর কাজ করিত। আমার ইহাতেই বেশ চলিয়া যাইত, কেননা আমি বিদ্যার্থীর নিকট হইতে আমার অজ্ঞতা ঢাকার চেষ্টা কখনও করি নাই। সকল বিষয়েই আমি যেমন ছিলাম, তাহারা তেমনি আমাকে জানিত। এইজন্য ভাষা জ্ঞানের প্রচুর দীনতা সত্ত্বেও, আমি তাহাদের প্রেম ও আদর কখনো হারাই নাই।

মুসলমান বালকদিগকে উর্দু শিখাইবার কাজ খুব সহজ ছিল। তাঁহারা অক্ষর চিনিত। পড়ার জন্য তাহাদের আকাঙ্ক্ষা বাড়ানো ও তাহাদের অক্ষর শুদ্ধ করা আমার কাজ ছিল।

ছেলেরা বেশীর ভাগই নিরক্ষর ছিল ও পূর্ব্বে স্কুলে যায় নাই। শিখাইতে শিখাইতে আমি দেখিলাম তাহাদিগকে শিক্ষা দেওয়ার জন্য আমার কাজ খুব কমই আছে; তাহাদের আলস্য দূর করা, নিজেদের মধ্যে তাহাদের পড়াশুনার ব্যবস্থা করা, তাহাদের পাঠাভ্যাস পরীক্ষা করা—ইহাই যথেষ্ট। এই কাজেই আমি সন্তুষ্ট ছিলাম বলিয়া বিভিন্ন বয়সের, বিভিন্ন বিষয়ের বিদ্যার্থীদিগকে এক কামরাতেই বসাইয়া আমি কাজ চালাইয়া লইতে পারিতাম।

পাঠ্য পুস্তকের হুজুগের কথা যদিও যথেষ্ট শোনা যায়, তবু সে বিষয়ে আমার বিশেষ কোনও গরজ ছিল না। যে সকল বহি ছিল তাহাই যে খুব ব্যবহার হইয়াছে এমনও আমার মনে হয় না। প্রত্যেক ছেলেকে অনেকগুলি করিয়া পুস্তক দেওয়া আমি আবশ্যক মনে করি নাই। শিক্ষক নিজেই বিদ্যার্থীর পাঠ্যপুস্তক—এইরূপ আমার মনে হইত। শিক্ষকদেরও পুস্তক হইতে খুব বেশী কিছু শিখিবার আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। আমার শিক্ষকেরা পুস্তক হইতে আমাকে যাহা শিখাইয়াছিলেন, তাহার সামান্যই আমার মনে আছে। কিন্তু বই ছাড়া যাহা শিখাইয়াছেন তাহার এতটুকুও ভুলিয়া যাই নাই। বালকেরা কানে শোনা অপেক্ষা দেখিয়া সহজে শিখে। উহাতে অল্প পরিশ্রম হয় এবং অনেক বেশী জিনিষ শিখিতে পারে। বালকদের আমি একখানা বইও পুরাপুরি পড়াইয়াছি বলিয়া মনে হয় না। নানা গ্রন্থ হইতে আমি যাহা পড়িতাম প্রথমে তাহাই নিজে আয়ত্ত করিয়া পরে নিজের ভাষায়

বালকদিগকে বলিতাম। আমার মনে হয় উহা আজও তাহাদের স্মরণ আছে। পড়িয়া মনে রাখিতে তাহাদের ক্লেশ হইত। আমি যাহা শুনাইতাম, তাহা মুখে মুখে তখনি বলিয়া আমাকে শুনাইতে পারিত। পড়া তাহাদের পক্ষে আয়াসসাধ্য ব্যাপার ছিল। শুনাইবার সময় যদি শ্রান্তিবশতঃ বা অন্য কারণে আমার কথা নীরস না হইত, তবে তাহারাও আগ্রহ-সহকারে শুনিত। তাহাদের যে প্রশ্ন হইত তাহারই উত্তর দিতে গিয়া, তাহাদের গ্রহণ-শক্তির পরিমাপ আমি পাইতাম।

৩৪
আত্মিক শিক্ষা

বিদ্যার্থীদিগকে শরীর ও মনের শিক্ষা অপেক্ষা আত্মার শিক্ষা দেওয়ার সময়ই আমার অধিক পরিশ্রম করিতে হইয়াছে। আত্মার বিকাশের জন্য আমি ধর্ম্মপুস্তকের উপর নির্ভর করিতাম না। প্রত্যেক বিদ্যার্থীর নিজ নিজ ধর্ম্মের মূলতত্ত্ব জানা উচিত এবং নিজ নিজ ধর্ম্ম-গ্রন্থের সাধারণ জ্ঞান থাকা উচিত—এইরূপ আমি মনে করিয়াছি এবং সেই রকম জ্ঞান দেওয়ার জন্য যথাশক্তি চেষ্টা করিয়াছি। কিন্তু উহাও আমি বুদ্ধির বিকাশের অঙ্গ বলিয়াই গণ্য করি। টলষ্টয়-আশ্রমের বালকদিগকে শিক্ষা দেওয়া আরম্ভ করার পূর্ব্ব হইতেই আমি আধ্যাত্মিক শিক্ষা একটা আলাদা জিনিষ বলিয়া বুঝিতে পারিয়াছিলাম। আত্মার বিকাশ করা মানেই চরিত্র গঠন করা, ঈশ্বরের জ্ঞান লাভ করা, আত্মজ্ঞান লাভ করা। এই জ্ঞান পাইতে বালকদিগকে ভালরকম সাহায্য করা দরকার। এই জ্ঞান না থাকিলে অন্য সকল জ্ঞান ব্যর্থ ও ক্ষতিকারক হয়—ইহাই আমি বিশ্বাস করি।

চতুর্থ আশ্রমে (অর্থাৎ বৃদ্ধবয়সে সন্ন্যাস লইয়া) আত্মজ্ঞান পাওয়া যায়—এই প্রকার ভুল উক্তি আমার শোনা আছে। কিন্তু যাহারা চতুর্থ আশ্রমের জন্য এই অমূল্য বস্তু লাভ করা মুলতুবী রাখিয়া দেয়, তাহারা কখনই আত্মজ্ঞান পায় না, এবং তাহারা বৃদ্ধ হইয়া অর্থাৎ কৃপা করার যোগ্য দ্বিতীয় বাল্যকাল পাইয়া পৃথিবীর

ভার হইয়া জীবন কাটায়, এই রকম সর্ব্বত্র দেখিতে পাওয়া যায়। যদিও এই সিদ্ধান্ত এই ভাষায় ১৯১১-১২ সালে আমি কখনো ব্যক্ত করিতে পারিতাম না, তথাপি আমার খুব স্মরণ আছে যে, আমার এখন যাহা সিদ্ধান্ত তখনও সেই ধারণাই ছিল।

আত্মিক শিক্ষা কেমন করিয়া দেওয়া যায়? বালকদিগকে দিয়া ভজন গাওয়াইতাম, তাহাদিগকে নীতি বিষয়ক পুস্তক পড়িয়া শুনাইতাম, কিন্তু তাহাতে সন্তোষ পাইতাম না। যতই তাহাদের সঙ্গে মিশিতে লাগিলাম, ততই বুঝিতে লাগিলাম যে, এই জ্ঞান পুস্তকের ভিতর দিয়া দেওয়ার জিনিষ নয়। শরীরের শিক্ষা শারীরিক ব্যায়ামচর্চ্চা দ্বারা দেওয়া যায়, বুদ্ধির শিক্ষা বুদ্ধিচর্চ্চা দ্বারা দেওয়া যায়, তেমনি আত্মার শিক্ষা আত্মার চর্চ্চা দ্বারাই দেওয়া যায়—আত্মার চর্চ্চা শিক্ষকের ব্যবহার হইতেই লাভ করিতে পারা যায়। এইজন্য যুবকেরা শিক্ষকের সম্মুখে উপস্থিত থাকুক আর নাই থাকুক, শিক্ষকের সাবধান হইয়া থাকা দরকার। লঙ্কায় বসিয়া থাকিয়াও শিক্ষক নিজের আচরণ দ্বারা নিজের শিষ্যদিগের আত্মাকে প্রভাবিত করিতে পারে। আমি যদি মিথ্যা বলি ও আমার শিষ্যদিগকে সত্য কথা বলাইতে প্রযত্ন করি তবে সে চেষ্টা ব্যর্থ হইবে। ভীরু শিক্ষক শিষ্যদিগকে বীরত্ব শিক্ষা দিতে পারে না। ব্যভিচারী শিক্ষক শিষ্যদিগকে সংযম কেমন করিয়া শিক্ষা দিবে? আমি দেখিলাম চারিদিকের যুবক-যুবতীদিগের সম্মুখে আমারই আদর্শ হইয়া থাকা আবশ্যক। এমনি করিয়া আমার শিষ্যেরা আমার শিক্ষক হইল। আমার জন্য না হোক্, তাহাদের জন্যও আমার সমস্ত আচরণ শুদ্ধ হওয়া চাই—এই প্রকার আমি বুঝিলাম। টলষ্টয়-আশ্রমে আমার

যে অল্পবিস্তর সংযম-সাধনা হইয়াছিল, তাহার জন্য ঐ যুবক-যুবতীদিগের নিকট আমি কৃতজ্ঞ।

আশ্রমের এক যুবক বড়ই দুর্দ্দান্ত ছিল,—মিথ্যা বলে, কাহাকেও গ্রাহ্য করে না, সকলের সাথে লড়াই করিয়া চলে। একদিন সে বড় বেশী দুর্দ্দান্তপনা করিল। আমি ভয় পাইলাম। বিদ্যার্থীদিগকে কোনও দণ্ড দেওয়া হইত না। কিন্তু এই সময় আমার বড় রাগ হইল। আমি তাহার নিকটে গেলাম। তাহাকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু সে কোন কথাই শুনিল না। দেখিলাম সে আমার সঙ্গেও টক্কর দিতে চায়। আমার কাছে একটা রুল পড়িয়াছিল, তাহা আমি তুলিয়া লইলাম এবং তাহার হাতের উপর এক ঘা বসাইয়া দিলাম। কিন্তু ঘা দিয়াই আমি কাঁপিতে লাগিলাম। সে ইহা দেখিল। এই অভিজ্ঞতা কোনও বিদ্যার্থী আমার নিকট হইতে কখনো পায় নাই। বিদ্যার্থী কাঁদিয়া উঠিল, আমার নিকট মাফ্ চাহিল। আঘাতে সে কাঁদে নাই। সে যদি আমার বিরুদ্ধে দাঁড়াইত, তবে আমাকেই ঘা কয়েক লাগাইয়া দিতে পারিত, তাহার শরীরে এতটা শক্তি ছিল। তাহার বয়স সতের বৎসর ছিল, গঠন মজবুত ছিল। রুলের ঘা লাগাইয়া আমার যে দুঃখ হইয়াছিল, তাহা সে দেখিতে পাইয়াছিল। এই ঘটনার পর সে আর কখনো আমার বিরুদ্ধাচরণ করে নাই। কিন্তু তাহাকে সেই রুলের ঘা দেওয়ার জন্য অনুতাপ আজও আমার রহিয়াছে। আমার বোধ হয়, সেদিন আমি তাহার কাছে আমার আত্মার পরিচয় দিই নাই, আমার ভিতরে যে পশু আছে তাহারই পরিচয় দিয়াছি।

বালকদিগকে মারপিট করিয়া শিক্ষা দেওয়ার আমি বরাবরই

বিরোধী। একবারমাত্র আমার ছেলেদের মধ্যে একজনকে আমি মারিয়াছিলাম বলিয়া স্মরণ আছে। রুলের ঘা দিয়া সেদিন আমি ঠিক করিয়াছিলাম কিনা, তাহা আজও নির্ণয় করিতে পারি নাই। ঐ দণ্ডের সঙ্গতি-সম্বন্ধে আমার সন্দেহ আছে। কেননা, তাহাকে যখন মারিয়াছিলাম তখন আমি ক্রোধের বশীভূত হইয়া দণ্ড দিতে চাহিয়াছিলাম। কেবল আমার ভিতরের দুঃখ দেখাইবার জন্যই যদি তাহাকে আঘাত করিতাম, তাহা হইলে ঐ দণ্ড উপযুক্ত গণনা করা যাইত। কিন্তু আমার ভিতরে মিশ্রিত ভাব ছিল। এই ঘটনার পরে আমি বিদ্যার্থীদিগকে পরিবর্ত্তন করার খুব ভাল রীতি শিখিয়াছিলাম। সেই কলাবিদ্যা যদি উপরি-উক্ত ঘটনায় প্রয়োগ করা হইত, তবে কি ফল হইত তাহা এখন বলিতে পারি না। ঐ যুবক এই ঘটনা তখনই ভুলিয়া গিয়াছিল এবং তাহার খুব পরিবর্ত্তন হইয়াছিল, একথা বলা যায় না। এই ব্যাপারের পর বিদ্যার্থীর প্রতি শিক্ষকের ধর্ম্ম সম্বন্ধে ভাল করিয়া বিচার করিতে আরম্ভ করিলাম। পরেও যুবকদের এই রকম দোষ দেখা গিয়াছে, কিন্তু আমি দণ্ডনীতি প্রয়োগ করি নাই। শিষ্যদিগকে আত্মিক জ্ঞান দেওয়ার চেষ্টায় আমি নিজে আত্মার গুণ ভাল রকম বুঝিতে লাগিলাম।

৩৫

ভালমন্দের মিশ্রণ

টলষ্টয়-ফার্ম্মে মিঃ কলেনবেক্ এক প্রশ্ন আমার নিকট তুলিলেন। সে কথা তাহার পূর্ব্বে আমি ভাবি নাই। আশ্রমের কতকগুলি ছোক্‌রা বড় দুর্দ্দান্ত ও খারাপ ছিল। কতকগুলি ছিল যাহারা নিষ্কর্ম্মা, যাহারা রাস্তায় রাস্তায় ঘুরিয়া বেড়ায়, সেই রকমের। তাহাদের সাথেই আমার তিন ছেলেও থাকিত এবং আমার ছেলেদের মতই লালিত হইয়াছে এমন অন্য ছেলেও ছিল। মিঃ কলেনবেকের দৃষ্টি পড়িয়াছিল ঐ ভবঘুরেদের দিকে, আর আমার ছেলেদের দিকে। একদিন তিনি বলিয়া উঠিলেন—"আপনার এই ধরণ আমার মোটেই বরদাস্ত হয় না। এই ছেলেগুলির সঙ্গে আপনার ছেলেরা যদি মিশে, তবে তাহাদের পরিণামও সুনিশ্চিত। এই কুসঙ্গের প্রভাবে তাহারাও বিগড়াইয়া যাইবে।"

সে সময় তাঁহার কথায় আমি চিন্তিত হইয়া পড়িয়াছিলাম কিনা আজ তাহা মনে নাই, তবে আমার জবাব আমার মনে আছে। আমি বলিলাম—"আমার ছেলেদের মধ্যে আর এই ভবঘুরেদের মধ্যে আমি ভেদ কি করিয়া করিব? এপর্য্যন্ত উভয়ের জন্যই আমি সমান দায়ী আছি। এই ছেলেরা আমার নিমন্ত্রণে আসিয়াছে। আজ যদি যাওয়ার খরচা দিয়া ইহাদিগকে বিদায় দিই, তবে এখনি ইহারা জোহানেস্‌বর্গে ফিরিয়া যাইবে এবং সেখানে যেমন পূর্ব্বে ছিল, তেমনি করিয়া চলিতে থাকিবে। আমার এখানে থাকিয়া

আমার উপর উহারা কতকটা কৃপা করিতেছে, উহারা এবং উহাদের অভিভাবকেরা এইরূপই মনে করে। এখানে আসাতে যে উহাদের অসুবিধা হইয়াছে তাহা আপনিও জানেন আমিও জানি। কিন্তু এ বিসয়ে আমার ধর্ম্ম স্পষ্ট। উহাদিগকে এইখানেই আমার রাখিতে হইবে। আমার ছেলেরাও উহাদের সাথে থাকিবে। আমি কি আজ হইতেই আমার ছেলেদিগকে এই ভেদভাব শিক্ষা দিব যে, তাহারা উহাদের কতকগুলির অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ? এইরকম বুদ্ধি তাহাদের মাথায় দেওয়া ও তাহাদিগকে কুপথে চালানো একই কথা। উহাদের সহিত মিশিয়া বড় হইলে ভালমন্দের ভিতর প্রভেদ তাহারা নিজেরাই করিতে পারিবে। আপনি একথা কেন মানিবেন না যে, যদি আমার ছেলেদের মধ্যে সত্যসত্যই কোনও গুণ থাকে, তবে তাহারই প্রভাব তাহাদের সাথীদের উপর পড়িবে? সে যাহাই হোক্, উহাদিগকে এখানে রাখা ছাড়া আর কোনও পথ নাই। তাহাতে যদি কোনও বিপদ্ হয়, তবে তাহার সম্মুখীন হইতেই হইবে।”

মিঃ কলেনবেক মাথা নাড়িলেন।

এই পরীক্ষার পরিণাম খারাপ হইয়াছিল বলা যায় না। আমার ছেলেদের উহাতে কোনও হানি হইয়াছে ইহা আমি বিশ্বাস করি না। লাভ যে হইয়াছে, তাহা আমি দেখিতে পাইতেছি। ছেলেদের ভিতরে শ্রেষ্ঠত্বের অভিমান যদি কিছু ছিল তাহা সর্ব্বথা গেল। তাহারা সকলের সহিত মিশিতে শিখিল। তাহারা অভিজ্ঞ হইল।

এইরকম অভিজ্ঞতার পর আমার ইহা মনে হইয়াছে যে, বাপ-মার নজর যদি বরাবর থাকে, তবে ভাল ছেলে, মন্দ ছেলের সঙ্গ করিলে এবং একত্র শিক্ষা লাভ করিলেও তাহাতে ভাল ছেলেদের

কোন হানি হয় না। নিজের ছেলেকে সিন্দুকে ভরিয়া রাখিলেই শুদ্ধ থাকে, আর বাহিরে ফেলিয়া দিলেই নষ্ট হয়, এমন ত কোনও নিয়ম নাই। হাঁ, একথা সত্য যে, যখন নানা রকমের বালক-বালিকার সহিত ছেলেদের মিশিতে ও লেখাপড়া করিতে হয়, তখনই বাপ-মার পরীক্ষা হয়, তখন তাঁহাদিগকে সাবধান থাকিতে হয়।

৩৬

প্রায়শ্চিত্ত রূপ উপবাস

বালক-বালিকাদিগকে ঠিক মত লালন পালন করা ও শিক্ষা দেওয়া যে কেমন কঠিন ও কত কঠিন তাহার অভিজ্ঞতা প্রতিদিন বাড়িতে লাগিল। শিক্ষক ও অভিভাবক হিসাবে তাহাদের হৃদয়ে প্রবেশ করিতে হইয়াছিল, তাহাদের সুখদুঃখের ভাগ লইতে হইয়াছিল, তাহাদের জীবনের গুহ্য কথা জানিতে হইয়াছিল এবং তাহাদের উচ্ছ্বসিত যৌবন-তরঙ্গকে সৎমার্গে পরিচালিত করিতে হইয়াছিল।

সত্যাগ্রহীরা জেল হইতে ছাড়া পাওয়ার পর টলষ্টয়-ফার্মে অল্প লোকই রহিল। যাহারা ছিল তাহারা প্রধানতঃ ফিনিক্সবাসীই ছিল। সেইজন্য আশ্রম ফিনিক্সে লইয়া গেলাম। ফিনিক্সে আমার দুষ্কর পরীক্ষা হইল। টলষ্টয়-আশ্রম-বাসীরা ফিনিক্সে গেল, আমি জোহানেসবর্গে আসিলাম। জোহানেসবর্গে কিছুদিন থাকিতেই দুইজনের ভয়ঙ্কর পতনের সংবাদ পাওয়া গেল। সত্যাগ্রহের মহৎ যুদ্ধে যদি সাময়িক নিষ্ফলতা দেখা দিত, তাহাতে আমার মনে আঘাত লাগিত না, কিন্তু এই ঘটনা আমাকে বজ্রাঘাত করিল। আমি সেইদিনই ফিনিক্স যাওয়ার গাড়ীতে রওনা হইলাম। মিঃ কলেনবেক আমার সঙ্গে যাওয়ার জন্য আগ্রহ করিতে লাগিলেন। তিনি আমার নিদারুণ অবস্থা বুঝিতে পারিয়াছিলেন। আমাকে কিছুতেই একা যাইতে দিলেন না। পতনের খবর আমি তাঁহার নিকটেই পাইয়াছিলাম।

রাস্তায় যাইতে যাইতে আমার ধর্ম্ম জানিয়া লইলাম অথবা

জানিয়াছি এই রকম মনে করিলাম। আমার বোধ হইল যে, অভিভাবক অথবা শিক্ষকের তত্ত্বাবধানে যাহারা থাকে, তাহাদের পতন হইলে তত্ত্বাবধায়ক অল্পবিস্তর দায়ী। ঐ ঘটনায় আমার দায়িত্ব আমার নিকট স্পষ্ট হইল। আমার পত্নী আমাকে সতর্ক করিয়াছিলেন। কিন্তু আমি স্বভাবতঃই বিশ্বাসপরায়ণ বলিয়া ঐ সাবধানতা গ্রাহ্য করি নাই। আমার বোধ হইল যে, যদি এই পতনের জন্য আমি প্রায়শ্চিত্ত করি, তবে যাহারা পতিত হইয়াছে তাহারা আমার দুঃখ বুঝিতে পারিবে ও তাহা হইতে তাহাদের নিজের দোষের জ্ঞান হইবে ও কতকটা দোষ-স্খালন হইবে। এইজন্য আমি ৭ দিনের উপবাস ও সাড়ে চার মাস একবেলা আহারের ব্রত লইলাম। মিঃ কলেনবেক্, আমাকে নিবৃত্ত করিতে চেষ্টা করিয়াছিলেন, কিন্তু সফল হন নাই। অবশেষে প্রায়শ্চিত্তের যোগ্যতা তিনি স্বীকার করেন এবং তিনিও আমার সহিত ঐ ব্রত পালনের জন্য আগ্রহ করেন। তাঁহার নির্ম্মল প্রেমে আমি বাধা দিতে পারিলাম না। এইপ্রকার স্থির করার পরেই আমি হাল্‌কা বোধ করিলাম, শান্ত হইলাম, দোষীদিগের উপর হইতে ক্রোধ উঠাইয়া লইলাম। তাহাদের উপর কেবল দয়াভাবই রহিল।

এমনি করিয়া ট্রেণ হইতেই মন হাল্কা করিয়া আমি ফিনিক্সে পঁহুছিলাম। অনুসন্ধান করিয়া যাহা জানার ছিল জানিয়া লইলাম। যদিও আমার উপবাসে সকলেরই কষ্ট হইল, তবু সেখানকার বায়ুমণ্ডল শুদ্ধ হইল। পাপ করা কি ভয়ঙ্কর তাহা সকলে জানিতে পারিল। ইহাতে বিদ্যার্থী, বিদ্যার্থিনী এবং আমার মধ্যে যে সম্বন্ধ তাহা খুব নিবিড় ও সরল হইল।

প্রায়শ্চিত্ত রূপ উপবাস

এই উপবাস হইতেই অল্পকাল পরে আমার ১৪ দিন উপবাস করার ব্যাপার ঘটে। তাহার পরিণাম যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা অনেক বেশী ভাল হইয়াছিল।

এই ঘটনা হইতে ইহা সিদ্ধ হয় না যে, শিষ্যের প্রত্যেক দোষের জন্য গুরুর উপবাস করা আবশ্যক। কিন্তু ইহা বিশ্বাস করি যে, কতকগুলি ঘটনায় এরূপ প্রায়শ্চিত্তের জন্য উপবাসের স্থান অবশ্যই আছে। কিন্তু ঐ প্রকার প্রায়শ্চিত্ত করার জন্য ভালমন্দ বিচার-বোধ এবং অধিকার থাকা চাই। যে শিক্ষক ও শিষ্যের মধ্যে প্রেমের বন্ধন নাই, যেখানে শিষ্যের দোষে, শিক্ষকের সত্যিকার আঘাত বোধ হয় না, যেখানে শিষ্যের শিক্ষকের প্রতি শ্রদ্ধার ভাব নাই, সেখানে উপবাস নিরর্থক ও কখন কখন হানিকর হয়। এই উপবাসে ও অর্দ্ধাশনের যোগ্যতা-বিষয়ে কাহারও সন্দেহ থাকিতে পারে, কিন্তু শিষ্যের দোষের জন্য শিক্ষক যে কম বেশী পরিমাণে দায়ী, সে বিষয়ে আমার লেশমাত্রও সন্দেহ নাই।

সাত দিন উপবাস ও একাহার আমাদের কাহারও কঠিন বোধ হয় নাই। সেজন্য আমার কোন কাজ কম হয় নাই বা বন্ধ হয় নাই। এই সময়ে আমি কেবল ফলাহার করিয়াই ছিলাম। চৌদ্দ দিন উপবাসের শেষ দিক্‌টা আমার খুবই ক্লেশকর হইয়াছিল, তখন আমি রাম নামের চমৎকারিত্ব পুরা বুঝিতাম না, এই জন্য, দুঃখ সহ্য করার শক্তি কম ছিল। উপবাসকালে চেষ্টা করিয়া যথেষ্ট জলপান করিতে হয়, এই বাহ্যিক উপায়ের সন্ধান আমি জানিতাম না, সেই জন্যই এই উপবাসে কষ্ট হইয়াছিল। তাহা ছাড়া প্রথম উপবাস সুখে শান্তিতে কাটিয়াছিল বলিয়া আমি চৌদ্দ দিন উপবাসের সময় কতকটা

অসতর্ক হইয়াছিলাম। প্রথম উপবাসের সময় রোজই কুহ্যুকের নির্দ্দিষ্ট কটি-স্নান করিতাম। চৌদ্দ দিন উপবাসের সময় ২।৩ দিন পরেই উহা বন্ধ করিয়া দিয়াছিলাম। জলের স্বাদ ভাল লাগিত না ও জল খাইতে বমি আসিত। সেই জন্য খুব কমই জল খাইতাম। তাহাতে গলা শুখাইয়া যাইত, শরীর ক্ষীণ হইয়াছিল. এবং শেষের দিকটায় কেবল ধীরে ধীরে নিম্ন স্বরেই কথা বলিতে পারিতাম। তাহা হইলেও লেখার কাজ শেষ দিন পর্য্যন্ত করিতে পারিয়াছিলাম। রামায়ণ ইত্যাদিও উপবাস-অন্ত পর্য্যন্ত শুনিয়াছি। যদি কোনও প্রশ্ন-সম্বন্ধে আমার মত জানার আবশ্যক হইত তাহাও দিতে পারিতাম।

৩৭

গোখলের সহিত দেখা করিতে

দক্ষিণ আফ্রিকার অনেক স্মৃতি আমাকে বাদ দিয়া যাইতে হইতেছে। সন ১৯১৪ সালে যখন সত্যাগ্রহ যুদ্ধের অন্ত হয়, তখন গোখলের ইচ্ছায় আমাকে ইংলণ্ড হইয়া দেশে ফিরিতে হয়। সেইজন্য জুলাই মাসে কস্তুর-বাঈ, কলেনবেক ও আমি বিলাত রওনা হইলাম। সত্যাগ্রহের লড়াইয়ের সময় আমি তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিতে আরম্ভ করিয়াছিলাম। সেইজন্য সমুদ্রপথে যাইতেও তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটাইয়াছিলাম। কিন্তু এই তৃতীয় শ্রেণীতে ও দেশের তৃতীয় শ্রেণীতে অনেক প্রভেদ আছে। দেশের সমুদ্রগামী ষ্টীমারে বা রেলে শোওয়া-বসার জায়গাই হয় না, পরিচ্ছন্নতা হইবে কোথা হইতে। এখানে উপযুক্ত জায়গা ছিল, পরিচ্ছন্নতা বেশ ছিল। কোম্পানী আমাদের জন্য খুব সুবিধা করিয়া দিয়াছিলেন। কেবল আমাদের ব্যবহারের জন্যই পায়খানা রিজার্ভ করিয়া চাবি আমাদিগকে দিয়াছিলেন। আমরা তিনজন ফলাহার করিতাম, সেইজন্য আমাদিগকে শুষ্ক মেওয়া ও ফল দেওয়ার জন্য ষ্টীমারের খাজাঞ্চির উপর আদেশ ছিল। সাধারণতঃ তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীকে ফলই দেওয়া হয় না, মেওয়া ত দূরের কথা। এইসব সুবিধার জন্য আমরা খুব শান্তিতে সমুদ্রপথে আঠার দিন কাটাইয়া দিয়াছিলাম।

এই ভ্রমণ-সম্বন্ধে কতকগুলি স্মৃতি জানাইবার যোগ্য। মিঃ কলেনবেকের দূরবীণের খুব সখ ছিল। এইজন্য তাঁহার কয়েকটা দামী

দূরবীণ ছিল। ইহা লইয়া আমাদের মধ্যে রোজ কথা হইত। আমাদের আদর্শ—যে সাদাসিধা জীবনে আমরা পহুছিতে চাই, উহা তাহার অনুকূল নহে—এইরকম আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিতাম। একদিন আমাদের মধ্যে খুব তকরার হইল। আমরা দুইজনে আমাদের ক্যাবিনের জানালার পাশে দাঁড়াইয়া ছিলাম।

আমি বলিলাম—"আমাদের মধ্যে এই তর্ক হওয়ার চাইতে এই দূরবীণটা যদি সমুদ্রে ফেলিয়া দেই ও আর উহার কথাই না বলি তবেই ভাল হয় ?

কলেনবেক তৎক্ষণাৎ জবাব দিলেন—"ঠিক, ঐ ঝগড়ার জিনিষ ফেলিয়া দিন।"

আমি বলিলাম—"আমি ফেলিয়া দিতেছি।"

তিনিও তেমনি পাল্টা উত্তর দিলেন—"আমি সত্যই বলিতেছি, নিশ্চিত ফেলিয়া দিন।"

আমি দূরবীণ ফেলিয়া দিলাম। উহার দাম সাত পাউণ্ডের মত ছিল। কিন্তু উহার মূল্য উহার দামে নয়, মিঃ কলেনবেকের উহার উপর মোহই উহার মূল্য ছিল। তাহা হইলেও মিঃ কলেনবেক ওটার জন্য কখনও দুঃখ করেন নাই। আমাদের মধ্যে এই ধরণের ব্যাপার প্রায়ই হইত। উপরের ঘটনা তাহারই একটা নমুনা।

আমাদের মধ্যে রোজই এই রকম নূতন কিছু শিক্ষার বিষয় মিলিত। উভয়েই সত্যের অনুসরণ করিয়া চলিতে চাহিতাম। সত্যের অনুসরণ করার চেষ্টায় ক্রোধ, স্বার্থ, দ্বেষ ইত্যাদি সহজেই শান্ত হয় ; যদি শান্ত না হয়, তবে সত্য লাভ হয় না। রাগ-দ্বেষপূর্ণ মানুষ সরল হইতে পারে, বাক্যে সত্যপালন করিতে পারে, কিন্তু শুদ্ধ সত্য পাইতে পারে

না। শুদ্ধ সত্যের জ্ঞান যাহার হইয়াছে সে রাগ-দ্বেষ ইত্যাদির দ্বন্দ্ব হইতে মুক্ত হইয়াছে।

উপবাস পূর্ণ করার পর বেশীদিন না যাইতেই এই ভ্রমণ আরম্ভ করা হইয়াছিল। তখনও আমার শরীরের শক্তি পুরা ফিরিয়া আসে নাই। যাহাতে ঠিকমত খাইতে ও হজম করিতে পারি, সেইজন্য ষ্টীমারের সাম্‌নের ডেকে আমি রোজ পায়চারী করিয়া ব্যায়াম করিতাম। কিন্তু তাহাতে আমার পায়ের পেশীতে ব্যথা বেশী বোধ হইতে লাগিল। বিলাতে পঁহুছিয়া আমার পায়ের ব্যথা না কমিয়া, দেখিলাম যে, উহা বাড়িয়াছে। বিলাতে ডাক্তার জীবরাজ মেহ্‌তার সহিত পরিচয় হইল। তিনি উপবাস ও পায়ের ব্যথার বিষয় সব কথা শুনিয়া বলিলেন— "যদি আপনি কিছুদিনের জন্য সম্পূর্ণ বিশ্রাম না লন, তবে আপনার পা বরাবরের জন্য অচল হইয়া যাওয়ার ভয় আছে। এই সময় আমার জ্ঞান হইল যে, লম্বা উপবাস যাহারা লইয়াছে তাহাদের তাড়াতাড়ি সামর্থ্য পাওয়ার লোভে বেশী করিয়া খাওয়া উচিত নয়। উপবাসের সময় অপেক্ষা উপবাসের অন্তে বেশী সাবধান থাকিতে হয়, বেশী সংযম রাখিতে হয়।

মদীরায় সংবাদ পাইলাম যে, মহাযুদ্ধ যে কোনও সময়ে আরম্ভ হইতে পারে। ইংলিশ চ্যানেলে পঁহুছিতে যুদ্ধ আরম্ভের সংবাদ পাইলাম। আমাদিগকেও আটকানো হইল। জলের নীচে স্থানে স্থানে বিস্ফোরক রাখা হইয়াছিল, সেইজন্য সাউদাম্পটন্ পঁহুছিতে এক কি দুই দিন লাগিল। ৪ঠা আগষ্ট যুদ্ধঘোষণা হইয়াছিল, আমরা ৬ই বিলাতে পঁহুছিলাম।

৩৮

যুদ্ধে যোগদান

বিলাতে পঁহুছিয়া খবর পাইলাম, গোখলে প্যারিসে রহিয়া গিয়াছেন। প্যারিসের সহিত যাতায়াত বন্ধ হইয়া গিয়াছে, কবে তিনি ফিরিবেন তাহার ঠিকানা নাই। গোখলে স্বাস্থ্যের জন্য ফ্রান্সে গিয়াছিলেন। তাঁহার সহিত দেখা না করিয়া দেশেও ফিরিতে পারি না, আর কবে যে তিনি আসিবেন একথাও কেহ বলিতে পারে না।

ইতিমধ্যে কি করা যায়? এই যুদ্ধে আমার ধর্ম্ম কি? আমার জেলের সাথী ও সত্যাগ্রহী পার্শী সোরাবজী আড়াজনীয়া বিলাতে ব্যারিষ্টারী পড়িতেছিলেন। সত্যাগ্রহীদের মধ্যে তিনি সর্ব্বশ্রেষ্ঠ ছিলেন। তাই বিলাতে আসিয়া ব্যারিষ্টার হইয়া, পরে দক্ষিণ আফ্রিকায় ফিরিয়া আমার স্থান লইবেন, এই কল্পনা করিয়া তাঁহাকে পাঠাইয়া দেওয়া হইয়াছিল। তাঁহার খরচা ডাক্তার প্রাণজীবন দাস মেহ্‌তা পাঠাইতেন। তাঁহার সাথে এবং তাঁহার মারফতে ডাক্তার জীবরাজ মেহ্‌তা ইত্যাদি যাঁহারা বিলাতে পড়িতেছিলেন তাঁহাদের সহিত যুক্তি করি। বিলাত-প্রবাসী ভারতীয়দের এক সভা আহ্বান করিয়া তাঁহাদের নিকট আমার সিদ্ধান্ত জানাইলাম। আমার মনে হইল যে, বিলাত-প্রবাসী ভারতীয়দের এই যুদ্ধে নিজেদের অংশ পূরণ করা দরকার। ইংরাজ বিদ্যার্থীরা যুদ্ধে সেবা করার সঙ্কল্প প্রকাশ করিয়াছিলেন। ভারতীয়েরা তাহাদের অপেক্ষা কম কিছু করিতে পারে না। এই যুক্তির বিরুদ্ধে সভাতে অনেক যুক্তি উপস্থিত

হইয়াছিল। আমাদের ও ইংরাজদের অবস্থার মধ্যে, হাতী ও ঘোড়ার মধ্যে যেমন তফাৎ, তেমনি তফাৎ। একে দাস, অপরে মালিক। এই অবস্থায় দাস মালিকের প্রয়োজনের সময় কেমন করিয়া স্বেচ্ছায় তাহাকে সাহায্য করিতে পারে? দাসত্ব হইতে মুক্ত হইতে যাহারা ইচ্ছুক তাহাদের ধর্ম্ম, মালিকের দুর্দ্দিনের সাহায্য লইয়া মুক্তি পাওয়া নয় কি? এই যুক্তির সঙ্গে সে সময় আমার মন সায় দিতে পারিল না। যদিও আমি ইংরাজ ও ভারতীয়দের অবস্থার প্রভেদ জানিতাম, তবুও তাহা যে ঠিক দাসত্ব—এ রকম আমার মনে হইত না। আমার মনে হইত যে, ইংরাজ পদ্ধতির দোষ অপেক্ষা কতকগুলি ইংরাজ কর্ম্মচারীর দোষই বেশী এবং সে দোষ আমাদের প্রেম দ্বারাই দূর করিতে পারা যাইবে। যদি ইংরাজের হাত দিয়া ইংরাজের সাহায্যে আমাদের অবস্থার সংস্কার সাধন করিতে হয়, তবে তাহাদের দুঃসময়ে তাহাদিগকে সাহায্য করিয়া অবস্থার সংশোধন করা কর্ত্তব্য। ইংরাজের রাজ্যপদ্ধতি দোষপূর্ণ হইলেও, আজ যেমন তাহা অসহ্য বোধ হইতেছে তখন ততটা অসহ্য লাগিত না। কিন্তু আজ যেমন ইংরাজের শাসনপদ্ধতির উপর হইতে আমার বিশ্বাস নষ্ট হইয়াছে বলিয়া আর আমি ইংরাজ-রাজ্য-রক্ষার সাহায্য করিতে পারি না, সেদিনও তেমনি যাহাদের ইংরাজ-পদ্ধতি ও ইংরাজ-কর্ম্মচারীদের উপর হইতে বিশ্বাস চলিয়া গিয়াছে, তাঁহারাই বা কি করিয়া ইংরাজদিগকে সাহায্য করিতে প্রস্তুত হইবেন?

তাঁহারা এই সময় প্রজার দাবী ভাল করিয়া প্রকাশ করিতে ও প্রজার অবস্থা উন্নত করিতে চেষ্টা করা যুক্তিযুক্ত বিবেচনা করেন। ইংরাজের বিপদের সময় আমাদের দাবী উপস্থিত করা আমি যুক্তিযুক্ত

মনে করি নাই। লড়াইয়ের সময় নিজেদের অধিকারের দাবী মুলতুবী রাখার সংযম রক্ষা করা আমি সভ্যতা ও দূরদৃষ্টির দিক্ হইতে আবশ্যক মনে করি। এই জন্য আমি আমার যুক্তির উপরই দৃঢ় রহিলাম এবং প্রস্তাব করিলাম যে, যাঁহারা যুদ্ধের কাজে ভর্ত্তি হইবার জন্য নাম দিতে চাহেন, তাঁহারা যেন নাম দেন। নাম অনেকেই লেখাইলেন। তাঁহাদের মধ্যে সকল প্রদেশের ও সকল ধর্ম্মের লোক ছিল।

লর্ড ক্রুকে এই বিষয়ে পত্র লিখিলাম, এবং আহত সৈন্যদিগকে শুশ্রূষা করার কাজের জন্য যদি শিক্ষা দেওয়া দরকার হয়, তবে সে শিক্ষা গ্রহণ করিতে আমার সঙ্গীরা প্রস্তুত আছেন জানাইয়া দিলাম। কতকটা দ্বিধার পর লর্ড ক্রু ভারতীয়দের এই সেবা গ্রহণ করিতে স্বীকার করিলেন ও দুঃসময়ে সাম্রাজ্যকে সাহায্য করিতে তৈরী হওয়ার জন্য ধন্যবাদ জ্ঞাপন করিলেন।

যাঁহারা নাম দিয়াছিলেন, ডাক্তার ক্যাণ্টলীর অধীনে তাঁহারা আহতদিগের শুশ্রূষা করার প্রাথমিক শিক্ষা গ্রহণ করিতে আরম্ভ করিলেন। ছয় সপ্তাহের মধ্যে শেষ করার মত একটা ছোট শিক্ষাক্রম স্থির ছিল, তাহাতেই সমস্ত প্রাথমিক শুশ্রূষা শিক্ষা দেওয়া হইত। এই দলে প্রায় ৮০ জন প্রবেশ করিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে কেবল একজন পাশ করিতে পারেন নাই। যাঁহারা পাশ হইলেন তাঁহাদের জন্য সরকার এক্ষণে কাওয়াজ (ড্রিল) শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিলেন। কর্ণেল বেকারের হাতে এই দলের ড্রিল শিক্ষা দেওয়ার ভার ছিল; তিনি এই দলের সর্দ্দার হইলেন।

এই সময় বিলাতের দৃশ্য দেখার মত হইয়াছিল। লোকে আতঙ্ক-

গ্রস্ত না হইয়া, সকলেই লড়াইয়ে সাহায্য করিবার জন্য সাধ্যানুরূপ শক্তি নিয়োগ করিতেছিল। শক্তিমান্ যুবকেরা যুদ্ধের কসরৎ শিখিতে লাগিয়া গিয়াছিল। কিন্তু অশক্ত বৃদ্ধ, স্ত্রীলোক প্রভৃতি কি করিবে? তাহারা যদি কাজ করিতে ইচ্ছা করে তবে কাজ তাহাদেরও ছিল। তাহারা লড়াইয়ে নিযুক্ত লোকদিগের জন্য কাপড়চোপড় সেলাই করিতে লাগিয়া গেল। সেখানে নারীদিগের 'লাইসিয়ম' নামে এক ক্লাব আছে। তাহার সভ্যেরা লড়াইয়ের জন্য আবশ্যকীয় পোষাক যতটা তৈরী করিতে পারেন, তাহা তৈরী করার ভার লইলেন। সরোজিনী দেবী তাহার সভ্যা ছিলেন। তিনি ইহাতে পুরাপুরি ভাগ লইয়াছিলেন। তাঁহার সহিত এই আমার প্রথম পরিচয় হয়। তিনি আমার সাম্নে কাপড়ের এক স্তূপ ফেলিয়া দিয়া বলিলেন, যতটা পারি যেন সেলাই করাইয়া দিই। তাঁহার ইচ্ছামত আমি সমস্তই লইলাম এবং শুশ্রূষাকার্য্য শিক্ষা করিয়া যত সময় বাঁচিত তাহাতে যতটা পারা যায়, বন্ধুদের সাহায্যে তৈরী করিয়াও দিয়াছিলাম।

৩৯

ধর্ম্মে উভয় সঙ্কট

যুদ্ধে যোগ দেওয়ার জন্য আমরা কয়েকজন একত্রিত হইয়া সরকারের নিকট নাম পাঠাইয়া দিয়াছি, এই খবর দক্ষিণ আফ্রিকায় পঁহুছিলে সেখান হইতে তৎক্ষণাৎ দুই টেলিগ্রাম আসিল। তাহার মধ্যে একখানা ছিল পোলকের। তাহাতে জিজ্ঞাসা করা হইয়াছে—"তোমার এই সিদ্ধান্ত তোমার অহিংসার সিদ্ধান্তের বিরুদ্ধ নহে কি?"

এই রকম তার পাওয়ার কতকটা আশা আমি করিয়াছিলাম। এই বিষয়ে আমি "হিন্দ্ স্বরাজ্য" পুস্তকে চর্চ্চা করিয়াছি। দক্ষিণ আফ্রিকায় মিত্রদের সাথে এ আলোচনা সর্ব্বদাই হইত। যুদ্ধের অনীতি আমরা সকলেই স্বীকার করিতাম। আমার আক্রমণকারীর উপর আমি প্রতি আক্রমণ করিতেও রাজি নহি। এরূপ অবস্থায় দুই রাজ্যের মধ্যে যখন যুদ্ধ চলিতেছে, এবং তাহাতে কার কি দোষ-গুণ তাহাও আমি জানি না, তখন আমি কি করিয়া যুদ্ধে যোগ দিতে পারি? বোয়ার যুদ্ধে আমি যে যোগ দিয়াছিলাম, সে কথা বন্ধুরা জানিতেন। কিন্তু তাঁহারা মনে করিতেন যে, ঐ যুদ্ধের পর হয়ত আমার বিচারের পরিবর্ত্তন হইয়াছে।

বস্তুতঃ যে সকল যুক্তি অনুসারে বোয়ার যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলাম, ঠিক সেই সকল যুক্তিই আমাকে এই যুদ্ধে যোগ দেওয়াইয়াছিল। যুদ্ধে যোগ দিব, আবার অহিংসার সহিত ঘর করিব, এমন হয় না,—এ ধারণা আমার কাছে একান্ত সুস্পষ্ট ছিল। কিন্তু ইহা যেমন

স্পষ্ট দেখিতেছি, তেমনি অবস্থানুসারে কি কর্ত্তব্য তাহা সকল সময় দিবালোকের ন্যায় স্পষ্ট হয় না। সত্যের পূজারীকে অনেক সময় অন্ধকারে হাতড়াইতে হয়।

অহিংসা ব্যাপক বস্তু। আমাদের এই প্রাণ হিংসার প্রজ্জ্বলিত আগুনে সমর্পিত। "জীব জীবের উপর জীবন ধারণ করে"—এই বাক্যের মানে বড় কম নয়। মানুষ বাহ্যিক ভাবে হিংসা না করিয়া ক্ষণমাত্রও থাকিতে পারে না। খাইতে পরিতে, উঠিতে বসিতে, প্রত্যেক কার্য্যেই ইচ্ছায় অনিচ্ছায়, মানুষকে হিংসা করিতেই হইতেছে। সেই হিংসা হইতে মুক্ত হইতে যাহাদের চেষ্টা থাকে, যাহাদের ভাবনা কেবল অনুকম্পাময়, যাহারা সূক্ষ্মাতিসূক্ষ্ম জীবনও নাশ করিতে চায় না, বরং যথাশক্তি তাহাকে বাঁচাইতে প্রয়াস করে, তাহারাই অহিংসার পূজারী। তাহাদের প্রবৃত্তিতে নিরন্তর সংযমের বৃদ্ধি হইতে থাকে, তাহাদের মধ্যে নিরন্তর করুণা বাড়িতে থাকে। কিন্তু কোনও দেহধারীই বাহ্য হিংসা হইতে মুক্ত হইতে পারে না।

অহিংসার সহিত একই স্তরে অদ্বৈত ভাবনা রহিয়াছে। যদি প্রাণীমাত্রই এক হয়, তবে একের পাপের প্রভাব অন্যের উপর হয়। সেদিক্ দিয়াও মানুষ হিংসা হইতে অস্পৃষ্ট থাকিতে পারে না। যে মানুষ সমাজে বাস করে, সে অনিচ্ছাতেও সমাজের হিংসার ভাগ গ্রহণ করে। যখন দুই জাতির ভিতর যুদ্ধ হয়, অহিংসা-মান্যকারী ব্যক্তির কাজ তখন সেই যুদ্ধ ঠেকানো। সে ধর্ম্ম যে পালন করিতে না পারে, যাহার ভিতরে ঐরূপ বিরোধ করার শক্তি নাই, সে ব্যক্তি বিরোধ করার শক্তি নাই বলিয়াই যুদ্ধে যোগ দেয় এবং যোগ দিয়াও তাহা হইতে নিজেকে, নিজের দেশকে ও জগৎকে রক্ষা করিতে হৃদয়ের সহিত চেষ্টা করে।

ইংরাজ রাজ্যের ভিতর দিয়া আমার অর্থাৎ আমার জাতির স্থিতির উন্নতি করিতে হইতেছে। আমি ইংলণ্ডে বসিয়াছিলাম, ইংলণ্ডের নৌ-বহর দ্বারা সুরক্ষিত ছিলাম। সেই নৌ-বহরের বলের এই ব্যবহার করিয়া আমি তাহাদের অন্তঃস্থ হিংসার সোজাসুজি অংশীদার হইয়াছি। সেইজন্য যদি আমাকে সেই রাজ্যের সহিত সংশ্রব রাখিতে হয়, যদি সেই রাজ্যের পতাকার নীচে থাকিতে হয়, তবে আমাকে যুদ্ধের বিরুদ্ধতা করিয়া, যে পর্য্যন্ত না সেই রাজ্যের যুদ্ধনীতি বদলায় সে পর্য্যন্ত (১) তাহার সহিত সত্যাগ্রহ শাস্ত্র অনুসারে অসহযোগ করিতে হয়; অথবা (২) সেই রাজশাসন অমান্য করার যোগ্য হইলে তাহা অমান্য করিয়া জেলের রাস্তা লইতে হয়, অথবা (৩) আমাকে সেই যুদ্ধ প্রবৃত্তিতে যোগ দিয়া সহায়তার ভিতর দিয়াই, তাহার বিরুদ্ধে দাঁড়াইবার শক্তি ও অধিকার লাভ করিতে হয়। প্রথমোক্ত দুই প্রকারের শক্তি আমার মধ্যে নাই। সেইজন্য আমার কাছে যুদ্ধে যোগ দেওয়াই একমাত্র রাস্তা—ইহাই আমি বিশ্বাস করি।

বন্দুক লইয়া যে যুদ্ধ করে, আর যে তাহার সাহায্য করে, অহিংসার দৃষ্টিতে আমি সে দুইয়ের মধ্যে ভেদ জানি না। যে ব্যক্তি লুণ্ঠনকারীর দলে চাকুরী করে, সে লুঠই করুক, অথবা তাহাদের পাহারাই দিক্, অথবা তাহাদের সেবাই করুক, ডাকাতির অপরাধে সেও লুণ্ঠনকারী-দেরই সমান অপরাধী। এই ধরণের যুক্তিতে সৈন্যদের শুশ্রূষায় নিযুক্ত ব্যক্তিও যুদ্ধের দোষ হইতে মুক্ত থাকিতে পারে না।

এই সকল যুক্তি পোলকের টেলিগ্রাম আসিবার পূর্ব্বেই করিয়া রাখিয়াছিলাম। তাঁহার তার পাইয়া উহার আলোচনা আবার কয়েকজন মিত্রের সহিত করিলাম। যুদ্ধে যোগ দেওয়া আমি ধর্ম্ম বিবেচনা

করিয়াছিলাম, আর আজও যদি যুক্তি করি, তবুও উপরের যুক্তির মধ্যে দোষ দেখিতে পাই না। বৃটীশ রাজ্য সম্বন্ধে আমি তখন যে ধারণা পোষণ করিতাম সেই অনুসারেই আমি যুদ্ধে যোগ দিয়াছিলাম, সেই হেতু তাহার জন্য আমার অনুতাপ নাই।

আমি জানি যে, আমার এই সিদ্ধান্তের যৌক্তিকতা আমার সকল মিত্রের নিকট ঠিক বলিয়া প্রমাণ করিতে পারি নাই। প্রশ্নটা সূক্ষ্ম। ইহাতে মতভেদের অবকাশ আছে। সেইজন্য যাঁহারা অহিংসা ধর্ম্ম মানেন ও সূক্ষ্মভাবে উহা পালন করেন, তাঁহাদের সম্মুখে যতটা পারি স্পষ্ট করিয়া আমার অভিপ্রায় ব্যক্ত করিলাম। সত্যের উপাসক, প্রচলিত রীতি আছে বলিয়াই, কোন কার্য্য করে না। সে নিজের সিদ্ধান্ত জেদ করিয়া ধরিয়া রাখে না। সিদ্ধান্তে দোষ থাকিতে পারে, ইহা সকল সময়ই স্বীকার করে এবং যখন দোষ বলিয়া বুঝিতে পারে, তখন যতই ক্ষতি হোক্ না কেন, তাহা স্বীকার করিয়া প্রায়শ্চিত্ত করে।

৪০

ছোটখাট সত্যাগ্রহ

এই প্রকার সিদ্ধান্তবশে, ধর্ম্মজ্ঞানে আমি যুদ্ধে যোগ দিলাম সত্য, কিন্তু আমার ভাগ্যে সোজাসুজি যুদ্ধে যোগ দেওয়া ত হইলই না, পরন্তু এই সঙ্কট মুহূর্ত্তে আমাকে সত্যাগ্রহ করিতে হইয়াছিল।

আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি যে, আমাদের নাম গৃহীত হইলেও আমাদিগকে তালিকা ভুক্ত করা হইলে, পুরা কাওয়াজ শিখিবার জন্য আমরা একজন কর্ম্মচারীর অধীনস্থ হইয়াছিলাম। আমরা সকলেই এই বুঝিয়াছিলাম যে, এই কর্ম্মচারী যুদ্ধের শিক্ষা দেওয়া সম্বন্ধেই আমাদের প্রধান, অন্যান্য বিষয়ে আমাদের দলের আমিই কর্ত্তা। আমাদের সাথীদের সম্বন্ধে দায়িত্ব যেমন আমার, তেমনি আমার প্রতি তাঁহাদেরও দায়িত্ব, অর্থাৎ আমার হস্ত দিয়াই ঐ কর্ম্মচারীর সকল কাজ করাইতে হইবে। কিন্তু প্রথম দিন হইতেই আমরা বুঝিলাম যে, তাঁহার অভিপ্রায় অন্য রকমের। সোরাবজী চতুর লোক। তিনি আমাকে সাবধান করিয়া দিয়া বলিলেন—"সাবধান হইবেন, লোকটা আমাদের উপর হুকুম চালাইতে চায় দেখিতেছি। কিন্তু তাহার হুকুম করার ত অধিকার নাই, আমাদের কেবল শিক্ষা দেওয়াই তাহার কার্য্য। তাহা ছাড়া, আমাদের শিক্ষা দানের জন্য যে সকল ছোক্‌রাকে সে আনিয়াছে, তাহারা পর্য্যন্ত আমাদের উপর হুকুম চালাইতে চায়।" এই যুবকেরা অক্সফোর্ডের ছাত্র ছিল। তাহারা শিখাইতে মাত্র আসিয়াছিল এবং এক এক ব্যাচের কেবল শিক্ষা দেওয়ারই নেতা ছিল। আমিও

দেখিলাম সোরাবজীর কথা ঠিক। আমি সোরাবজীকে শান্ত করিলাম ও এজন্য চিন্তা করিতে নিষেধ করিলাম। কিন্তু সোরাবজী পট্ করিয়া কোন কথা মানিয়া লওয়ার লোক ছিলেন না।

সোরাবজী হাসিতে হাসিতে বলিলেন—"আপনার ত ভোলা মন। আপনাকে ইহারা মিষ্ট কথায় তুষ্ট করিয়া ঠকাইবে। তারপর যখন আপনার চক্ষু খুলিয়া যাইবে তখন বলিবেন, চলো সত্যাগ্রহ করি, আর আমাদিগকে দুঃখে ফেলিবেন।"

আমি জবাব দিলাম—"আমার সঙ্গ করিলে কোনও দিন দুঃখ ছাড়া আর অন্য কিই বা পাইবেন? আমরা, সত্যাগ্রহীরা ঠকিবার জন্যই কি জন্মি নাই। ঐ সাহেব আমাদিগকে ঠকায় ত ভাল। আপনাদিগকে কি আমি হাজারো বার বলি নাই যে, যে ব্যক্তি ঠকায় শেষকালে সেই ঠকে?"

সোরাবজী খল্ খল্ করিয়া হাসিয়া উঠিলেন। বলিলেন—"ঠিক কথা, আপনি ঠকিতেই থাকুন। কোনও দিন সত্যাগ্রহেই আপনি মারা যাইবেন এবং সেই সঙ্গে সঙ্গে আমাদের মত লোকদিগকেও পিছনে পিছনে টানিয়া লইয়া যাইবেন।"

এই কথা মনে হইলে পরলোকগত মিস্ হব্‌হাউস, অসহযোগ-সম্বন্ধে আমাকে যাহা বলিয়াছিলেন তাহাও মনে পড়ে। তিনি বলিয়াছিলেন—"এই সত্যের জন্য কোন দিন আপনাকে ফাঁসিতে চড়িতে হইতেছে দেখিলেও আমি আশ্চর্য্য হইব না। ঈশ্বর আপনাকে সোজা রাস্তায় চালনা করুন ও আপনাকে রক্ষা করুন।"

সেই কর্ম্মচারী নিযুক্ত হওয়ার আরম্ভ কালেই সোরাবজীর সহিত এই কথাবার্ত্তা হইয়াছিল। আরম্ভ আর অন্ত হওয়ার মধ্যে বেশী দিন কাটে

নাই। ইতিমধ্যেই আমার প্লুরিসি ব্যাধি হইল। চৌদ্দ দিনের উপবাসের পর আমার শরীর মোটেই ভাল ছিল না, তারপর কাওয়াজে আমাকে পুরাপুরী থাকিতে হইত, ইহা ভিন্ন অনেক দিন বাড়ী হইতে কাওয়াজের স্থান পর্য্যন্ত হাঁটিয়া যাইতে হইত। সে পথও দুই মাইল হইবে। এইরূপে অবশেষে আমাকে শয্যাগত হইতে হইয়াছিল।

এই অবস্থায় আমাকে আমাদের ক্যাম্পে যাইতে হইয়াছিল। সুতরাং অপর সকলকে ক্যাম্পে রাখিয়া আমি ঘরে ফিরিলাম। এইখানেই একটি সত্যাগ্রহের কারণ ঘটে।

কর্ম্মচারী নিজের হুকুম চালাইতেছিলেন। তিনি স্পষ্ট বুঝাইয়া দিলেন যে, সকল বিষয়েই তিনি আমাদের কর্ত্তা। নিজের প্রাধান্যের দৃষ্টান্তও তিনি কার্য্যতঃ দিলেন। সোরাবজী আবার আমার কাছে আসিলেন। তিনি নবাবী সহ্য করিতে প্রস্তুত ছিলেন না। তিনি বলিলেন—"সকল হুকুম আপনার হাত দিয়াই আসা চাই; এখনো আমরা ট্রেইনিং ক্যাম্পে আছি, তবুও আমাদের উপর অসম্ভব সব হুকুম সমস্ত বিষয়েই দেওয়া হইতেছে। সেই যুবকদিগের মধ্যে ও আমাদের মধ্যে অনেক সময়েই দ্বেষজনক ভেদ রাখা হইতেছে। ইহা সহ্য করা যায় না। ইহার প্রতিকার এখনই হওয়া চাই, নয়ত আমরা কাজ ছাড়িয়া দিব। এই সকল বিদ্যার্থী ও অন্য যাহারা কাজে আসিয়াছে, তাহারা কেহই অন্যায় হুকুম মানিবে না। আত্মসম্মানের জন্য যে কাজ লওয়া হইয়াছে তাহাতে অপমান সহিতে পারা যাইবে না।"

আমি কমাণ্ডিং অফিসারের নিকট গেলাম এবং যেসকল অভিযোগ পাইয়াছি তাহা তাঁহাকে শুনাইলাম। তিনি সমস্ত

অভিযোগ আমাকে লিখিয়া জানাইতে বলিলেন। ইহার সঙ্গে সঙ্গেই নিজের অধিকারের কথা বলিলেন। তিনি জানাইয়া দিলেন—"অভিযোগ আপনার হাত দিয়া আসিবে না, অভিযোগ তাহাদের সেক্সনের পরিচালকের হাত দিয়া করিতে হইবে।"

আমি তদুত্তরে জানাইলাম—"আমি অধিকার খাটাইতে চাই না, সৈনিক রীতিতে ত আমি সাধারণ সিপাহী মাত্র। কিন্তু আমার দলের প্রধান বলিয়া, আমাকে তাহাদের প্রতিনিধিরূপে আপনার স্বীকার করা আবশ্যক।" আমার কাছে আর এক বিষয়ের অভিযোগ আসিয়াছিল, তাহাও তাঁহাকে শুনাইলাম। সে অভিযোগটি এই যে, সেক্সন-পরিচালকদিগকে আমাদের দলের সম্মতি না লইয়া নিযুক্ত করা হইয়াছে, এবং সেজন্য বড়ই অসন্তোষ আরম্ভ হইয়াছে। আমি বলিলাম—"ইঁহাদিগকে সরাইয়া লইয়া, দলের নিজের সেক্সন-পরিচালক পছন্দ করিয়া লওয়ার অধিকার দেওয়া দরকার।"

আমার কথা তাঁহার মনঃপূত হইল না। তিনি আমাকে শুনাইলেন—"সেক্সন-পরিচালক মনোনয়নের কথা ত সৈনিক রীতির বিরুদ্ধ। যদি এই সেক্সন-পরিচালকদিগকে সরাইয়া দেওয়া হয়, তবে আজ্ঞানুবর্ত্তিতার চিহ্নও থাকিবে না।"

আমরা সভা করিলাম। সত্যাগ্রহের কঠোর পরিণামের বিষয় সকলকে বুঝাইলাম। প্রায় সকলেই সত্যাগ্রহের শপথ লইলেন। সভায় ইহাই নির্দ্ধারিত হইল যে, যাঁহারা এখন সেক্সন-পরিচালক আছেন, যদি তাঁহাদিগকে সরানো না হয়, যদি এই দলকে সেক্সন-পরিচালক মনোনীত করিতে দেওয়া না হয়, তবে আমাদের দল কাওয়াজে যাওয়া ও ক্যাম্পে যাওয়া বন্ধ করিয়া দিবে।

আমি কমাণ্ডিং অফিসারকে এক পত্র লিখিয়া আমার অতিশয় অসন্তোষ জানাইলাম। আমি জানাইলাম যে, আমি প্রভুত্ব খাটাইবার ইচ্ছা রাখি না, আমি সেবা করিতে ইচ্ছা করি এবং সেবার জন্যই এই বন্ধুদিগকে এই কার্য্যে নামাইয়াছি। আমি তাঁহাকে ইহাও জানাইলাম যে, বোয়ার যুদ্ধে আমি কোনও প্রভুত্বের পদ গ্রহণ করি নাই, তবুও কর্ণেল গলওয়ে ও আমার দলের মধ্যে কখনও কোনও তর্ক বা বিরোধ হয় নাই। এবং সেই কমাণ্ডিং অফিসার আমার দলের ইচ্ছা আমার মারফতে জানিয়াই দল-সম্বন্ধে যাহা কর্ত্তব্য করিতেন। আমার পত্রের সহিত আমাদের দলের গৃহীত নির্দ্ধারণ এক খণ্ড পাঠাইলাম।

কমাণ্ডিং অফিসারের কাছে এই পত্র দেওয়ায় কোনও ফল হইল না। তিনি উল্টা ধরিয়া লইলেন যে, আমরা সভা করিয়া যাহা নির্দ্ধারণ করিয়াছি তাহাতেই নিয়ম ভঙ্গ করা হইয়াছে।

অতঃপর আমি ভারতবর্ষের সেক্রেটারী অব্ ষ্টেটের নিকট এক পত্র দিয়া সমস্ত অবস্থা জানাইলাম ও আমাদের সভার নির্দ্ধারণের নকলও পাঠাইয়া দিলাম।

তিনি আমাকে পত্রের উত্তরে জানাইলেন যে, দক্ষিণ আফ্রিকার অবস্থা অন্য রকম ছিল। এখানে কমাণ্ডিং অফিসারের দলের সেক্সন-পরিচালক নিয়োগ করার অধিকার আছে। তাহা হইলেও ভবিষ্যতে কমাণ্ডিং অফিসার আপনার অনুমোদনের সম্বন্ধে বিবেচনা করিবেন।

অতঃপর আমাদের মধ্যে অনেক পত্র-ব্যবহার হইয়াছিল, কিন্তু সেই সকল অপ্রীতিকর অভিজ্ঞতার বিষয় দিয়া কথা বাড়াইব না। তবে এটুকু না বলিলে চলে না যে, যে অভিজ্ঞতা আমরা রোজ

পাই, এখানেও সেই রকমই হইয়াছিল। কমাণ্ডিং অফিসারের ধমকে ও কৌশলে আমাদের মধ্যে দলাদলি হইল। যাঁহারা প্রতিজ্ঞা করিয়াছিলেন তাঁহাদের মধ্যে কয়েকজন ভয়েই হোক্, অথবা অনুরোধে পড়িয়াই হোক্, প্রতিজ্ঞা ভাঙ্গিয়া কমাণ্ডিং অফিসারের বশ্যতা স্বীকার করিলেন।

এই সময় নেট্‌লী হাসপাতালে অপ্রত্যাশিতভাবে বহুসংখ্যক আহত সিপাহী আসিয়া পড়িল। তাহাদের শুশ্রূষার জন্য আমাদের সমস্ত দলটার ডাক পড়িল। কমাণ্ডিং অফিসার যাঁহাদিগকে নিজের দিকে টানিয়া লইতে পারিয়াছিলেন, তাঁহারা নেট্‌লী হাসপাতালে গেলেন। যাঁহারা গেলেন না, তাঁহারা ইণ্ডিয়া আফিসে গেলেন। আমি শয্যাশায়ী ছিলাম। দলের লোকেরা আমার সহিত দেখা করিতেন। আণ্ডার সেক্রেটারী মিঃ রবার্ট্‌স্ সেই সময় আমার নিকট যাতায়াত করিতেন। তিনি দেখা করিতে আসিলেন, ও যাঁহারা বাকী ছিলেন, তাঁহাদের নেট্‌লী যাওয়ার জন্য আগ্রহ করিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, যাঁহারা আছেন তাঁহারা ভিন্ন দল গঠন করিয়া যাইবেন। নেট্‌লী হাসপাতালে তাঁহারা কেবল সেইখানকার কমাণ্ডিং অফিসারের অধীনে থাকিবেন। ইহাতে তাঁহাদের মানের কোন হানি হইবে না, সরকারের সন্তোষ হইবে এবং দলে দলে যেসকল আহত সৈন্য আসিয়া পড়িয়াছে তাহাদের সেবা করা হইবে। আমার সাথীদের এবং আমার এই প্রস্তাব পছন্দ হইল এবং যাহারা রহিয়া গিয়াছিল তাহারাও নেট্‌লী গেল। একা আমি বিছানায় পড়িয়া ভুগিতে লাগিলাম।

৪১

গোখলের উদারতা

বিলাতে আমার প্লুরিসি হওয়ার কথা পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। এই রোগের সময় গোখলে বিলাতে আসিয়া পঁহুছিলেন। তাঁহার নিকট কলেনবেক্ ও আমি সর্ব্বদা যাইতাম। অনেক সময় লড়াইয়ের কথা হইত। কলেনবেকের জার্ম্মাণীর ভূগোল নখাগ্রে ছিল এবং তিনি ইউরোপের সর্ব্বত্র ভ্রমণ করিয়াছেন বলিয়া গোখলেকে নক্সা করিয়া যুদ্ধের বিভিন্ন স্থান দেখাইয়া দিতেন।

যখন আমি অসুস্থ হইয়া পড়িয়াছিলাম, তখন আমার ব্যাধি আলোচনার এক বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল। আমার আহার-সম্বন্ধীয় পরীক্ষা চলিতেছিল। সেই সময় আমার খোরাক ছিল চীনাবাদাম, কাঁচা ও পাকা কলা, নেবু, জলপাইয়ের তেল, বিলাতী বেগুন ও আঙ্গুর ইত্যাদি। দুধ, শস্যাদি, ডাল—এ সব মোটেই খাইতাম না। আমার চিকিৎসা জীবরাজ মেহ্‌তা করিতেন। তিনি দুধ, ভাত ও রুটী ইত্যাদি খাওয়ার জন্য আমাকে আগ্রহ জানাইলেন। নালিশ গোখলে পর্য্যন্ত গিয়া পঁহুছিল। ফলাহারের সম্বন্ধে আমার যুক্তি তিনি বড় মান্য করিতেন না, আরোগ্য হওয়ার জন্য ডাক্তার যাহা বলে তাহাই খাওয়ায় তাঁহার আগ্রহ ছিল।

গোখলের ইচ্ছা ঠেলিয়া ফেলা আমার নিকট বড় কঠিন কাজ ছিল। তিনি যখন বড়ই আগ্রহ করিতে লাগিলেন তখন আমি চব্বিশ ঘণ্টা ভাবিবার সময় চাহিয়া লইলাম। কলেনবেক ও আমি বাড়ী ফিরিলাম।

এ বিষয় আমার কর্ত্তব্য কি, তাহা তাঁহার সহিত রাস্তায় আলোচনা করিলাম। তিনি আমার খাদ্য পরীক্ষার সাথী ছিলেন, তাঁহার উহা ভাল লাগিত। কিন্তু আমার শরীরের জন্য খাদ্যের পরীক্ষা যদি ত্যাগ করি তবে ঠিকই হইবে, এই রকম তাঁহার মনের ভাব দেখিলাম। এক্ষণে আমার নিজের অন্তরের ভাব খুঁজিয়া দেখা দরকার ছিল।

রাত্রি এই চিন্তায় কাটাইলাম। যদি এই পরীক্ষা পরিত্যাগ করি, তাহা হইলে এ বিষয়ে আমার সমস্ত ধারণাও পরিত্যাগ করিতে হয়। আমার ধারণায় কোনও ভুল আছে বলিয়া আমার মনে হয় না। গোখলের কথা কতটা পালন করা আমার কর্ত্তব্য, আর শরীর-রক্ষার জন্যই বা এই পরীক্ষা কতটা ত্যাগ করা দরকার ইহাই ছিল প্রশ্ন। আমি অবশেষে স্থির করিলাম যে, এই প্রয়োগের ভিতর যাহা কেবল ধর্ম্মের জন্য করিতেছি তাহা রক্ষা করিয়া বাকী সমস্ত বিষয়েই ডাক্তারের কথামত চলিব। দুধ যখন ত্যাগ করিয়াছিলাম তখন তাহাতে ধর্ম্মভাবই প্রধান ছিল। কলিকাতার গাভী ও মহিষদিগকে যে যন্ত্রণা দিয়া দুধ দোহান হয়, তাহার চিত্র আমার মনের সম্মুখে ছিল। আমার মনে হইত যে, যেমন মাংস মানুষের খাদ্য নয়, তেমনি কোনও জন্তুর দুধও মানুষের খাদ্য নয়। সেইজন্য দুধ ত্যাগের পরিবর্ত্তন করিব না স্থির করিয়া আমি প্রাতে শয্যাত্যাগ করিলাম। এইরূপ স্থির করাতে আমার মন অনেক হাল্‌কা হইল। গোখলে কি ভাবিবেন, সেই ছিল ভয়। আমি যাহা স্থির করিয়াছি তাহা তিনি মানিয়া লইবেন—এমন বিশ্বাসও ছিল। সন্ধ্যাকালে 'ন্যাশনাল লিবারল ক্লাবে' তাঁহার সহিত আমরা দেখা করিতে গেলাম। তিনি দেখা হওয়া মাত্রই প্রশ্ন করিলেন—"ডাক্তারের কথা শোনাই স্থির করিয়াছ ত?"

আমি নরম হইয়া জবাব দিলাম যে, আমি সমস্তই করিব, কেবল একটা বিষয়ে আপনি কিছু বলিবেন না। দুধ ও দুধের কোনও দ্রব্য আর মাংস আমি খাইব না। উহা না খাইলে যদি শরীর যায়, তবে যাইতে দেওয়াই আমার ধর্ম্ম এই রকম মনে হয়।

গোখলে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ইহাই কি তুমি একেবারে নিশ্চয় করিয়া ফেলিয়াছ?"

"আমার সঙ্কল্প বদলাইবার মত নয়। আমি বুঝিতেছি, ইহাতে আপনার দুঃখ হইবে, কিন্তু আপনি আমাকে ক্ষমা করিবেন।" কতকটা দুঃখের সহিত অথচ গভীর প্রেমভরে গোখলে বলিলেন—"তোমার সঙ্কল্প আমার পছন্দ হয় না। উহাতে আমি ধর্ম্ম কিছু দেখি না। কিন্তু ইহা লইয়া জেদ করিব না।" এই বলিয়া জীবরাজ মেহ্‌তাকে বলিলেন—"এখন গান্ধীর উপর চাপাচাপি করিবেন না। সে যাহা বলে তাহা মানিয়া লইয়া যাহা দেওয়া যায় তাহাই দিবেন।"

ডাক্তারের সন্তোষ হইল না, কিন্তু কি আর করিবেন! আমাকে মুগের ঝোল খাওয়ার পরামর্শ দিলেন, উহাতে কিছু হিঙ্‌ও দিতে বলিলেন। আমি স্বীকার করিলাম। দিনকতক উহা খাইলাম কিন্তু আমার ব্যথা উহাতে বাড়িল। উহাতে সুবিধা না হওয়ায় পুনরায় ফলাহার ধরিলাম। ডাক্তারও বাহ্যিক ঔষধ প্রয়োগ করিতেছিলেন, উহাতে কতকটা আরাম হয়। আমার খাওয়ার বাঁধাবাঁধিতে ডাক্তারের খুব অসুবিধা হইয়াছিল। ইতিমধ্যে অক্টোবর-নবেম্বরের লণ্ডনের ধোঁয়া সহ্য করিতে না পারিয়া গোখলে দেশে ফিরিলেন।

৪২
রোগের কি করা যায় ?

প্লুরিসি (ফুসফুসের পীড়া) না সারাতে আমি চিন্তিত হইয়া পড়িলাম। আমার মনে হইল যে, ঔষধে ইহা সারিবার নয়, খাদ্যের কোন পরিবর্ত্তনে বা বাহ্যিক কোনও ব্যবস্থায় হয়ত ভাল হইতে পারে।

ডাক্তার এলিন্‌সনের সহিত ১৮৯০ সালে আমার পরিচয় হইয়াছিল। তিনি খাদ্যের পরিবর্ত্তন দ্বারা রোগের চিকিৎসা করিতেন। তাঁহাকে আনিয়া দেখাইলাম। তাঁহাকে শরীরের অবস্থা বলিলাম এবং দুধ খাইতে আমার আপত্তির কথা জানাইলাম। তিনি অমনি আমাকে উৎসাহিত করিয়া বলিলেন—"দুধের কোনও আবশ্যক নাই। আমাকে ত তোমায় কিছুদিন তৈলাক্ত খাদ্য না দিয়াই রাখিতে হইবে।" এই বলিয়া প্রথমে আমাকে কাঁচা তরকারী ও ফল খাইয়া থাকিতে বলিলেন। কাঁচা তরকারীর মধ্যে মূলা, পিঁয়াজ এবং ঐ জাতীয় জিনিষ, আর ফলের মধ্যে প্রধানতঃ কমলা লেবু খাইতে বলিলেন। তরকারী খুব কুঁচাইয়া অথবা পিষিয়া খাইতে হইত। আমি তিন দিন এই রকম চালাইলাম, কিন্তু কাঁচা তরকারী আমার সহ্য হইল না। এই ব্যবস্থা আমি পালন করিতে পারি শরীরের অবস্থা আমার সেইরূপ ছিল না। এবং উহাতে শ্রদ্ধাও ছিল না। ইহা ভিন্ন তিনি আমাকে চব্বিশ ঘণ্টাই জানালা খুলিয়া রাখিতে, রোজ ঈষৎ গরম জলে স্নান করিতে, বেদনার স্থানে তেল মালিশ করিতে ও আধ ঘণ্টা খোলা হওয়ায়

বেড়াইতে ব্যবস্থা দিলেন। এই সকলই আমার ভাল বোধ হইল। ঘরের জানালায় এমন ব্যবস্থা ছিল যে, তাহা একেবারে খুলিলে ঘরে বৃষ্টির জল ঢুকিয়া যায়। দরজার উপরকার বাতায়নও খোলা যাইতেছিল না। উহার কাচ ভাঙ্গিয়া ফেলিলাম। উহাতে সারা দিনরাত হাওয়া চলাচলের সুবিধা হইল। আর জানালা যতটা খুলিলে জলের ছাঁট না আসে ততটা খুলিয়া রাখিলাম।

এইসব করায় শরীর কতকটা সুস্থ হইল। কিন্তু আরোগ্য হইল না। কখন কখন লেডী সিসিলিয়া রবার্টস্ আমার সহিত দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহার সহিত ভাল পরিচয় ছিল। আমাকে দুধ খাওয়াইতে তাঁহার প্রবল ইচ্ছা হইত। তাঁহার কোন বন্ধু তাঁহাকে 'মল্টেড' মিল্কে'র কথা বলিয়াছিলেন এবং না জানিয়াই তাঁহাকে বুঝাইয়াছিলেন যে, উহাতে কিছুমাত্র দুধ নাই। উহা রাসায়নিক প্রক্রিয়ায় প্রস্তুত দুধের গুণ-যুক্ত কোনও পদার্থ। আমি জানিতাম যে, লেডী রবার্টস্ আমার ধর্ম্মবিশ্বাসকে খুব সম্মান করিতেন। আমি ঐ 'মিল্ক' জলে গুলিয়া পান করিলাম। উহার স্বাদ আমার নিকট দুধের মত লাগিল। 'খাওয়া দাওয়া সারিয়া তারপর জাতি জিজ্ঞাসা করা'র মত, আমি দুধের স্বাদ পাওয়ার পর বোতলের লেবেলে পড়িয়া দেখিলাম উহা দুধই বটে। সেইজন্য একবার পান করিয়াই পরে ত্যাগ করিলাম। লেডী রবার্টসকে সংবাদ দিয়া জানাইলাম যে, তিনি এ বিষয়ে যেন মোটেই চিন্তা না করেন। তিনি অতি তাড়াতাড়ি আমার নিকট আসিয়া উপস্থিত হইলেন ও তাঁহার দুঃখ জ্ঞাপন করিলেন। তাঁহার বন্ধু বোতলের লেবেল পড়েন নাই। লেডী রবার্টস্ বড় ভাল মানুষ, আমি তাঁহাকে সান্ত্বনা দিলাম। তিনি এত কষ্ট করিয়া যাহা

আমার জন্য সংগ্রহ করিয়াছিলেন, তাহা ব্যবহার না করিতে পারায় আমি ক্ষমা চাহিলাম। তাঁহাকে জানাইলাম যে, না জানিয়া দুধ খাওয়ায় আমার কোনও দুঃখ হইতেছে না এবং কোনও প্রায়শ্চিত্তেরই প্রয়োজন নাই।

লেডী রবার্টসের সম্বন্ধে অন্য সমস্ত মধুর স্মৃতির কথা এখানে আর উল্লেখ করিলাম না। এমন অনেকের স্মৃতি আমার মনে রহিয়াছে, বিপদে বিঘ্নে যাঁহারা আমাকে মহৎ আশ্রয় দিয়াছেন। এই সকল মধুর স্মৃতি আমাকে এই কথাই মনে করাইয়া দেয় যে, ঈশ্বর যখন দুঃখের তিক্ত ঔষধ দেন, তখন তাহার সহিত মিষ্ট অনুপানও দেন।

ডাক্তার এলিন্‌সন যখন আমাকে দ্বিতীয়বার দেখিলেন, তখন তিনি অনেক বাঁধাবাঁধি কমাইয়া দিলেন। শরীরে চর্ব্বি হওয়ার জন্য তিনি মেওয়া ইত্যাদি এবং মাখন অথবা জলপাইয়ের তেল খাইতে বলিলেন। কাঁচা তরকারী ভাল না লাগিলে, রান্না করিয়া ভাতের সহিত খাইতে বলিলেন। পথ্যের এই পরিবর্ত্তন আমার খুব ভাল লাগিল।

রোগ সম্পূর্ণ সারিল না। শুশ্রূষার আবশ্যক ছিল। আমি শয্যা ত্যাগ করিতে পারিতাম না। ডাক্তার মেহ্‌তা মাঝে মাঝে সংবাদ লইয়া যাইতেন। "আমার কথামত চলিলে আমি ভাল করিয়া দিব"—একথা তাঁহার মুখে লাগিয়াই ছিল।

এইরকম চলিতেছিল, ইত্যবসরে মিঃ রবার্টস্ একদিন আসিয়া পড়িলেন এবং আমাকে দেশে যাওয়ার জন্য আগ্রহ করিতে লাগিলেন। "এই অবস্থায় আপনি কখনো নেট্‌লী হাসপাতালে যাইতে পারিবেন না। শীঘ্রই দারুণ শীত পড়িবে; আমার খুব ইচ্ছা যে, আপনি এখন দেশে যান ও সারিয়া উঠুন। তখন পর্য্যন্তও যদি যুদ্ধ চলিতে থাকে, তবে সাহায্য

করার অনেক সুযোগ আপনার হইবে। আর আপনি এখানেও যে সাহায্য করিয়াছেন তাহা কিছু কম নয়।"

আমি এই পরামর্শ মানিলাম ও দেশে ফেরার জন্য তৈরী হইলাম।

৪৩

দেশের পথে

মিঃ কলেনবেক্ আমার সহিত আমাদের দেশে আসিবেন স্থির করিয়াই বাহির হইয়া পড়িয়াছিলেন। এই সময় যুদ্ধের জন্য জার্ম্মাণদের উপর খুবই কড়া নজর ছিল। আমার সহিত মিঃ কলেনবেক্ আসিতে পারিবেন কিনা সে বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল। তাঁহার পাস পাওয়ার জন্য আমি অনেক চেষ্টা করিলাম। মিঃ রবার্টস তাঁহাকে পাস দিতে পারিলে খুসী হইতেন। তিনি সমস্ত কথা জানাইয়া বড়লাটকে তার করিলেন। লর্ড হার্ডিঞ্জের সোজা জবাব আসিল,—"আমরা দুঃখিত, কিন্তু এখন এইরকম কোনও ঝক্কি লইতে প্রস্তুত নহি।" এই জবাব যে সর্ব্বথা যুক্তিযুক্ত তাহা আমি বুঝিলাম। মিঃ কলেনবেকের সহিত বিচ্ছেদের দুঃখ আমার ছিল, কিন্তু আমার চাইতে তাঁহারই বেশী দুঃখ হইয়াছিল দেখিলাম। তিনি যদি ভারতবর্ষে আসিতে পারিতেন, তবে তিনি আজ চাষার ও তাঁতির সাদাসিধা সুন্দর জীবন যাপন করিতে থাকিতেন। এখন তিনি দক্ষিণ আফ্রিকায় তাঁহার পুরাতন জীবন যাপন করিতেছেন; সেখানে স্থপতির ব্যবসা চালাইতেছেন।

আমি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট কাটাইতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট না পাওয়ায় দ্বিতীয় শ্রেণীর টিকিট লইতে হইয়াছিল। দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে কিছু শুষ্ক ফল আনিয়াছিলাম, তাহা সঙ্গে লইলাম; টাট্‌কা ফল ষ্টীমারেই পাওয়া যাইত। ডাঃ

মেহ্‌তা আমার বুক 'মিডের' পলস্তারা দিয়া বাঁধিয়া দিয়াছিলেন এবং ব্যাণ্ডেজ রাখিতে উপদেশ দিয়াছিলেন। আমি দুইদিন ঐ ব্যাণ্ডেজ সহ্য করিয়াছিলাম, তারপর অসহ্য হইলে অতি কষ্টে উহা খুলিয়া ফেলিয়া স্নানাদি করার সুবিধা পাইলাম। খাদ্য ছিল প্রধানতঃ শুক্‌না ও টাট্‌কা ফল। শরীর প্রতিদিনই ভাল হইতে লাগিল। সুয়েজ খাল পর্য্যন্ত পঁহুছিতেই শরীর অনেক ভাল হইয়া গেল। যেমন যেমন শরীর একটু করিয়া ভাল হইতে লাগিল, তেমন তেমন আমি খানিকটা করিয়া ব্যায়াম বেশী করিতে লাগিলাম। শুদ্ধ হাওয়া এবং না-ঠাণ্ডা না-গরম এই রকল জলবায়ুর জন্যই আমার শরীরের এই পরিবর্ত্তন হইল বলিয়া মনে করি।

পূর্ব্বের অভিজ্ঞতার জন্যই হোক্, বা অন্য কারণেই হোক্, ইংরাজ যাত্রী ও আমাদের মধ্যে যে পার্থক্য এখন দেখিলাম, দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ইংলণ্ডে যাইতে তাহা দেখি নাই। সেখানেও ভেদ ছিল, কিন্তু এখানকার মত নয়। কোনও কোনও ইংরাজের সহিত কথা হইত কিন্তু তাহাও দূর হইতে নমস্কার করার মত। হৃদয় হইতে উহার সাড়া ছিল না। দক্ষিণ আফ্রিকাতে এবং দক্ষিণ আফ্রিকার ষ্টীমারেও হৃদয় হইতে মেলামেশা হইতে পারিত। এখানে ভেদ হওয়ার হেতু আমি এইরূপ বুঝি যে, এই ষ্টীমারের ইংরাজেরা মনে করেন, তাঁহারা রাজা আর ভারতীয়েরা তাঁহাদেরই কাছে পরাধীন। এই সংস্কার জ্ঞাতসারে ও অজ্ঞাতসারে কাজ করে।

এই আবেষ্টনের মধ্য হইতে কখন ছুটি পাইব, কখন দেশে পঁহুছিব, আমার মন তাহার জন্য ব্যাকুল হইয়া উঠিয়াছিল। এডেন পঁহুছিতে কতকটা দেশে আসার ভাব আসিল। আমি এডেনবাসী-

দিগকে বেশ জানিতাম। ভাই কেকোবাদ কাওয়াসজী দীনশা ডারবানে আসিয়াছিলেন, তাঁহার এবং তাঁহার স্ত্রীর সহিত আমার ভাল পরিচয় হইয়া গিয়াছিল। অল্পদিনেই আমরা বোম্বাই পঁহুছিলাম। যে দেশে ফিরিতে ১৯০৫ সাল হইতেই আশা করিয়া আসিতেছিলাম, দশ বৎসর পর সেই দেশে ফিরিতে আমার বড়ই আনন্দ হইতেছিল। গোখলে আমার অভ্যর্থনার ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন। তাঁহার শরীর অসুস্থ হইলেও তিনি এইজন্যই বোম্বাই আসিয়াছিলেন। তাঁহার কাছে আসিয়া, তাঁহার মধ্যে ডুবিয়া গিয়া, আমি আমার দায়িত্ব হইতে ছুটি লওয়ার আশায় বোম্বাই পঁহুছিয়াছিলাম, কিন্তু বিধাতা অন্য রকম ব্যবস্থা করিয়া রাখিয়াছিলেন।

৪৪
ওকালতীর স্মৃতি

ভারতবর্ষে আসার পর আমার জীবনের গতি কি ভাবে চলিতে লাগিল, সে বিষয় বর্ণনার পূর্ব্বে দক্ষিণ আফ্রিকার কিছু কিছু কথা, যাহা ইচ্ছা করিয়াই ইতিপূর্ব্বে বাদ দিয়াছি, তাহা লিখিব। কয়েকজন উকীল বন্ধু ওকালতী করার সময়ের এবং ওকালতীর কিছু কিছু স্মৃতি জানিতে চাহিয়াছেন। এই স্মৃতি এত বহুল যে, উহা লিখিতে গেলে একখানা বহি লেখা হইয়া যায়, আমি এই জীবনী লিখিতে যতটুকু সীমার ভিতর থাকিব স্থির করিয়াছি, তাহার বাহিরে চলিয়া যাইতে হয়। কিন্তু সত্যের প্রয়োগে যে সকল কথা আসিয়া পড়ে তাহার বর্ণনা অনুচিত হইবে না।

আমার যতদূর মনে আছে, আমি পূর্ব্বেই বলিয়াছি যে, ওকালতীতে আমি কখনও অসত্যের প্রয়োগ করি নাই। আমার ওকালতীর বেশীর ভাগ সেবার জন্যই নিয়োজিত হইয়াছিল, আর সেজন্য কেবল খরচা ভিন্ন আর কিছুই লইতাম না, কত সময় নিজের পয়সা দিয়াও মামলার খরচা চালাইতে হইত।

আমি মনে করিয়াছিলাম, আমার ওকালতী-সম্বন্ধে এইটুকু বলাই যথেষ্ট হইবে। কিন্তু বন্ধুগণ আরো বেশী জানিতে চান। তাঁহারা মনে করেন যে, আমি সত্য হইতে বিচ্যুত হই নাই এমন ঘটনার অল্প-স্বল্পও যদি আমি বর্ণনা করি, তবে তাহাতে উকীলদিগের উপকার হইবে।

উকীলের ব্যবসায় মিথ্যা না হইলে চালানো যায় না, এইকথাই ওকালতী পড়ার সময় শুনিতাম। কিন্তু মিথ্যা বলিয়া পয়সা লওয়া, বা সম্মান অর্জ্জন করা উভয়ের কোনটির জন্যই আমার লোভ ছিল না। সুতরাং শিক্ষাকালে ঐ কথা আমার উপর কোন প্রভাবও বিস্তার করিতে পারে নাই।

দক্ষিণ আফ্রিকায় ইহার পরীক্ষা অনেকবার হইয়াছে। আমি জানিয়াছি যে, বিরুদ্ধ-পক্ষের সাক্ষীদিগকে মিথ্যা শিখানো হইয়াছে, আর যদি আমি মক্কেল বা সাক্ষীকে নামমাত্রও মিথ্যা বলিতে উৎসাহিত করি, তাহা হইলেই মোকদ্দমার জিত হয়। কিন্তু আমি এই প্রকার লোভ সকল সময়ই জয় করিয়াছি। কেবল একটা মাত্র মোকদ্দমার কথা মনে পড়ে, যাহাতে আমার জিত হওয়ার পর সন্দেহ হয় যে, মক্কেল আমাকে মিথ্যা মোকদ্দমা দিয়াছিল। আমার অন্তরে সর্ব্বদা এই ভাব থাকিত যে, যদি মক্কেলের কেস সত্য হয় তবে যেন জিত হয়, যদি মিথ্যা হয় তবে যেন হার হয়। মোকদ্দমায় হার-জিতের উপর নির্ভর রাখিয়া ফী নির্দ্দিষ্ট করা হইত না। মোকদ্দমা হারিলেও আমার পারিশ্রমিক মাত্র লইতাম, জিতিলেও তাহাই লইতাম। মক্কেলদিগকে বলিয়া দিতাম যে, যদি মিথ্যা হয় তবে আমার কাছে আসিও না; সাক্ষীদিগকে শিখাইয়া দেওয়ার কাজ আমার নিকট হইতে প্রত্যাশা করিও না। অবশেষে এসম্বন্ধে আমার এমনি ধরণের খ্যাতি রটিয়া গিয়াছিল যে, মিথ্যা মোকদ্দমার মক্কেলরা আমার নিকট আসিতই না। বস্তুতঃ এমন মক্কেলও ছিল যাহারা তাহাদের সত্য মোকদ্দমাগুলিই আমার নিকট আনিত, আর যদি একটু মাত্রও মিথ্যা থাকিত, তাহা হইলে অন্য উকীলের নিকট লইয়া যাইত।

একবার এক ঘটনায় আমার খুব বড় পরীক্ষা হয়। এই মোকদ্দমা আমার সব চেয়ে ভাল মক্কেলের ছিল। মোকদ্দমাটি জটিল হিসাব সংক্রান্ত ও অনেক দিন হইতে চলিতেছিল। ইহার ভিন্ন ভিন্ন অংশ অনেক আদালতে চলিয়াছিল। অবশেষে ইহার হিসাব সম্বন্ধীয় অংশ কয়েকজন নামজাদা হিসাব-রক্ষক সালিশের হাতে দেওয়া হইয়াছিল। সালিশের নির্দ্ধারণ অনুসারে আমার মক্কেলেরই জিত হয়। কিন্তু সালিশের হিসাবে একটা ছোট অথচ মারাত্মক ভুল ছিল। জমার দিকের একটা অঙ্ক ভুলে খরচের দিকে লেখা হইয়াছিল। বিরুদ্ধ-পক্ষ এই সালিশী রদ করার জন্য দরখাস্ত করে। মক্কেলের পক্ষে আমি জুনিয়র উকীল ছিলাম। আমার সিনিয়র উকীলকে ঐ ভুল দেখানো হইলে তিনি বলিলেন যে, সালিশের ভুল স্বীকার করিতে আমার মক্কেল বাধ্য নয়। বিরুদ্ধ-পক্ষের কোনও সুবিধা স্বীকার করিতে কোনও উকীল বাধ্য নয়—ইহাই তাঁহার স্পষ্ট অভিমত ছিল। কিন্তু আমি বলিলাম, ভুল স্বীকার করাই সঙ্গত। সিনিয়র উকীল বলিলেন—"এমন করিলে কোর্ট সমস্ত সালিশী রদ করিয়া দিবে, এরূপ আশঙ্কা আছে। এতখানি বিপদের ভিতর, কোনও বুদ্ধিমান্ উকীল, মক্কেলকে ফেলে না। আমি এই ঝক্কি লইতে আদৌ রাজি নই। যদি মোকদ্দমার আবার নূতন শুনানী হয়, তাহা হইলে মক্কেলের কত খরচা হইবে বলা যায় না, আর পরিণামই বা কি হইবে তাহাও বলা যায় না।"

এই কথাবার্ত্তার সময় মক্কেল উপস্থিত ছিলেন। আমি বলিলাম—"মক্কেল ও আপনার, দুই জনেরই এই ঝক্কি লইতে হয়। আপনি স্বীকার না করিলেও, কোর্ট ঐ ভুল-যুক্ত নির্দ্ধারণ ভুল জানিয়াও যে বহাল রাখিবে, তাহারই বা নিশ্চয়তা কি? আর ভুল শুদ্ধ করিতে

গিয়া যদি মক্কেলের ক্ষতিই হয়, তাহা হইলেই বা আপত্তি কি ?” প্রধান উকীল বলিলেন—“কিন্তু আমরা কেনই বা ভুল স্বীকার করিব ?”

আমি জবাব দিলাম—“আমরা ভুল স্বীকার না করিলেও, কোর্ট নিজেই ভুল ধরিতে পারিবে না, অথবা বিরুদ্ধ পক্ষ খেয়াল করিবে না, তাহারই বা নিশ্চয়তা কোথায় ?”

সিনিয়র উকীল দৃঢ়তার সহিত বলিলেন—“তাহা হইলে আপনিই এই মোকদ্দমায় সওয়াল-জব (শেষ যুক্তি) কোর্টে করিবেন, ভুল স্বীকার করার সর্ত্তে আমি ইহাতে হাজির হইতে প্রস্তুত নই।”

আমি নম্রভাবে বলিলাম—“যদি আপনি না দাঁড়ান, আর যদি মক্কেল ইচ্ছা করে, তবে আমি দাঁড়াইতে প্রস্তুত আছি। ভুল স্বীকার না করিলে, আমার দ্বারা এই মোকদ্দমা চালানো অসম্ভব।”

এই বলিয়া, আমি মক্কেলের দিকে তাকাইলাম। তিনি একটু মুস্কিলে পড়িলেন। এই মোকদ্দমায় আমি প্রথম হইতেই ছিলাম। মক্কেলের আমার উপর সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল। আমার স্বভাবও তিনি সম্পূর্ণরূপে জানিতেন। তিনি বলিলেন—“ভাল, তাহা হইলে আপনিই আদালতে দাঁড়াইবেন, ভুল স্বীকার করিবেন। হারা যদি কপালে থাকে তবে হার হইবে। সত্যের দিকেই ঈশ্বর ত আছেন ?”

আমি স্বীকৃত হইলাম। মক্কেলের নিকট হইতে আমি অন্য উত্তর আশা করি নাই। সিনিয়র উকীল আমাকে আর একবার সাবধান করিলেন, আমার জেদের জন্য আমার প্রতি কৃপা করিয়া আমাকে ধন্যবাদও দিলেন।

আদালতে কি হইল তাহা পরে বলিতেছি।

৪৫

চালাকী

আমার পরামর্শ যে ঠিক, সেবিষয়ে আমার অণুমাত্রও সন্দেহ ছিল না। কিন্তু এই মোকদ্দমায় ন্যায় বিচার পাওয়াইয়া দেওয়ার পক্ষে আমার সামর্থ্য সম্বন্ধে আমার খুবই সন্দেহ ছিল। এমন কঠিন মোকদ্দমায় সুপ্রীমকোর্টে সওয়াল-জব (argue) করা আমার খুবই বিপদ-জনক বোধ হইয়াছিল। সেইজন্য কম্পিতচিত্তে আমি বিচারকের সাম্‌নে সওয়াল-জব করিতে দাঁড়াইলাম।

ঐ ভুলের কথার উল্লেখমাত্রই একজন জজ বলিয়া উঠিলেন—"ইহাকে চালাকী বলে না?"

আমি অন্তরে অন্তরে জ্বলিয়া উঠিলাম। যেখানে চালাকীর নামগন্ধও কিছু নাই, সেখানে চালাকীর সন্দেহ করা অসহ্য বোধ হইল। 'প্রথম হইতেই যেখানে জজের মন বিরুদ্ধ হইয়া আছে, সেখানে এমন কঠিন মোকদ্দমা কেমন করিয়া জিতিব?'—আমি মনে মনে এইরূপ চিন্তা করিতে লাগিলাম।

আমি রোষ দমন করিয়া, শান্ত হইয়া জবাব দিলাম—"আমার আশ্চর্য্য বোধ হইতেছে যে, আপনি সবটা না শুনিয়াই আমার প্রতি চালাকীর আরোপ করিলেন!"

"আমি আরোপ করি নাই, কেবল আশঙ্কার উল্লেখ করিলাম"—জজ বলিলেন।

চালাকী

"আপনার শঙ্কা আমার নিকট দোষ আরোপ করার মতই লাগিতেছে। আপনি সবটা শুনিয়া যদি সন্দেহ উপস্থিত হয় তবে সে কথা উঠাইবেন।"

আমি এই উত্তর দিলাম। জজ শান্ত হইয়া বলিলেন—"কথার মাঝখানে আপনাকে বাধা দেওয়ায় দুঃখবোধ করিতেছি, আপনার বক্তব্য বলিয়া যান।"

আমার নিকট খোলাসা করার মত যুক্তি অনেক ছিল। প্রথমেই ঐ সন্দেহ উঠায়, আমার যুক্তির উপর জজের মনোযোগ দৃঢ়বদ্ধ রাখিতে পারিব বলিয়া আমার সাহস আসিল এবং তাঁহাকে অবাধে বুঝাইতে পারিলাম। জজ ধৈর্য্যসহকারে শুনিলেন এবং তিনি বুঝিলেন যে, ঐ ভুল অনিচ্ছাকৃত ও অনেক পরিশ্রমে যে হিসাব তৈরী হইয়াছিল তাহা ইহার জন্য রদ করা যায় না।

বিরুদ্ধ-পক্ষের উকীলের বিশ্বাস হইয়াছিল যে, এই ভুল স্বীকারের পর তাঁহার আর বেশী যুক্তি-তর্ক করিতে হইবে না। কিন্তু জজ এই স্পষ্ট অথচ যাহা সহজেই শুদ্ধ করা যায় এমন ভুলের জন্য সালিশের নির্দ্ধারণ রদ করিতে প্রস্তুত হইলেন না। প্রতিপক্ষের উকীল অনেক মাথা কুটিলেন, কিন্তু পূর্ব্বে জজের যেখানে যেখানে সন্দেহ হইয়াছিল সেখানে এখন তিনি আমারই দিকে ঝুঁকিয়া পড়িলেন।

জজ বলিলেন—"যদি গান্ধী ভুল স্বীকার না করিতেন, তবে আপনি কি করিতেন?"

তিনি বলিলেন—"যে হিসাব-পরীক্ষককে নিযুক্ত করিয়াছিলাম, তাহার অপেক্ষা ভাল বিশেষজ্ঞ আর কোথায় পাইব?"

"আপনি আপনার মক্কেলের দিকটা ভাল করিয়াই জানেন, ইহা ত

আমাকে মানিয়া লইতে হইবে। ঐ ভুল ব্যতীত আর কোনও ভুল যদি না দেখাইতে পারেন, তবে একটা স্পষ্ট ভুলের জন্য উভয় পক্ষকে আবার প্রথম হইতে খরচার মধ্যে ফেলিতে পারি না। সুতরাং আপনি যে এই মোকদ্দমা আবার নূতন করিয়া আরম্ভ করিতে বলিতেছেন তাহা সম্ভবপর নয়।"

এই ধরণের অনেক কথায় প্রতিপক্ষের উকীলকে শান্ত করিয়া, ভুল শুদ্ধ করিয়া, অথবা ভুল শুদ্ধ করার হুকুম সালিশের উপর দিয়া ঐ শুদ্ধ নির্দ্ধারণই বহাল রাখিলেন।

আমার অপার আনন্দ হইল। মক্কেল ও সিনিয়র উকীল সন্তুষ্ট হইলেন। ওকালতীতে সত্য ত্যাগ না করিয়াও কাজ চলে এই বিশ্বাস আমার দৃঢ় হইল।

ব্যবসার জন্য ওকালতী করার ভিতর মূলগত যে দোষ রহিয়াছে তাহা এই সত্যপালনের দ্বারাও যে দূর করা যায় না, একথাও পাঠকদিগকে স্মরণ রাখিতে হইবে।

২৬

মক্কেল সাথী হইলেন

নাতাল ও ট্রান্সভালে ওকালতীতে একটা পার্থক্য ছিল। নাতালে এটর্নী ও এড্‌ভোকেটে ভেদ ছিল, কিন্তু তাহা থাকিলেও উহারা উভয়েই সকল কোর্টেই ওকালতী করিতে পারিত। ট্রান্সভালে বোম্বাইয়ের মত প্রভেদ ছিল। সেখানে এড্‌ভোকেট এটর্নীর হাত দিয়াই মক্কেলের সহিত কাজ করিতে পারে। কেহ ব্যারিষ্টার হইয়া আসিলে, সে ইচ্ছামত এটর্নী বা এড্‌ভোকেট হইতে পারে। নাতালে আমি এড্‌ভোকেট ছিলাম, ট্রান্সভালে এটর্নীর সার্টিফিকেট লইয়াছিলাম। এখানে এড্‌ভোকেট হইলে, আমি ভারতীয়দের সহিত সোজাসুজি সম্পর্কে আসিতে পারিতাম না; আর গোরা এটর্নীরা আমাকে মোকদ্দমা দিবে, দক্ষিণ আফ্রিকা এমন স্থান নয়।

ট্রান্সভালে এটর্নীরা ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে মোকদ্দমা করিতে পারিত, আমি অনেকবার ম্যাজিষ্ট্রেটের কোর্টে উপস্থিত হইয়াছি। এইরূপ একবার কোর্টে মোকদ্দমা চলিতেছে, তখন দেখি যে আমার মক্কেল আমাকে ঠকাইয়াছে। তাহার মোকদ্দমা মিথ্যা। কাঠগড়ায় উঠিয়া সে একেবারে দমিয়া গেল, তখন আমি উঠিয়া, ম্যাজিষ্ট্রেটকে আমার মক্কেলের বিরুদ্ধে রায় দিতে বলিয়া বসিয়া পড়িলাম। প্রতিপক্ষের উকীল আশ্চর্য্য হইল। ম্যাজিষ্ট্রেট খুসী হইলেন। মক্কেল জানিতেন যে, আমি মিথ্যা মোকদ্দমা লই না। তিনি ইহা স্বীকার করিলেন এবং ম্যাজিষ্ট্রেটকে যে বিপক্ষে রায় দিতে বলিয়াছিলাম তাহাতে তিনি আমার

উপর রুষ্ট হইয়াছিলেন বলিয়া মনে হয় না। যাহাই হোক্, আমার এই ব্যবহারের ফলে, আমার ব্যবসার কোনও ক্ষতি হয় নাই। কোর্টেও আমার কাজ সহজ হইয়াছিল। আমি ইহাও দেখিলাম যে, সত্যের প্রতি আমার এই নিষ্ঠা দেখিয়া, আইন-ব্যবসায়ীদিগের মধ্যে আমার প্রতিষ্ঠা বাড়িয়াছিল এবং তাঁহাদের সহিত আমার সম্পর্ক বিচিত্র রকমের হইলেও, কাহারও কাহারও সহিত প্রীতির সম্বন্ধেও বদ্ধ হইতে পারিয়াছিলাম।

ওকালতী করার সময় আমার এই অভ্যাস হইয়াছিল যে, আমার অজ্ঞতার বিষয় আমি, কি মক্কেলের নিকট, কি উকীলের নিকট লুকাইতাম না, যাহা আমি বুঝিতাম না, সে সব স্থানে আমি মক্কেলকে অপর উকীলের নিকট যাইতে বলিতাম, আর যদি আমাকেই নিয়োগ করিতে চাহে, তবে অভিজ্ঞ উকীলের সাহায্য লইয়া কাজ করিব বলিতাম। এই প্রকার খোলা ব্যবহারের জন্য আমি মক্কেলদের অফুরন্ত প্রেম ও বিশ্বাসভাজন হইয়াছিলাম। সিনিয়র উকীলের সহিত পরামর্শ করিতে যে খরচ হইত, তাহা মক্কেলেরা সন্তুষ্ট-চিত্তেই দিত। তাহাদের ঐ প্রেম ও বিশ্বাস আমার জন-সেবার ব্যাপারে খুব কাজে আসিয়াছিল।

পূর্ব্বে আমি জানাইয়াছি যে, দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমি কেবল লোক সেবার জন্যই ওকালতী করিতাম। এই সেবা করিতে হইলে, আমার প্রতি লোকের বিশ্বাস থাকা আবশ্যক ছিল। উদার-হৃদয় ভারতীয়েরা আমি পয়সা লইয়া কাজ করিলেও, আমার সে কাজ সেবা বলিয়া মনে করিত। যখন তাহাদিগকে তাহাদের অধিকার রক্ষার জন্য জেলের দুঃখ সহ্য করিতে বলিয়াছি, তখন তাহাদের মধ্যে অনেকেই জ্ঞানপূর্ব্বক

এই অনুসারে কাজ করা অপেক্ষা, আমার প্রতি তাহাদের শ্রদ্ধা ও প্রেম বশতঃই সে দুঃখ বরণ করিয়াছে।

এই কথা লিখিতে লিখিতে আমার ওকালতীর দিনের অনেক মধুর স্মৃতি জাগিয়া উঠিতেছে। শত শত মক্কেল বন্ধু ও সহযোগী হইয়া সাধারণের সেবায় আমার সঙ্গী হইয়াছিলেন এবং আমার কঠোর জীবনকে তাঁহারা রসময় করিয়া তুলিয়াছিলেন।

৪৭

মক্কেল জেলে গেল না

পার্শী রস্তমজীর নাম পাঠক ভালরকম জানেন। পার্শী রস্তমজী একই সময়ে আমার জনহিতকর কার্য্যের সঙ্গী ও মক্কেল হইয়াছিলেন, অথবা এমনও বলা যায় যে, তিনি প্রথমেই সাথী হইয়াছিলেন, পরে মক্কেল হন। তিনি আমাকে এত বিশ্বাস করিতেন যে, নিজের গোপনীয় ঘরোয়া কথাতেও আমার পরামর্শ লইতেন ও তাহা অনুসরণ করিতেন। তাঁহার অসুখ হইলে আমার পরামর্শ লইতেন এবং জীবনযাত্রায় আমাদের মধ্যে অনেক ভেদ থাকিলেও নিজের চিকিৎসার বেলায় আমারই চিকিৎসা-পদ্ধতির প্রয়োগ করিতেন।

আমার এই সাথীর উপর এক সময় বড় বিপদ্ আসিয়া পড়িল। যদিও তিনি নিজের ব্যবসার সকল কথাই বলিতেন, তথাপি একটা কথা তিনি আমার কাছে গোপন করিয়া গিয়াছিলেন। তিনি বোম্বাই ও কলিকাতা হইতে মাল আমদানী করিতেন। ইহাতে তিনি 'ঘাটচুরি' করিতেন, অর্থাৎ অবৈধভাবে, বিনাশুল্কে মাল লইয়া আসিতেন। তাঁহার সহিত সকল কর্ম্মচারীর ভাল পরিচয় থাকায়, তাঁহার উপর কেহ সন্দেহ করিত না। তিনি যে চালান দিতেন, তাহারই উপর শুল্ক ধার্য্য করা হইত। কর্ম্মচারীদের মধ্যে হয়ত কেহ কেহ জানিয়া শুনিয়াও চোখ বুঁজিয়া এইকাজ চলিতে দিতেন।

'আখো' নামে কবির উক্তি ফলিয়া গেল। তিনি বলিয়াছেন—

"পারা চাপিতে করে যতন, তেমনি হয় চুরির ধন।"

পারা যেমন চাপিয়া রাখা যায় না, এদিকে সেদিকে ছুটিয়া পলায়, চুরিও তেমনি চিরদিন গুপ্ত থাকে না। পার্শী রস্তমজীর চুরি ধরা পড়িল। আমার কাছে দৌড়াইয়া আসিলেন, চোখে তাঁহার জল ঝরিতেছে। রস্তমজী বলিলেন—"ভাই, আমাদ্বারা আপনি প্রতারিত হইয়াছেন। আজ আমার পাপ প্রকাশ হইয়া পড়িয়াছে। আমি গোপনে মাল আমদানী করিতাম; এখন আমার অদৃষ্টে জেল আছে। এইবার আমার সর্ব্বনাশ হইবে। এই বিপত্তিতে এক আপনিই আমাকে বাঁচাইতে পারেন। আমি আপনার নিকট কোনও কথাই গোপন করি না, কিন্তু ব্যবসার ভিতরকার চুরির কথা কেমন করিয়া বলা যায়, এই মনে করিয়া এই চুরির কথা আপনাকে বলি নাই। এখন অনুতাপ হইতেছে।"

আমি ধৈর্য্য রাখিয়া বলিলাম—"আমার ধরণ ত আপনি জানেন, খালাস হওয়া আর না হওয়া ঈশ্বরের হাত। দোষ স্বীকার করিলে যদি মুক্তি পাওয়া যায়, তাহা হইলেই আমি খালাস করিতে পারি।"

পার্শী মহাশয় বড়ই দুঃখার্ত্ত হইয়া পড়িলেন। রস্তমজী শেঠ বলিলেন—"আপনার নিকট স্বীকার করিলাম, ইহাই কি যথেষ্ট নহে?"

"আপনি অপরাধ করিয়াছেন সরকারের নিকট, আমার নিকট স্বীকার করিলে কি লাভ?"—আমি মৃদুস্বরে এই কথা তাঁহাকে বলিলাম।

রস্তমজী বলিলেন—"আপনি যাহা বলিতেছেন, অবশেষে তাহা ত করিতেই হইবেই; কিন্তু আমার পুরানো উকিল আছেন, একবার তাঁহার পরামর্শ লইবেন ত? তিনি আমার বন্ধুও।"

অনুসন্ধান করিয়া জানিলাম যে, অনেক দিন হইল এই চুরি

চলিতেছে। যে চুরিটা ধরা পড়িয়াছে উহা ত সামান্য। পুরানো উকীলের কাছে আমরা গেলাম। তিনি মোকদ্দমা বুঝিলেন। "এই মোকদ্দমা জুরীর নিকট হইবে, আর জুরী কি ভারতীয় আসামীকে ছাড়িবে? তবে আমি আশা ছাড়িব না।"—উকীল এই কথা বলিলেন।

ইঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় ছিল না। তাঁহাকে পার্শী রস্তমজী বলিলেন—"আপনাকে ধন্যবাদ দিতেছি; এই মোকদ্দমা মিঃ গান্ধীর পরামর্শ অনুসারেই চালাইব। ইঁহার সহিত আমার ঘনিষ্ঠ পরিচয় আছে। আপনার যাহা পরামর্শ দেওয়ার, ইঁহাকে দিবেন।"

উকীলের সহিত কাজ এই প্রকারে সারিয়া, আমরা রস্তমজী শেঠের দোকানে গেলাম।

আমি বুঝাইলাম—"এই মোকদ্দমা কোর্টে যাওয়ার মত মনে করি না। মোকদ্দমা করা না-করা, প্রধান কর্মচারীর হাতে। তাঁহাকে গবর্ণমেণ্টের প্রধান উকীলের পরামর্শ লইয়া চলিতে হইবে। আমি এই দুইজনের সহিত দেখা করিতে প্রস্তুত আছি। তাঁহারা কি করিবেন জানি না, তবে এই চুরি স্বীকার করিতে হইবে; তাঁহারা যে অর্থ-দণ্ড করেন, তাহা দিতে প্রস্তুত হইতে হইবে। সম্ভবতঃ, তাঁহারা এইরূপ করিতে সম্মত হইবেন। কিন্তু যদি না মানেন, তবে জেলে যাইবার জন্য তৈরী হইতে হইবে। আমার মতে লজ্জা ত জেলে যাওয়ায় নাই, লজ্জা চুরি করায়। লজ্জার কাজ যাহা তাহা ত হইয়াই গিয়াছে। জেলে যাইতে হয় ত প্রায়শ্চিত্ত করা হইল মনে করিতে হইবে। সত্য সত্য প্রায়শ্চিত্ত ত ভবিষ্যতে আর 'ঘাট-চুরি' না করার প্রতিজ্ঞা লওয়া।"

এই সকল কথা রস্তমজী যে ঠিকমত বুঝিয়াছিলেন, তাহা বলিতে

পারি না। তিনি সাহসী পুরুষ, কিন্তু এই সময়টা দমিয়া গিয়াছিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠা নষ্ট হওয়ার সময় উপস্থিত। এত চেষ্টায় যাহা গড়িয়া তুলিয়াছেন, আজ তাহা বিসর্জ্জন দিয়া কোথায় যাইবেন ?

তিনি বলিলেন—"আপনার হাতে ত আমি নিজেকে ফেলিয়া দিয়াছি, এখন আপনার যেমন করিতে হয় করিবেন।"

এই মোকদ্দমায় আমার বিনয়-প্রকাশের শক্তি প্রাণ খুলিয়া ব্যবহার করিয়াছিলাম। আমদানীর কর্ম্মচারীর সহিত দেখা করিলাম। সমস্ত চুরির কথা নির্ভয়ে তাঁহাকে বলিলাম। সমস্ত খাতাপত্র দেখিতে বলিলাম ও রস্তমজীর অনুতাপের কথা বলিলাম।

তিনি বলিলেন—"বুড়া পার্শীকে আমি জানি, কাজটা মুর্খের মত করিয়াছেন। কিন্তু আমার কর্ত্তব্য কি তাহাও আপনি জানেন ; সরকারী প্রধান উকীল যাহা বলেন, আমাকে তেমনি করিতে হইবে। তাঁহাকে অনুনয় বিনয় করিয়া আপনাকে বুঝাইতে হইবে।"

আমি বলিলাম—"পার্শী রস্তমজীকে আদালতে ঠেলিয়া দেওয়ার জন্য যদি আপনি জেদ না করেন, তাহা হইলেই আমি খুসী হইব।" ইঁহার নিকট হইতে এই বিষয়ে অভয়-বাক্য পাইয়া, আমি প্রধান সরকারী উকিলের সহিত পত্র-ব্যবহার করিতে লাগিলাম। তাঁহার সহিত দেখা করিলাম। তিনি আমার সত্যপ্রিয়তা বুঝিতে পারিলেন ; আমি যে কিছুই লুকাই নাই তাহা তিনি দেখিতে পাইলেন। ইহার পর অন্য কোনও এক মোকদ্দমায় তাঁহার নিকট উপস্থিত হইলে তিনি বলিয়াছিলেন যে, আপনি 'না' জবাব ত লইবেনই না।

রস্তমজীর বিরুদ্ধে মোকদ্দমা চালানো হইল না। তিনি যত টাকা

এপর্য্যন্ত ঠকাইয়াছেন বলিয়া স্বীকার করিলেন, তাহার দুইগুণ টাকা লইয়া মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়ার হুকুম দেওয়া হইল।

রস্তমজী শেঠের সম-ব্যবসায়ী বন্ধুরা আমাকে এই বলিয়া সাবধান করিলেন যে, ইহা রস্তমজীর সত্য বৈরাগ্য নয়, ইহা তাঁহার 'শ্মশান-বৈরাগ্য'। ইহা কতকদূর সত্য, তাহা আমি জানি না। একথা কিন্তু আমি রস্তমজীকে বলিলে তিনি উত্তর দিলেন—"আপনাকেও যদি ঠকাই তাহা হইলে আমার স্থান কোথায়?"

আত্মকথা অথবা সত্যের প্রয়োগ

পঞ্চম ভাগ

১

প্রথম অভিজ্ঞতা

ফিনিক্স হইতে যে দলের আসার কথা ছিল, আমি দেশে পঁহুছার পূর্ব্বেই সে দল পঁহুছিয়াছিল। আমরা ধরিয়া রাখিয়াছিলাম যে, আমি আগে দেশে পঁহুছিব। আমি যুদ্ধের জন্য লণ্ডনে আটকাইয়া পড়ায়, এই দলের লোককে কোথায় রাখা যায় সে এক সমস্যা হইল। সকলে একসঙ্গে থাকিয়া যদি ফিনিক্সের ন্যায় জীবন-যাপন করিতে পারে, তাহা হইলে ভাল হয়। দেশের কোনও আশ্রম-পরিচালকের সহিত পরিচয় ছিল না যে, তাহাদিগকে সেইখানে যাইতে বলিব। সেই জন্য, আমি তাহাদিগকে এণ্ড্রুজের সহিত দেখা করিয়া, তাঁহার নির্দ্দেশ অনুসারে চলিতে বলিলাম।

তাহাদিগকে প্রথমে রাখা হয় কাঙ্গড়ী গুরুকুলে। সেখানে স্বর্গীয় শ্রদ্ধানন্দজী ইহাদিগকে নিজ সন্তানের মত রাখিয়াছিলেন। তারপর তাহাদিগকে শান্তি-নিকেতনে রাখা হয়। সেখানে কবিবর ও তাঁহার লোকজন তাহাদিগকে অসামান্য ভালবাসায় আপ্লুত করিয়া রাখেন। এই দুই জায়গায় তাহারা যে অভিজ্ঞতা পাইয়াছিল, তাহা তাহাদের ও আমার বড়ই উপকারে আসিয়াছিল।

কবিবর, শ্রদ্ধানন্দজী ও শ্রীযুত সুশীল রুদ্র,—আমি বলিতাম, ইঁহারা ছিলেন এণ্ড্রুজের ত্রিমূর্ত্তি। দক্ষিণ আফ্রিকায় তিনি এই তিন জনের প্রশংসা করিয়া আর ক্লান্ত হইতেন না। এই তিন মহাপুরুষের নাম তাঁহার কাছে দিবারাত্র শুনিয়াছি ; সেই সুখ-স্মৃতি দক্ষিণ আফ্রিকার

অনেক স্নেহময় স্মৃতির মধ্যে আমার চিত্ত-পটে অঙ্কিত হইয়া আছে। সুশীল রুদ্রের সহিতও এণ্ড্রুজ ছেলেপেলেদের পরিচয় করাইয়া দিলেন। রুদ্র মহাশয়ের আশ্রম ছিল না, কিন্তু নিজ বাড়ী ছিল; সেই বাড়ীই তিনি আমার পরিবারের হাতে একেবারে ছাড়িয়া দিলেন। তাঁহার ছেলেপেলেরা ইহাদের সহিত একদিনেই এত মিশিয়া গেল যে, তাহারা যেন ফিনিক্স ভুলিয়া গেল।

আমি যখন বোম্বাই আসিয়া পঁহুছিলাম, তখন সংবাদ পাইলাম যে, আমার পরিবারের লোকেরা শান্তিনিকেতনে আছে। আমি গোখলের সহিত দেখা করিয়া সেখানে যাওয়ার জন্য অধীর হইলাম।

বোম্বাইয়ে অভ্যর্থনা পাওয়ার সময় আমার এক ছোট রকম সত্যাগ্রহ করিতে হইয়াছিল। মিঃ পেটিট সেখানে আমার অভ্যর্থনার সমস্ত ব্যবস্থা করিয়াছিলেন, সেখানে তাহাদের নিকট গুজরাটীতে জবাব দেওয়ার আমার সাহস হয় নাই। তাঁহার বাসভবনের ঐশ্বর্য্য ও চাকচিক্যের মধ্যে, 'গিরমিটিয়া' মজুরদের সঙ্গী গেঁয়ো চাষা বলিয়া আমি নিজেকে বোধ করিতে লাগিলাম। আজ আমি যাহা পরি, তাহার তুলনায় তখন যাহা পরিতাম—কাথিয়াওয়াড়ী জামা, পাগড়ী ও ধুতি, তাহা অনেক সভ্য চেহারার বলা যায়। কিন্তু সেই রাজপ্রাসাদে, সেই পারিপাট্যের মধ্যে, আমার খাপছাড়া বোধ হইতেছিল। সেখানে যেমন তেমন করিয়া আমার কর্ত্তব্য সম্পাদন করিলাম। সেখানে মিঃ ফিরোজশা মেহ্‌তার আশ্রয়ের আড়াল পাইয়াছিলাম।

গুজরাটীদেরও ত একটা অভ্যর্থনা দেওয়া চাই। ৺ উত্তমলাল ত্রিবেদী এক সম্মেলন আহ্বান করিলেন। এই সম্মেলনের কতকটা কার্য্য-ক্রম আমি পূর্ব্বেই জানিয়াছিলাম। গুজরাটী বলিয়া মিঃ

জিন্নাও সেখানে উপস্থিত ছিলেন। তিনিই সভাপতি ছিলেন অথবা প্রধান বক্তা ছিলেন তাহা আমি ভুলিয়া গিয়াছি। তিনি সংক্ষেপে ও মধুর বাক্যে ইংরাজীতে বক্তব্য বলিলেন। যতটা মনে আছে অন্য বক্তৃতাও ইংরাজীতেই হইয়াছিল। যখন আমার উত্তর দেওয়ার সময় আসিল, তখন আমি গুজরাটীতেই বলিলাম এবং হিন্দুস্থানী ও গুজরাটী ভাষার প্রতি আমার পক্ষপাত আমি অল্প কথায় ব্যক্ত করিয়া, গুজরাটী সভায় যাহারা ইংরাজী ভাষা ব্যবহার করেন তাঁহাদের নিকট সবিনয়ে আমার বিরুদ্ধ মত জানাইলাম। এই প্রকার বলিতে অবশ্যই আমার মনে সঙ্কোচ হইয়াছিল। দীর্ঘ দিন প্রবাসের পর ফিরিয়া, অনভিজ্ঞ ব্যক্তির পক্ষে প্রচলিত রীতির বিরুদ্ধে বলা অবিবেকীর কার্য্য যদি ইঁহারা বিবেচনা করেন, এরূপ আমার মনে হইতেছিল। কিন্তু আমি যে সাহসের সহিত গুজরাটীতেই উত্তর দিলাম, তাহাতে কেহ অসন্তুষ্ট হন নাই এবং আমার বিরুদ্ধ মতও সকলেই স্বীকার করিয়া লইয়াছিলেন। ইহাতে আমি সন্তুষ্ট হইয়াছিলাম এবং আমার অন্যান্য সিদ্ধান্তও জনসাধারণের নিকট যে ক্লেশকর হইবে না, তাহার আভাসও আমি এই সভাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

বোম্বাইয়ে দুই এক দিন থাকিয়া তখনকার মত কিছু অভিজ্ঞতা সঞ্চয় করিয়া গোখলের আজ্ঞানুসারে পুনায় গেলাম।

২

গোখলের সহিত পুনায়

আমি বোম্বাই পঁহুছামাত্রই গোখলে আমাকে সংবাদ দিলেন যে, গভর্ণর আমার সহিত দেখা করিতে ইচ্ছা করেন, পুনায় রওনা হওয়ার পূর্ব্বেই তাঁহার সহিত দেখা করিয়া আসা মন্দ নয়। আমি গভর্ণরের সহিত দেখা করিলাম। কুশল-প্রশ্ন জিজ্ঞাসার পর তিনি বলিলেন—

"একটা কথা আপনাকে বলিতেছি। সরকারের বিরুদ্ধে যদি আপনাকে কখনও যাইতে হয়, তাহা হইলে আমার সাথে প্রথমে দেখা করিয়া, কথা বলিয়া, তারপর যাহা হয় করিবেন।"

আমি জবাব দিলাম –"এ কথা আমি সহজেই আপনাকে দিতে পারি। সত্যাগ্রহী-হিসাবে আমার নিয়ম এই যে, কাহারো বিরুদ্ধে দাঁড়াইতে হইলে, তাহার দৃষ্টিতে জিনিষটা জানা ও যতটা তাহার অনুকূল হওয়া যায় তাহার চেষ্টা করা। দক্ষিণ আফ্রিকায় এই নিয়ম সব সময়েই পালন করিয়াছি ও এখানেও তাহাই করিব।"

লর্ড উইলিংডন ধন্যবাদ দিয়া বলিলেন,—

"আপনার যখনই দেখা করিতে ইচ্ছা হয়, তখনই দেখা করিতে পারিবেন, আমার গভর্ণমেণ্ট ইচ্ছা করিয়া কোনও অনিষ্ট করিতে চায় না, ইহা আপনি দেখিতে পাইবেন।"

আমি বলিলাম—"এই বিশ্বাসের উপরই আমি নির্ভর করিয়া চলিতেছি।" পুনায় পঁহুছিলাম। সেখানকার সমস্ত কথা বলার সামর্থ্য

আমার নাই। গোখলে ও সোসাইটীর সভ্যেরা আমাকে প্রেমে অভিষিক্ত করিলেন। আমার স্মরণ আছে যে, আমাকে প্রীতি দেখাইতে অনেক সভ্যকে পুনায় ডাকিয়া আনা হইয়াছিল। সকলের সহিতই নানা বিষয়ে হৃদয় খুলিয়া কথাবার্ত্তা হইল। গোখলের অতিশয় ইচ্ছা ছিল যে, আমি সোসাইটীর সভ্য ভুক্ত হই। আমার ইচ্ছা ত ছিলই। কিন্তু সভ্যদের কাছে বোধ হইল যে, সোসাইটীর আদর্শ ও কার্য্যপদ্ধতি আমার পদ্ধতি অপেক্ষা ভিন্ন। সেইজন্য আমার সভ্য হওয়া উচিত কিনা সে বিষয়ে সন্দেহ ছিল। গোখলে বলিলেন—"তোমার মধ্যে তোমার নিজের আদর্শ অনুযায়ী চলার যেমন ইচ্ছা আছে, অপরের আদর্শ মানিয়া তাহার সহিত মিশিয়া কাজ করাও তেমনি তোমার স্বভাব। কিন্তু আমাদের সভ্যদের নিকট তোমার এই অপরের আদর্শ সম্মান করার স্বভাব পরিচিত নয়। তাঁহাদেরও নিজের আদর্শ ধরিয়া থাকারই স্বভাব এবং তাঁহারা সম্পূর্ণ স্বাধীন-মতাবলম্বী। আমি ত আশা করি যে, তাঁহারা তোমাকে সভ্য বলিয়া গ্রহণ করিবেন। আর যদি স্বীকার না করেন, তবুও একথা মনে করিও না যে, তোমার প্রতি তাঁহাদের প্রেম বা প্রীতি কিছু কম। এই প্রেম-ধারা সমানভাবে যাহাতে বহিতে পারে সেইজন্যই তাঁহারা কোনও ঝুঁকি লইতে ভয় পান। তবে তুমি সোসাইটীর নিয়ম মত সভ্য হও আর নাই হও, আমি তোমাকে সভ্য বলিয়াই গণ্য করিব।"

আমার কল্পনা আমি তাঁহাকে বলিলাম। বলিলাম—"সোসাইটীর সভ্য হই আর নাই হই, আমার এক আশ্রম করিয়া ফিনিক্সের সাথীদিগকে লইয়া সেখানে বসিয়া যাইতে হইবে। গুজরাটী বলিয়া গুজরাটের ভিতর দিয়াই সেবা করা উচিত মনে করি। এই জন্য গুজরাটেই

কোথাও বসিবার ইচ্ছা হইতেছে। গোখলের এ প্রস্তাব ভাল লাগিল। তিনি বলিলেন—"তুমি অবশ্যই উহা করিবে, সভ্যদের সহিত কথা-বার্ত্তার ফল যাহাই হোক্, তোমার আশ্রমের জন্য যাহা আবশ্যক তাহা আমার নিকট হইতে লইও, উহা আমারই আশ্রম বলিয়া আমি গণ্য করিব।"

আমার হৃদয় ভরিয়া উঠিল। টাকা তোলার চেষ্টা হইতে আমার মুক্তি হইল মনে করিলাম। আমি খুব সন্তুষ্ট হইলাম। আমার আর একেলা দায়িত্ব লইতে হইবে না এবং প্রত্যেক অসুবিধাতেই একজন পথ-প্রদর্শক পাইব এই বিশ্বাসে আমার উপর হইতে গুরুভার নামিয়া গেল বলিয়া মনে হইল।

৺ডাক্তার দেবকে ডাকিয়া গোখলে বলিয়া দিলেন—"গান্ধীর হিসাব আমাদের খাতায় তুলিয়া নিন। তাঁহার আশ্রমের জন্য ও সাধারণের সেবার জন্য যে ব্যয় লাগে তাহা আপনি দিতে থাকিবেন।"

পুনা ত্যাগ করিয়া এখন শান্তিনিকেতনে যাইবার জন্য তৈরী হইতে লাগিলাম। শেষের রাত্রিতে গোখলে, তাঁহার নিজের যে সকল বন্ধুর আমাকে ভাল লাগে, তাঁহাদিগকে লইয়া এক পার্টি দিলেন। উহাতে আমার পছন্দমত মেওয়া ও টাট্‌কা ফলই খাদ্য-স্বরূপে রাখা হইয়াছিল। এই পার্টি তাঁহার ঘরের কয়েক পা দূরেই হইয়াছিল, তথাপি তাঁহার এতটুকু চলিয়া আসার সামর্থ্য ছিল না। কিন্তু আমার জন্য তাঁহার ব্যাকুলতা রোগের নিষেধ মানিতে চাহে নাই, তিনি আসিতে জেদ করিতে লাগিলেন। তিনি আসিলেন, কিন্তু আসিয়াই মূর্চ্ছিত হইয়া পড়িলেন। তাঁহাকে ধরিয়া লইয়া যাইতে হইল। এই প্রকার মূর্চ্ছা যাওয়া তাঁহার নূতন নয়, তাই জ্ঞান হইলে তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, পার্টি

যেন চলিতে থাকে। সোসাইটির আশ্রমের অতিথি-গৃহের প্রাঙ্গণে ফরাস বিছাইয়া মুগ-অঙ্কুর, খেজুর ইত্যাদি কিছু জলযোগ করা ও পরস্পর হৃদয় খুলিয়া কথাবার্ত্তা বলাই ছিল এই পার্টির বৈশিষ্ট্য।

কিন্তু এই মূর্চ্ছা আমার জীবনের অসাধারণ ঘটনা হইয়াছিল।

৩

ধ্রমক নাকি?

আমার দাদার বিধবা স্ত্রীর সহিত ও অন্যান্য আত্মীয়ের সহিত দেখা করিতে রাজকোটে ও পোরবন্দর যাইতে হয় বলিয়া বোম্বাই হইতে সেখানে গেলাম। দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহ যুদ্ধের সময়, আমার পোষাক পরিচ্ছদ যতটা 'গিরমিটিয়া' মজুরের মত করা যায়, ততটা করিয়া ফেলিয়াছিলাম। বিলাতেও বাড়ীতে ঐ পোষাক পরিতাম। দেশে আসিয়া আমার কাথিয়াওয়াড়ী বেশ পরিতে হইত। উহা দক্ষিণ আফ্রিকা হইতেই আমার সঙ্গে থাকিত। বোম্বাইতে সেইজন্য আমি কাথিয়াওয়াড়ী পোষাক লইলাম—সার্ট, বড় কোট, ধুতি ও সাদা পাগড়ী। এ সকলই দেশী মিলের কাপড়ের তৈরী ছিল।

বোম্বাই হইতে কাথিয়াওয়াড় তৃতীয় শ্রেণীতে যাইব বলিয়া পাগড়ী ও কোট আমার নিকট ভার বলিয়া বোধ হইল। সেই জন্য সার্ট, ধুতি ও আট-দশ আনার একটা কাশ্মীরী টুপী লইলাম। এইরকম পোষাক পরিলে গরীবদের মধ্যে চলা যায়। এই সময় বিরামগামে বা ওয়াঢ়া-ওয়াণে প্লেগের নিমিত্ত তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে পরীক্ষা দেওয়ার জন্য নামিতে হইত। আমার অল্প জ্বর ছিল। অনুসন্ধানকারী কর্ম্মচারী হাত দেখিয়া জ্বর আছে অনুভব করিলেন। তিনি আমাকে রাজকোটে ডাক্তারের সহিত দেখা করার জন্য হুকুম দিলেন ও আমার নাম টুকিয়া লইলেন।

বোম্বাই হইতে কেহ টেলিগ্রাম করিয়া থাকিবে, সেই হেতু ওয়াঢ়াওয়াণ ষ্টেশনে স্থানীয় সুপরিচিত জন-সেবক দর্জ্জি মতিলাল আমার সহিত দেখা

করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি আমাকে বিরামগামে 'কাষ্টম্‌সের' তদন্তের সম্বন্ধে বলিলেন। কেহ কোন দ্রব্য শুল্ক না দিয়া লইয়া যায় কিনা, তাহাই এখানে তদন্ত হইত। সেজন্য যাত্রীদের যথেষ্ট অসুবিধা ভোগ করিতে হইত। তখন আমি জ্বরে কাতর ছিলাম; বেশী কথা বলিতে ইচ্ছা হইল না। তাহাকে আমি সংক্ষেপে জবাব দিলাম,—

"তুমি জেলে যাইতে প্রস্তুত আছ কি ?"

চিন্তা না করিয়া উৎসাহের বশে অনেক যুবকই জবাব দেয়। আমি মতিলালকে তাহাদেরই একজন বলিয়া ধরিয়া লইয়াছিলাম। কিন্তু বাস্তবিক তিনি স্পষ্ট ভাষায় আমাকে জবাব দিলেন,—

"আমরা অবশ্যই জেলে যাইব, কিন্তু আমাদিগকে পরিচালনা করিতে হইবে। কাথিয়াওয়াড়ী বলিয়া আপনার উপর আমাদের প্রথম দাবী আছে। এখন ত আপনাকে আমি নামাইতে পারিব না, কিন্তু ফিরিবার বেলা আপনাকে ওয়াঢ়াওয়াণে অবশ্যই নামিতে হইবে। এখানকার যুবকদের কাজ ও তাহাদের উৎসাহ দেখিয়া আপনি খুসী হইবেন। আমাদিগকে আপনার সৈন্যদলে যখনই ইচ্ছা ভর্ত্তি করিয়া লইতে পারিবেন।"

মতিলালের উপর আমার চোখ পড়িল। তাঁহার অন্য সঙ্গী তাঁহার প্রশংসা করিয়া বলিল,—

"এই ভাই দরজীর কাজ করে। নিজের কাজে নিপুণ, সেইজন্য রোজ এক ঘণ্টা মাত্র কাজ করিয়া মাসে প্রায় ১৫৲ নিজের খরচার জন্য রোজগার করে, বাকী সমস্ত সময় জনসাধারণের সেবার কাজে দেয়। আমাদের শিক্ষিতদিগকে মতিলাল চালায় ও তাহার কর্ম্মশক্তি দ্বারা লজ্জা দেওয়ায়।"

পরে আমি ভাই মতিলালের সঙ্গে ভাল রকমে মিশিয়াছিলাম।

আমি দেখিয়াছিলাম, তাঁহার সম্বন্ধে যে প্রশংসা করা হইয়াছিল তাহা আদৌ অতিশয়োক্তি নহে। সত্যাগ্রহাশ্রম স্থাপিত হইলে, প্রতি মাসেই কিছুদিন করিয়া সেখানে তিনি কাটাইতেন। বালকদিগকে সেলাই শিখাইতেন ও আশ্রমের সেলাইয়ের কাজ করিতেন, বিরামগামের কথাও আমাকে রোজ শুনাইতেন। যাত্রীদের উপর যে অত্যাচার হইত তাহা তাঁহার একেবারে অসহ্য ছিল। ভরা যৌবনেই মতিলাল রোগে দেহ ত্যাগ করিয়া ওয়াঢ়াওয়াণ শূন্য করিয়া চলিয়া যান।

রাজকোট পঁহুছার দ্বিতীয় দিনে, আমি পূর্ব্বের হুকুম মত, হাসপাতালে হাজির হইলাম। সেখানে আমি অপরিচিত ছিলাম না। ডাক্তার লজ্জিত হইলেন ও যে কর্ম্মচারী ঐ হুকুম দিয়াছিল, তাঁহার উপর রাগ করিতে লাগিলেন। আমি ক্রোধের কারণ দেখিলাম না। সেই কর্ম্মচারী নিজের ধর্ম্ম পালন করিয়াছেন। তিনি আমাকে চিনিতেন না, আর চিনিলেও ঐ হুকুম পালন করাই তাঁহার ধর্ম্ম হইত।

ডাক্তার আমাকে সংবাদ দেওয়ার জন্য হাসপাতালে আসিতে না দিয়া, তাঁহার লোক পাঠাইয়াই সংবাদ লইতে লাগিলেন।

এই সকল সময়ে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীদিগকে পরীক্ষা করা আবশ্যক। বড় মানুষেরা যদি তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করেন, তবে তাঁহাদিগকেও, গরীবদিগকে যে সকল নিয়ম পালন করানো হয়, তাহা স্বেচ্ছায় পালন করিতে হয়, কর্ম্মচারীদেরও পক্ষপাত করা উচিত হয় না। কিন্তু আমার অভিজ্ঞতা হইতে আমি বলিতেছি যে, কর্ম্মচারীরা তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীকে মানুষ মনে না করিয়া পশু বলিয়াই মনে করে। তুই-তোকারি না করিয়া তাহার সহিত কথা বলে না। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর কোনও কথা খাটে না, কোনও যুক্তি চলে না। কর্ম্মচারীরা এরূপ ব্যবহার

করে যেন যাত্রী তাহাদের চাকর। তাহাকে মারে, তাহার পয়সা লুট করে, তাহার ট্রেণ ফেল করায়, টিকিট দিতে বেগ দেয় ; আমি নিজের চোখে এই সকল দেখিয়াছি। এই অবস্থার সংস্কার করার পথ হইতেছে, যদি ধনবানদের ও শিক্ষিতদের কেহ কেহ, গরীবের মতই তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ করিয়া, গরীব যাহা পায় না এমন কোনও সুবিধা না লয়, এবং অন্যায়, অবিচার, অসুবিধা, বীভৎসতা নীরবে সহ্য না করিয়া, উহার বিরুদ্ধে দাঁড়ায় ও প্রতিকার করে।

কাথিয়াওয়াড়ে যখনই গিয়াছি, তখনই বিরামগামের যাত্রীদের ঐ শুল্ক আদায়ের জন্য পরীক্ষার অভিযোগ শুনিয়াছি।

সেই হেতু লর্ড উইলিংডন্ আবশ্যকমত তাঁহাকে জানাইতে যে অনুরোধ করিয়াছিলেন আমি শীঘ্রই তাহার সদ্ব্যবহার করিলাম। এই বিষয়ে যে সকল কাগজ-পত্র ছিল, তাহা পড়িলাম। অভিযোগের হেতু যে ঠিক, তাহা বুঝিয়া লইলাম। তারপর বোম্বাই সরকারের সহিত এই বিষয়ে পত্র ব্যবহার করিলাম। সেক্রেটারীর সহিত দেখা করিলাম। লর্ড উইলিংডনের সহিতও দেখা করিলাম। তিনি তাঁহার দুঃখ জ্ঞাপন করিলেন, এবং দিল্লীর সরকারের দোষ দিলেন।

"যদি আমাদের হাতেই থাকিত, তবে এই শুল্কের গণ্ডী কবে আমরা ভাঙ্গিয়া ফেলিতাম। আপনি ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্টের কাছে যান"—সেক্রেটারী এই কথা বলিলেন।

আমি ইম্পিরিয়াল গবর্ণমেণ্টের সহিত পত্র-ব্যবহার করিতে লাগিলাম। কিন্তু পত্র-প্রাপ্তির স্বীকার ভিন্ন আর কোনও জবাব পাইলাম না। যখন আমার লর্ড চেম্‌স্‌ফোর্ডের সহিত সাক্ষাতের অবসর হইয়াছিল, তখন, অর্থাৎ প্রায় দুই বৎসর পত্র-ব্যবহারের পর ইহার

প্রতিকার হয়। ওখানকার কথা শুনিয়া লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের আশ্চর্য্যবোধ হইল। তিনি বিরামগামের কোনও খবর রাখিতেন না। আমার কথা মনোযোগ দিয়া শুনিলেন এবং তখনি টেলিফোন করিয়া বিরামগামের কাগজ-পত্র আনাইলেন। যদি আমার বর্ণিত অবস্থার বিরুদ্ধে কর্ম্মচারীদের কিছু বলার না থাকে, তবে শুল্কের গণ্ডী তুলিয়া দিবেন বলিয়া কথা দিলেন। দেখা হওয়ার অল্পদিন পরেই শুল্ক-গণ্ডী তুলিয়া দেওয়ার নোটীশ আমি সংবাদপত্রে পড়িলাম।

এই জয়কে আমি সত্যাগ্রহের ভিত্তি বলিয়া মনে করি। বিরামগামের বিষয়ে বোম্বাই সরকারের সেক্রেটারী বলিলেন যে, ঐ বিষয়ে বাগসরাতে আমি যে বক্তৃতা দিয়াছিলাম, তাহার নকল তাঁহার কাছে আছে। ঐ বক্তৃতায় সত্যাগ্রহের উল্লেখে তাঁহার অসন্তোষও জানাইলেন। তিনি জিজ্ঞাসা করিলেন,—

"আপনি কি স্বীকার করেন না যে, ইহাতে ধমক দেখানো হইয়াছে? এই শক্তিশালী সরকার কি ধমকে ভয় খাইবে?"

"ইহা ধমক নয়, ইহা লোক-শিক্ষা। লোকের নিজের দুঃখ দূর করার জন্য সকলপ্রকার সম্ভবপর উপায় দেখানো আমার জীবনের ধর্ম্ম। যে প্রজা স্বাধীনতা পাওয়ার ইচ্ছা করে, তাহার নিকট নিজের রক্ষার চরম উপায় থাকা আবশ্যক। সাধারণতঃ এই চরম উপায় হিংসায় দেখা দেয়। সত্যাগ্রহ শুদ্ধ অহিংস অস্ত্র। উহার ব্যবহার ও উহার সীমা বুঝাইয়া দেওয়া আমার ধর্ম্ম। ইংরাজ-সরকার শক্তিমান, সে বিষয়ে আমার সন্দেহ নাই; কিন্তু সত্যাগ্রহ যে সর্ব্বজয়ী অস্ত্র, সে বিষয়েও আমার সন্দেহ নাই।"

চতুর সেক্রেটারী মাথা নাড়িয়া বলিলেন—"আমরা দেখিয়া লইব।"

৪

শান্তি-নিকেতন

রাজকোট হইতে আমি শান্তি-নিকেতনে গেলাম। সেখানকার অধ্যাপক ও বিদ্যার্থীরা আমাকে ভালবাসায় অভিষিক্ত করিলেন। অভ্যর্থনার পদ্ধতিতে আড়ম্বর-শূন্যতা, কলা-কৌশল ও প্রেমের মিশ্রণ ছিল। সেইখানে কাকা সাহেব কালেলকারের সহিত আমার প্রথম পরিচয় হয়। কালেলকারকে কাকা সাহেব কেন বলা হইত, তাহা আমি তখন জানিতাম না। পরে জানিলাম যে, কেশবরাও দেশপাণ্ডে বরোদা রাজ্যে গঙ্গানাথ বিদ্যালয় পরিচালনা করিতেন। কেশবরাও আমার সমকালীন ছিলেন এবং বিলাতে তাঁহার সহিত আমার ভাল পরিচয় ছিল। তাঁহার নানা কল্পনার মধ্যে, স্কুলকে পারিবারিক ভাবে গড়িয়া তোলারও একটা কল্পনা ছিল। সেইজন্য সকল অধ্যাপকেরই একটা করিয়া নাম দেওয়া হইয়াছিল। কালেলকার এমনি করিয়া কাকা নাম পান। হরিহর শর্ম্মা 'অন্ন' (ভাই) হইলেন। আর অপর সকলে অন্য উপযুক্ত নাম পাইলেন। কাকার সাথী আনন্দানন্দ (স্বামী) ও মামার মিত্র বলিয়া পটবর্দ্ধন (আপ্পা) পরে এই পরিবার-ভুক্ত হন। এই পরিবারের উপরের পাঁচ জন, একে একে আমার সাথী হইয়া পড়েন। দেশপাণ্ডে 'সাহেব' নামে পরিচিত ছিলেন। সাহেবের স্কুল ভাঙ্গিয়া যায় ও এই পরিবারও ভাঙ্গিয়া যায়। তবু তাঁহারা তাঁহাদের আধ্যাত্মিক যোগ ছাড়েন নাই। কাকা সাহেব বিভিন্ন বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতেছিলেন এবং সেই উদ্দেশ্যেই এই সময়ে

শান্তি-নিকেতনে ছিলেন। চিন্তামন শাস্ত্রী বলিয়া সেই পরিবারের আর একজন সেখানে থাকিতেন। তাঁহারা সংস্কৃত-শিক্ষকের কার্য্য করিতেন।

শান্তি-নিকেতনে আমার পরিবারকে ভিন্ন একটি বাড়া দেওয়া হইয়াছিল। এখানে মগনলাল গান্ধী এই পরিবারের প্রধান ছিল এবং সে ফিনিক্স আশ্রমের সমস্ত নিয়ম পুঙ্খানুপুঙ্খরূপে পালন করিত এবং করাইত। সে নিজের প্রেম, জ্ঞান ও উগ্যমের দ্বারা নিজের প্রভাব বিস্তার করিতেও সক্ষম হইয়াছিল। এইখানে এণ্ড্রুজ ছিলেন, পিয়ার্সন ছিলেন। জগদানন্দবাবু, নেপালবাবু, সন্তোষবাবু, ক্ষিতিমোহন বাবু, নগেনবাবু, শরৎবাবু ও কালীবাবুর সহিত আমার সম্বন্ধ ঘনিষ্ঠ হইয়াছিল।

আমার স্বভাব-অনুযায়ী আমি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকদিগের সহিত মিশিয়া গিয়াছিলাম। আমি তাঁহাদের সহিত আত্মনির্ভরতা-সম্বন্ধে আলোচনা করিতে লাগিলাম। বেতনভোগী পাচকের পরিবর্ত্তে যদি বিদ্যার্থী ও শিক্ষকেরা নিজেই রান্না করে তবে ভাল হয়। উহাতে পাকশালার স্বাস্থ্য ও অন্যান্য বিষয় শিক্ষকদিগের হাতে আসে, বিদ্যার্থীরা স্বাবলম্বী হয় এবং নিজে হাতে পাক করার ব্যবহারিক শিক্ষাও লাভ করে। এই সকল কথা আমি শিক্ষকদিগকে জানাইলাম। দুই একজন শিক্ষক মাথা নাড়িলেন। কাহারও কাহারও এই পরীক্ষা ভাল মনে হইল। বালকদের কাছে ত নূতন জিনিষ হইলেই ভাল লাগে, সেই নীতি অনুসারে ইহা তাহাদেরও ভাল লাগিল। এমনি করিয়া পরীক্ষা আরম্ভ হইল। এই বিষয় রবীন্দ্রনাথকে জানাইলে তিনি বলিলেন, শিক্ষকেরা যদি অনুকূল হন তবে এ পরীক্ষা তাঁহার নিজের খুব ভাল লাগিবে। তিনি বিদ্যার্থীদিগকে বলিলেন—ইহাতেই স্বরাজের চাবি রহিয়াছে।

পিয়ার্সন এই উদ্যম সফল করার জন্য নিজের শরীর সমর্পণ করিলেন। ইহা তাঁহার কাছে বড়ই ভাল লাগিয়াছিল। একদল তরকারী কোটার আর একদল চাল-ডাল ধোয়া-বাছার ভার লইল। পাকশালার চতুষ্পার্শ্ব সাফ রাখার জন্য নগেন বাবুরা নিযুক্ত হইলেন। তাঁহাদিগকে কোদাল লইয়া কাজ করিতে দেখিয়া আমি আনন্দিত হইলাম।

কিন্তু এই কাজে সওয়া-শত ছেলে ও শিক্ষক একেবারে ঝুঁকিয়া পড়িবে, এমত হইতে পারে না। এই বিষয় লইয়া প্রতিদিন আলোচনা হইত। পিয়ার্সনের কি শ্রান্তি আছে? তিনি হাসিমুখে রান্নাঘরে কোন না কোন কাজে লাগিয়া থাকিতেন। বড় বড় বাসন মাজার কাজ তাঁহারই ছিল। বাসন মাজার দলের ক্লান্তি দূর করার জন্য এক-দল সেখানে সেতার বাজাইত। প্রত্যেক কাজেই বিদ্যার্থীরা পুরা উৎসাহে লাগিয়া পড়িল এবং সমস্ত শান্তি-নিকেতন ইহাদের কর্ম্মচেষ্টার গুঞ্জনে মুখর হইয়া উঠিল।

এই ধরণের পরিবর্ত্তন একবার আরম্ভ হইলে আর থামে না। ফিনিক্সের পাকশালা স্বাবলম্বী ছিল। কেবল তাহাই নহে, উহা খুব সাদাসিধাও ছিল। সেখানে মসলা ত্যাগ করা হইয়াছিল, এবং ভাত, ডাল, তরকারি একই পাত্রে ষ্টীমে একসাথে রান্না হইত। বাংলার রান্নার সংস্কার করার জন্যও এই ধরণের একটা ব্যবস্থা করা হইল। এজন্য দুই একজন অধ্যাপক ও কতকগুলি ছাত্র জুটিলেন।

কিন্তু কতকগুলি কারণের সংযোগ বশতঃ এই পরীক্ষা বন্ধ হইয়াছিল। আমি মনে করি যে, এই জগদ্বিখ্যাত প্রতিষ্ঠানের এই ছোটখাটো পরীক্ষার জন্য কোন অসুবিধা হয় নাই বরং উহা হইতে প্রাপ্ত কতকগুলি অভিজ্ঞতা কিছু সহায়কই হইয়া থাকিবে।

আমি কিছুকাল শান্তি-নিকেতনে থাকিব ইচ্ছা করিয়াছিলাম। কিন্তু বিধাতা আমাকে বলপূর্ব্বক টানিয়া লইয়া গেলেন। আমার এক সপ্তাহ সেখানে থাকার পরে পুনা হইতে গোখলের মৃত্যু-সংবাদ তারযোগে পাইলাম। শান্তি-নিকেতন শোকে ডুবিয়া গেল। সকলে আমার নিকট সমবেদনা জ্ঞাপন করিতে আসিলেন। মন্দিরের নিকটে সভা হইল। সে দৃশ্য অপূর্ব্ব গম্ভীর। আমি সেই দিনই পুনা যাওয়ার জন্য রওনা হইলাম। স্ত্রীকে ও মগনলালকে সঙ্গে লইয়া চলিলাম। বাকী সকলে শান্তি-নিকেতনে রহিলেন।

এণ্ড্রুজ বর্দ্ধমান পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে আসিলেন। তিনি আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—"ভারতবর্ষে সত্যাগ্রহ করার অবসর আসিবে বলিয়া কি তোমার মনে হয়? যদি সেরূপ মনে কর, তবে সেদিন কখন আসিতে পারে?"

আমি বলিলাম—"এখন জবাব দেওয়া মুস্কিল, আমি ত এক বৎসর কিছুই করিব না। গোখলে আমার নিকট হইতে কথা লইয়াছিলেন যে, একবৎসর পর্য্যন্ত আমাকে ভ্রমণ করিতে হইবে। ইতিমধ্যে সাধারণের স্বার্থ-সংক্রান্ত ব্যাপারে কোনও মত গঠন করিব না বা যুক্তি দিব না। এই কথা আমি অক্ষরে অক্ষরে পালন করিতেছি। তবে পাঁচ বৎসরের মধ্যে সত্যাগ্রহ করার অবকাশ আসিবে বলিয়া মনে হয় না।"

আমি এইখানে একটি কথা বলিব। "হিন্দ্ স্বরাজ্যে" আমি যে সকল যুক্তি দেখাইয়াছি, তাহাতে গোখলে হাসিয়া বলিতেন—"এক বৎসর তুমি হিন্দুস্থানে থাকিয়া দেখ, তোমার যুক্তি তখন ঠিক রাস্তায় আসিবে।

৫

তৃতীয় শ্রেণীর বিড়ম্বনা

বর্দ্ধমান পঁহুছিয়া আমি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট লইতে যাই। উহাতেও বিড়ম্বনায় পড়ি। "তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট এত পূর্ব্বে দেওয়া হয় না"—এই জবাব পাইলাম। আমি ষ্টেশন মাষ্টারের নিকট গেলাম। কিন্তু আমাকে তাহার কাছে যাইতে দেয় কে? কে একজন দয়া করিয়া ষ্টেশন মাষ্টারকে দেখাইয়া দিলেন। সেখানে পঁহুছিয়া তাঁহার কাছেও সেই জবাব পাইলাম। "জানালা খুলিয়াছে" জানিয়া টিকিট কিনিতে গেলাম। কিন্তু সহজে কি টিকিট পাওয়ার যো আছে? বলবান যাত্রীরা একের পর একে ঠেলিয়া ঢুকিতে লাগিল; আমাকে ঠেলিয়া জোর করিয়াই যাইতে লাগিল। অবশেষে টিকিট মিলিল।

গাড়ী আসিল। এখানেও যাহারা বলবান তাহারা ঢুকিয়া পড়িল। যাহারা বসিয়া আছে ও যাহারা প্রবেশার্থী তাহাদের মধ্যে গালিগালাজ ধাক্কাধাক্কি চলিতেছিল। ইহার অংশ গ্রহণ করিয়া ঢোকা আমার কর্ম্ম নয়। আমরা তিন জন এদিক সেদিক যাইতে লাগিলাম। সব যায়গা হইতেই একই জবাব আসে—"এখানে জায়গা নাই।" আমি গার্ডের নিকট গেলাম। তিনি বলিলেন—"জায়গা পাও ত বস, নয়ত পরের ট্রেণে যাইও।"

আমি নম্রতার সহিত বলিলাম—'কিন্তু আমার জরুরী কাজ আছে।'

ইহা শুনিবার সময় গার্ডের হইল না। আমি হার মানিলাম। মগনলালকে যেখানে পারে বসিতে বলিলাম। স্ত্রীকে লইয়া আমি তৃতীয় শ্রেণীর টিকিট থাকা সত্ত্বেও ইণ্টারে গিয়া বসিলাম। গার্ড আমাকে উঠিতে দেখিল।

আসানসোল ষ্টেশনে গার্ড ভাড়া আদায় করিতে আসিল। আমি বলিলাম—"আমাকে বসিবার জায়গা দেওয়া আপনার কাজ। জায়গা পাই নাই বলিয়াই এখানে বসিয়াছি, আমাকে তৃতীয় শ্রেণীতে জায়গা দিলে আমি সেখানেই বসিতে প্রস্তুত আছি।"

গার্ড সাহেব বলিলেন—"আমার সঙ্গে তর্ক করা চলিবে না। জায়গা আমার কাছে নাই। পয়সা না দেও ত তোমাকে ট্রেণ হইতে নামিতে হইবে।"

আমাকে ত যেমন করিয়াই হোক্ পুনা পঁহুছিতে হইবে। গার্ডের সহিত ইহা লইয়া লড়িবার সাহস হইল না। আমি টাকা দিয়া দিলাম। সে পুনা পর্য্যন্ত সমস্ত ভাড়াই লইল। আমি ইহা অন্যায় বলিয়া প্রতিবাদ করিলাম।

প্রাতঃকালে মোগলসরাই আসিয়া পঁহুছিলাম। মগনলাল তৃতীয় শ্রেণীতে জায়গা করিয়া লইয়াছিল। মোগলসরাইতে আমি তৃতীয় শ্রেণীতে গেলাম। টিকিট কলেক্টরকে আমি অবস্থাটা বুঝাইলাম ও তাহার নিকট হইতে এখন তৃতীয় শ্রেণীতে যাওয়ার সার্টিফিকেট চাহিলাম। তিনি দিতে পারিলেন না। পরে আমি সমস্ত অতিরিক্ত ভাড়া ফেরৎ চাহিয়া রেল-কর্ত্তৃপক্ষের নিকট পত্র দিলাম।

"সার্টিফিকেট ছাড়া ভাড়ার টাকা ফেরৎ দেওয়ার রেওয়াজ নাই, কিন্তু আপনার বেলায় আমরা দিতেছি। বর্দ্ধমান হইতে

মোগলসরাই পর্য্যন্ত ভাড়া ফেরৎ হইবে না," এই ধরণের জবাব পাইলাম।

ইহার পর তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণে আমার এমন সকল অভিজ্ঞতা হয় যে, তাহা লিখিতে গেলে একখানা পুঁথি হইয়া পড়ে। সুতরাং উহাদের কিছু কিছু প্রসঙ্গতঃ এই পুস্তকে উল্লেখ করা ছাড়া বেশী লেখার উপায় নাই। শরীরের জন্য আমার তৃতীয় শ্রেণীতে ভ্রমণ বন্ধ হইয়াছে বলিয়া আমার দুঃখ হইয়াছে ও দুঃখ থাকিয়াই যাইবে। তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর দুঃখ কর্ম্মচারীদের জবরদস্তীর জন্য ত আছেই, কিন্তু তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর ভিতর অনেকের ঔদ্ধত্য, তাহাদের নোংরা অভ্যাস, তাহাদের স্বার্থ-বুদ্ধি ও তাহাদের অজ্ঞতাও কম নয়। দুঃখের বিষয় এই, তাহারা যে উদ্ধত ব্যবহার করিতেছে, অথবা চতুষ্পার্শ্ব ময়লা করিতেছে অথবা স্বার্থপরের ন্যায় ব্যবহার করিতেছে, তাহা তাহারা জানেও না। যাহা করে তাহাই তাহাদের নিকট স্বাভাবিক বোধ হয়। আমাদের শিক্ষিতবর্গ তাহাদের খোঁজও করেন না।

কল্যাণ জংশনে যখন পঁহুছিলাম তখন একেবারে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছি। মগনলাল ও আমি ষ্টেশনের জলের কল হইতে জল লইয়া স্নান করিলাম। পত্নীর জন্য কিছু ব্যবস্থা করিতেছিলাম, সেই সময় "সার্ভেণ্ট অব্ ইণ্ডিয়া সোসাইটি"র শ্রীযুক্ত কোলে চিনিতে পারিয়া আমার কাছে আসিলেন। তিনিও পুনা যাইতেছিলেন। তিনি আমার পত্নীকে দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় স্নান করিবার জন্য লইয়া যাইতে বলিলেন। এই সবিনয় অনুরোধ পালন করিতে আমার সঙ্কোচ হইল। আমার পত্নীর দ্বিতীয় শ্রেণীর কামরায় আশ্রয় লওয়ার অধিকার নাই, আমার এই বোধ ছিল। কিন্তু ঐ কামরায় স্ত্রীকে স্নান করিতে দেওয়ার

অন্যায়ের দিকে ইচ্ছা করিয়াই চোখ বুঁজিয়াছিলাম। সত্যের পূজারীর এরূপ করা শোভা পায় না। পত্নীরও কিছু সেখানে যাওয়ার আগ্রহ ছিল না। কিন্তু পতির মোহরূপ স্বর্ণ পর্দাদ্বারা সত্যের মুখ আবৃত করিলাম।

৬

আমার প্রযত্ন

পুনায় পঁহুছিলাম। শ্রাদ্ধাদি সম্পন্ন হওয়ার পর সোসাইটির ভবিষ্যৎ পরিচালনা ও আমাকে উহার সভ্য হইতে হইবে কিনা তাহা লইয়া ভাবনার ভিতর পড়িয়া গেলাম। ইহা আমার পক্ষে কঠিন ভার হইয়া পড়িল। গোখলে বাঁচিয়া থাকিতে আমার সোসাইটির সভ্যশ্রেণীভুক্ত হওয়ার আবশ্যক ছিল না। আমার কর্ত্তব্য ছিল গোখলের আজ্ঞা ও ইচ্ছার বশবর্ত্তী হওয়া। এই অবস্থা আমার ভাল লাগিয়াছিল। ভারতবর্ষের রাজনীতি-সমুদ্রে ঝাঁপ দেওয়ার জন্য আমার পথ-প্রদর্শকের আবশ্যক ছিল, আর গোখলের ন্যায় পথ-প্রদর্শকের কাছে আমি সুরক্ষিত ছিলাম।

এখন আমার মনে হইল যে, আমাকে সোসাইটির সভ্যদলভুক্ত হওয়ার জন্য চেষ্টা করিতে হইবে। গোখলের আত্মাও ইহাই চায়—আমার এইরূপ বোধ হইতে লাগিল। আমি নিঃশঙ্ক ভাবে ও দৃঢ়তার সহিত এই প্রযত্ন করিতে লাগিলাম। এই সময় সোসাইটির প্রায় সকল সভ্যই পুনায় উপস্থিত হইয়াছিলেন। আমি তাঁহাদিগকে বুঝাইতে ও আমার সম্বন্ধে তাঁহাদিগের যে ভয় ছিল তাহা দূর করিতে সচেষ্ট হইলাম। আমি দেখিলাম যে, সভ্যদিগের মধ্যে মতভেদ আছে। কেহ কেহ আমাকে গ্রহণ করিতে ইচ্ছুক ছিলেন, অপর সকলে আমাকে গ্রহণ করা বিষয়ে দৃঢ়তার সহিত বাধা দিতেছিলেন। উভয় পক্ষের ভিতরেই আমার প্রতি

ভালবাসা আছে দেখিতে পাইলাম, কিন্তু আমার প্রতি প্রেম অপেক্ষা সোসাইটির প্রতি দায়িত্ববোধ তাঁহাদের অধিক ছিল, সোসাইটির উপর ভালবাসাও কম ছিল না।

সেই জন্য আমার সম্বন্ধে আলোচনা তিক্ততাশূন্যভাবে ও কেবল মূলনীতি লইয়াই হইত। বিরুদ্ধপক্ষের এই প্রকার মনে হইত যে, অনেক বিষয়ে আমার মত ও তাঁহাদের মতের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ। এই হেতু তাঁহাদের খুব বিশ্বাস ছিল যে, গোখলে যে আদর্শ লইয়া এই সোসাইটি রচনা করিয়াছিলেন, আমি সোসাইটির ভিতর প্রবেশ করিলে সে আদর্শের উপরই আঘাত পড়ার পুরাপুরি সম্ভাবনা আছে। ইহা তাঁহাদিগের নিকট অসহ্য হওয়াই স্বাভাবিক।

অনেক আলোচনার পর আমরা ফিরিলাম। সভ্যেরা এই বিষয়ের শেষ সিদ্ধান্ত অন্য সভায় নির্দ্ধারণ করিবেন বলিয়া স্থির করিয়া তখনকার মত ইহা মুলতুবী রাখিলেন।

বাড়ী ফিরিয়া আমি চিন্তায় পড়িয়া গেলাম। অধিকাংশ লোকের মতের জোরে সভায় প্রবেশ করায় কি ইষ্ট হইবে? ইহাতেই কি গোখলের প্রতি আমার কর্ত্তব্য পালন করা হইবে? যদি আমার সহিত মতের অনৈক্য হয়, তখন আমিই সোসাইটিকে বিচ্ছিন্ন করার হেতু হইব না ত? আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম যে, সোসাইটির সভ্যাদিগের মধ্যে আমাকে লইয়া মতভেদ আছে। এ অবস্থায় আমার নিজেরই সোসাইটিতে প্রবেশ করার আগ্রহ ত্যাগ করা উচিত। তাহাতে বিরুদ্ধ মতের সভ্যাদিগকে একটা মুস্কিল হইতে ত বাঁচানো যাইবেই, সোসাইটির প্রতি ও গোখলের প্রতি আমার অনুরাগও প্রকাশ করা হইবে।

মনে মনে এই প্রকার সিদ্ধান্ত করা মাত্রই শ্রীযুক্ত শাস্ত্রীকে পত্র দিয়া জানাইলাম যে, আমাকে সভ্যশ্রেণীভুক্ত করা লইয়া সভা আহ্বান যেন আর না করা হয়। যাহারা আমাকে গ্রহণের বিরোধী ছিলেন তাঁহাদিগের নিকট এই সঙ্কল্প খুব ভাল লাগিল। তাহারা ধর্ম্ম-সঙ্কট হইতে উত্তীর্ণ হইলেন। আমার সহিত তাহাদের স্নেহের বন্ধন আরও দৃঢ় হইল। এমনি করিয়া সোসাইটিতে প্রবেশ করার দরখাস্ত ফিরাইয়া লইয়া সোসাইটির সত্যকার সভ্য হইলাম।

এখন অভিজ্ঞতা হইতে দেখিতে পাইতেছি যে, সোসাইটির সভ্য না হইয়া ভালই করিয়াছিলাম, আর যাহারা আমার প্রবেশের বিরোধী ছিলেন তাঁহারাও ঠিকই করিয়াছিলেন। তাঁহাদের সিদ্ধান্ত ও আমার সিদ্ধান্তের প্রভেদ পরবর্ত্তী অভিজ্ঞতাই দেখাইয়া দিতেছে। কিন্তু এই ভেদ জানিলেও আমাদের আন্তরিক ভেদ কখনো হয় নাই। কখনো কটুভাব দেখা দেয় নাই। মতভেদ সত্ত্বেও আমরা বন্ধু ও মিত্রই রহিয়া গিয়াছি। সোসাইটির গৃহ আমার নিকট তীর্থস্থান হইয়া রহিয়াছে। লৌকিক দৃষ্টিতে আমি সোসাইটির সভ্য না হইলেও আধ্যাত্মিক দৃষ্টিতে আমি উহার সভ্য। লৌকিক সম্বন্ধ অপেক্ষা আধ্যাত্মিক সম্বন্ধ অধিক মূল্যবান। আধ্যাত্মিক সম্বন্ধশূন্য লৌকিক সম্বন্ধ প্রাণশূন্য দেহের সমান।

৭

কুম্ভ

ডাক্তার প্রাণজীবনদাস মেহ্‌তার সহিত দেখা করার জন্য আমাকে রেঙ্গুন যাইতে হইয়াছিল। রেঙ্গুনের পথে শ্রীযুক্ত ভূপেন্দ্রনাথ বসুর নিমন্ত্রণে তাঁহার বাড়ীতে উঠি। এইখানে বাঙ্গালী পরিবারের অতিথি-সৎকারের চূড়ান্ত পরিচয় পাই। এই সময়ে আমি কেবল ফল খাইয়া থাকিতাম। আমার সঙ্গে আমার ছেলে রামদাস ছিল। কলিকাতায় যত রকম মেওয়া ও ফল পাওয়া যায় সেই সমস্ত খুঁজিয়া আনা হইত। স্ত্রীলোকরা রাত্রি জাগিয়া পেস্তা ইত্যাদির খোসা ছাড়াইতেন। ফলগুলি যত সুন্দর করিয়া ছাড়াইয়া সাজাইয়া দেওয়া যায় সেইরূপ করিয়া দেওয়া হইত। আমার সঙ্গীদের জন্য নানাপ্রকারে রান্না হইত। এই প্রেম ও আতিথিয়েতা আমি অনুভব করিতেছিলাম। কিন্তু একজন লোকের জন্য বাড়ীর সমস্ত লোক সারাদিন নিযুক্ত থাকিবে, ইহা আমার অসহ্য লাগিত। কিন্তু ইহা হইতে উদ্ধার পাওয়ারও কোন উপায় ছিল না।

রেঙ্গুন যাইতে আমি ডেকের যাত্রী ছিলাম। বসু মহাশয়ের গৃহে যেমন স্নেহের অত্যাচার ছিল, এখানে তেমনি অবহেলার বিড়ম্বনা সহ্য করিতে হয়। ডেকের যাত্রীদের অতিশয় কষ্ট। স্নানের জায়গায় যাওয়া যায় না এমন ময়লা,—পায়খানা ত নরক। মলমূত্রের উপর দিয়া, না হয়ত ডিঙ্গাইয়া যাইতে হইত। আমার পক্ষে এই অসুবিধা বড় ক্লেশকব হইয়াছিল। ষ্টীমারের প্রধান কর্ম্ম-কর্ত্তার নিকট গেলাম,

কিন্তু প্রতিকার কে করে? যাত্রীরা নিজেরাই ডেক নোংরা করিয়া রাখিত। যেখানে বসিয়া আছে সেইখানেই থুথু ফেলে, তামাক ও পানের পিক ছড়ায়, উচ্ছিষ্টও সেইখানেই ফেলে। গোলমালের ত সীমাই নাই। যে যতটা পারে জায়গা জুড়িয়া লয়, কেহ কাহারও সুবিধার দিকে তাকায় না। নিজেরা যত জায়গা লয়, মাল রাখিয়া তাহার চাইতে বেশী জায়গা বন্ধ করিয়া রাখে। এই দুই দিনে আমার বিষম পরীক্ষা হইয়াছিল।

রেঙ্গুনে পঁহুছিয়া আমি ষ্টীমার কোম্পানীর এজেণ্টকে সকল অবস্থা জানাইলাম। ঐ চিঠির ফলে ও ডাক্তার মেহ্‌তার তদ্বিরের জোরে ফেরার সময় অনেকটা সুবিধা হইয়াছিল।

আমার ফলাহারের হাঙ্গামা এখানেও বেশী রকমই হইতে লাগিল। ডাক্তার মেহ্‌তার বাড়ী নিজের মনে করিতে পারি, আমার সহিত এমন সম্পর্ক। খাদ্যোপচারের সম্বন্ধে আমি কথা চালাইতে পরিয়াছিলাম। কিন্তু কত রকমের জিনিষ খাইব তাহার কোনও একটা বাঁধাবাঁধি না থাকাতে, নানা রকম ফল আসিতে লাগিল। রকমফের দেখিয়া চোখের ও জিহ্বার তৃপ্তি হয়। খাওয়ার সময়ও যখন তখন ছিল। আমার নিজের অভ্যাস মত সময় স্থির রাখা যাইত না। রাত্রির খাওয়া ত আট নয়টার পূর্ব্বে হইতই না।

এই ১৯১৫ সালে হরিদ্বারে কুম্ভ মেলা ছিল। সেখানে যাওয়ার আমার বড় ইচ্ছা ছিল না, কিন্তু মহাত্মা মুন্সিরামকে দর্শন করিতে ত আমাকে যাইতেই হইবে। কুম্ভের সময় গোখলের সেবা-সমিতি একটা বড় দল পাঠাইতেন। উহাঁর ব্যবস্থা শ্রীযুক্ত হৃদয়নাথ কুঞ্জরুর হাতে ছিল। স্বর্গীয় ডাক্তার দেবও সেখানে ছিলেন। এখানে সাহায্য করার

জন্য আমার দলকেও লইয়া যাওয়ার ইচ্ছা করিয়াছিলাম। মগনলাল গান্ধী শান্তি-নিকেতন হইতে আমাদের দল লইয়া আমার পূর্ব্বেই গিয়া উপস্থিত হইয়াছিল। আমি রেঙ্গুন হইতে গিয়া তাহাদের সহিত মিলিত হইলাম।

কলিকাতা হইতে হরিদ্বার যাইতে খুব অসুবিধা ভোগ করিতে হইয়াছিল। রেলের কামরায় কখন কখন রাত্রিতে আলো পর্য্যন্ত থাকিত না। সাহারাণপুর হইতে ত যাত্রীদিগকে মালগাড়ীতেই বোঝাই করিয়া দিল। গাড়ীর উপর ছাদ ছিল না, খোলা গাড়ীতে উপর হইতে দুপুরের সূর্য্যের তাপ, আর নীচে কেবল লোহার মেজে—ক্লেশের কথা আর কি বলিব? এরূপ অবস্থাতেও তৃষ্ণা পাইলে যদি মুসলমানী জল আসে তবে হিন্দুরা তাহা পান করিবে না, হিন্দু-জল কখন আসিবে তাহার জন্য চীৎকার করিতে থাকিবে, আসিলে তখন জল পান করিবে। এই নিষ্ঠাবান্ হিন্দুরাই ঔষধের ভিতর ডাক্তার মদ দিলে, মুসলমান বা খৃষ্টানের ছোঁয়া জল দিলে, মাংসের যুষ দিলে তাহা খাইতে সঙ্কোচ করে না, জিজ্ঞাসা করারও দরকার বোধ করে না।

আমি শান্তি-নিকেতনে থাকার সময় অনুভব করিয়াছিলাম যে, ভারতবর্ষে কাজ করাটাই আমাদের বিশেষ একটা কর্ম্ম হইয়া পড়িবে। সেবকদের জন্য কোনও ধর্ম্মশালায় তাঁবু খাটানো হইয়াছিল। পায়খানার জন্য ডাক্তার দেব গর্ত্ত খোদাইয়াছিলেন। কিন্তু উহা সাফ্ করার ব্যবস্থা ত,এই সময়ে যে অল্পবিস্তর বেতনভোগী মেথর মিলিবে তাহাদের দ্বারাই ডাক্তার দেবকে করিতে হইবে? এই গর্ত্তে পতিত মল মাঝে মাঝে সরাইয়া ফেলা ও পায়খানার অন্য রকম সাফাই রাখার কাজ আমি 'ফিনিক্স' দলের জন্য চাহিয়া লইলাম। ডাক্তার দেব খুসী হইয়াই

সম্মত হইলেন। এই সেবাকার্য্য করার জন্য অনুমতি চাওয়ার কাজ ছিল আমার, আর সাফ্ করার বেলায় ছিল মগনলাল গান্ধী।

আমার কাজ বেশীর ভাগ ছিল তাঁবুতে বসিয়া 'দর্শন' দেওয়া, আর যে সমস্ত যাত্রী আসিত তাহাদের সহিত ধর্ম্ম ও অন্যান্য চর্চ্চা করা। দর্শন দেওয়ার আমার আর শেষ ছিল না। উহা হইতে এক মিনিটও ফাঁক পাওয়া যাইত না। স্নান করিতে গেলেও দর্শনাভিলাষীরা আমাকে একা থাকিতে দিতেন না। ফলাহার করিতে হয়, তাহাই বা একান্তে করা হইবে কি করিয়া? তাঁবুতে আমি এক মিনিটও একলা বসিয়া থাকিতে পারি নাই। আমি হরিদ্বারে গিয়া বুঝিতে পারিলাম যে, দক্ষিণ আফ্রিকায় আমাদ্বারা যাহা কিছু সেবা হইয়াছে তাহার প্রভাব সারা ভারতবর্ষের উপর কি গভীর হইয়াছে।

আমি যেন জাঁতাকলে পড়িয়া পিষ্ট হইতে লাগিলাম। যদি পরিচয় কেহ না পায়, তবে তৃতীয় শ্রেণীর যাত্রীর যে অসুবিধা তাহাই ভোগ করিতে হয়, আর যদি লোকে পরিচয় পায় তবে দর্শনার্থীর প্রেমদ্বারা পীড়িত হই। এই দুই অবস্থার মধ্যে কোনটা বেশী কৃপার যোগ্য তাহা অনেক সময় বলা শক্ত হইত। দর্শনার্থীর অন্ধ প্রেম আমাকে অনেকবার রাগাইয়াছে এবং তজ্জন্য মনে পীড়াও পাইয়াছি। তৃতীয় শ্রেণীর ভ্রমণে ক্লেশ পাইয়াছি, কিন্তু কখনও ক্রোধ হয় নাই এবং উহাতে আমার উন্নতিই হইয়াছে।

এই সময় আমার চলাফেরা করার শক্তি ভালই ছিল বলিয়া ঘুরিয়া বেড়াইতে পারিতাম। তখন এতটা প্রসিদ্ধ হই নাই বলিয়া রাস্তাতেও হাঁটিয়া চলিতে ফিরিতে পারিতাম। আমি ঘুরিয়া দেখিলাম যে,এখানকার যাত্রীদের মধ্যে ধর্ম্মভাব অপেক্ষা অন্যমনস্কতা, চঞ্চলতা, ভণ্ডামি,

অপরিচ্ছন্নতা খুবই বেশী। সাধুরা যেন মালপুয়া ও ক্ষীরখণ্ডী খাওয়ার জন্যই জন্ম লইয়া সেখানে অবতীর্ণ হইয়াছেন! এইখানে আমি পাঁচ-পা-ওয়ালা একটা গাই দেখিয়া আশ্চর্য্য হইলাম। অভিজ্ঞেরা আমার অজ্ঞতা শীঘ্রই দূর করিলেন। পাঁচ-পা-ওয়ালা গাই, দুষ্ট লোভী লোকের ব্যবসায়ের বলি। এই গাইয়ের কাঁধে জীয়ন্ত বাছুরের একটা পা কাটিয়া কাঁধের চামড়া তুলিয়া সেখানে উহা বসাইয়া সেলাই করিয়া জুড়িয়া দেওয়া হয়। এই জঘন্য পাপাচরণ করিয়া লোক ঠকাইয়া পয়সা উপার্জ্জন করা হয়। পাঁচ-পা-ওয়ালা গাভী দেখিতে কোন্ হিন্দুর না ইচ্ছা হয়? উহা দর্শন করার জন্য যতই দান করুক না কেন তাহা হিন্দুর কাছে কখনো বেশী বলিয়া মনে হইবে না।

কুম্ভের দিন আসিল। ঐ দিন আমার কাছে ধন্য। আমি পুণ্যের উদ্দেশ্যে হরিদ্বারে যাই নাই। তীর্থক্ষেত্রে পবিত্রতার অনুসন্ধানে যাওয়ার মোহ আমার কখনো ছিল না। মেলায় সতের লক্ষ লোক আসে বলিয়া শোনা যায়। এবং যে সতের লক্ষ লোক ওখানে গিয়াছিল তাহারা সকলেই কিছু ভণ্ড নয়। ইহার ভিতর অসংখ্য লোক যে পুণ্য অর্জ্জনের জন্য, শুদ্ধি পাওয়ার জন্য আসিয়াছিল তাহাতে সন্দেহ নাই। এই প্রকারের শ্রদ্ধা আত্মাকে কতটা উন্নত করিতে পারে, সে কথা বলা অসম্ভব না হইলেও বলা কঠিন।

শয্যায় পড়িয়া আমি আকাশ-পাতাল চিন্তা করিতেছিলাম। চতুর্দ্দিকের ভণ্ডামির ভিতর ঐ সকল পবিত্র আত্মাও ত রহিয়াছেন। তাঁহারা ঈশ্বরের কাছে নিষ্পাপ। যদি হরিদ্বারে আসাই পাপ হয় তবে কুম্ভের দিনে প্রকাশ্য ভাবেই আমার হরিদ্বার ত্যাগ করা উচিত। আর যদি কুম্ভে আসা ও দিন যাপন করা পাপজনক না হয়, তবে আমার

কোনও না কোনও কঠিন ব্রত লইয়া প্রবহমান পাপের প্রায়শ্চিত্ত করা উচিত—আত্মশুদ্ধি করা উচিত। আমার জীবন, ব্রতের উপরই গঠিত। আমি এখন কোনও কঠিন ব্রত লওয়া স্থির করিলাম। কলিকাতায় ও রেঙ্গুনে আমার জন্য অতিথি-সেবকদের অনাবশ্যক পরিশ্রমের কথা আমার স্মরণ আছে। সেইজন্য খাওয়ার দ্রব্যের একটা সীমা স্থির করিতে ও সূর্য্যাস্তের পূর্ব্বে আহার করার একটা ব্রত লওয়া স্থির করিলাম। আমি দেখিলাম, যদি এইরূপ একটা সীমা না ঠিক করি, তবে অতিথি-সেবকদের অসুবিধা হইবে এবং সেবা করার পরিবর্ত্তে প্রত্যেক জায়গাতেই আমিই লোককে সেবায় আট্‌কাইয়া রাখিব। সেই জন্য চব্বিশ ঘণ্টার মধ্যে পাঁচটার বেশী দ্রব্য না খাওয়ার এবং রাত্রে আহার বর্জ্জন করার ব্রত লইলাম। উভয় বিষয়েরই কঠিনতা সম্যক বিচার করিয়াই এই ব্রত লইলাম। আমি কোনও ফাঁক রাখিতে প্রস্তুত ছিলাম না। অসুখের সময় ঔষধ বলিয়া যাহা দেওয়া হয় তাহা বস্তু বলিয়া গণ্য করিব কিনা এই সমস্ত বিচার করিয়া লইলাম এবং নিশ্চয় করিলাম যে, খাওয়ার কোনও পদার্থই পাঁচের বেশী না হয়। আজ তের বৎসর এই দুইটি ব্রত পালন করিতেছি। উহারা আমাকে ঠিক পরীক্ষা করিয়া লইয়াছে। যেমন পরীক্ষা করিয়াছে তেমনি আবার উহারা আমাকে বর্ম্মের মত রক্ষাও করিয়াছে। এই ব্রত আমার জীবন দীর্ঘ করিয়াছে এইরূপ আমার বিশ্বাস। আর ঐ ব্রতের জন্য আমি অনেকবার ব্যাধি হইতেও মুক্ত হইয়াছি বলিয়া আমার মনে হয়।

৮

লছ্মন ঝোলা

পর্ব্বতপ্রমাণ বিশাল দেহ মহাত্মা মুনশীরামজীকে দর্শন করিয়া ও তাঁহার গুরুকুল দর্শন করিয়া শান্তি পাইলাম। হরিদ্বারের কোলাহল ও গুরুকুলের শান্তির মধ্যে ভেদ স্পষ্ট দৃষ্টিগোচর হইল। মহাত্মা আমাকে প্রেমে আবৃত করিলেন। ব্রহ্মচারীদের এমন হইল যে, তাঁহারা প্রেমবশতঃ আমার পাশ হইতে আর নড়িতে চাহেন না। রামদেবজীর সহিত এই সময় আমার সাক্ষাৎ হয়। আমি শীঘ্রই তাঁহার শক্তির পরিচয় পাইলাম। আমাদের মধ্যে কতকগুলি মতের পার্থক্য আছে দেখিতে পাইলাম। তাহা সত্ত্বেও আমাদের মধ্যে প্রেমের সম্বন্ধ গাঢ় হইল। গুরুকুলে ব্যাবহারিক শিক্ষা প্রবর্ত্তন করা সম্বন্ধে তাঁহার ও অন্য শিক্ষকদিগের সহিত অনেক আলোচনা হইল। গুরুকুল শীঘ্র ত্যাগ করিয়া আসিতে আমার দুঃখ হইল।

লছমন ঝোলার প্রশংসা আমি খুব শুনিয়াছিলাম। হৃষীকেশ না গিয়া হরিদ্বার ত্যাগ করিতে নাই বলিয়া অনেকে উপদেশ দিলেন। আমার সেখানে হাঁটিয়াই যাইতে ইচ্ছা, এই জন্য প্রথমে হৃষীকেশ ও পরে লছমন ঝোলা এই ভাবে দুইবারে এই পথ আমি হাঁটার ব্যবস্থা করিলাম।

হৃষীকেশে অনেক সন্ন্যাসী দেখা করিতে আসিতেন। তাঁহাদের মধ্যে একজন আমার প্রতি খুব আকৃষ্ট হইয়াছিলেন। 'ফিনিক্স'-মণ্ডল আমার সঙ্গে ছিল। তাহাদের সকলকে দেখিয়া তিনি অনেক প্রশ্ন করিতে লাগিলেন। আমাদের মধ্যে ধর্ম্ম-চর্চ্চা হইল। ধর্ম্মের প্রতি

আমার তীব্র আকর্ষণ রহিয়াছে ইহা তিনি দেখিতে পাইলেন। আমি গঙ্গাস্নান করিয়া আসিতেছিলাম, শরীর অনাবৃত ছিল। আমার মাথায় শিখা ও স্কন্ধে যজ্ঞোপবীত না দেখিয়া তাঁহার দুঃখ হইল, তিনি বলিলেন —"আপনি আস্তিক হইয়াও শিখা ও যজ্ঞোপবীত রাখেন না ইহা দেখিয়া আমার দুঃখ হইতেছে। উহা হিন্দুধর্ম্মের বাহ্য চিহ্ন এবং প্রত্যেক হিন্দুরই উহা ধারণ করা উচিত।"

দশ বৎসর বয়সের বালক যখন ছিলাম, তখন ব্রাহ্মণ বালকদের যজ্ঞোপবীতে বাঁধা চাবির ঝঙ্কারে আমার মন চঞ্চল হইত। ভাবিতাম, ঝুণ্ ঠুন্ শব্দকারী চাবির গোছা যজ্ঞোপবীতে ঝুলাইতে পারিলে না জানি কেমন মজা হইত! কাথিয়াওয়াড়ের বৈশ্য পরিবারে উপবীত ধারণ করার প্রথা তখন ছিল না। কিন্তু প্রথম তিন বর্ণের লোকের উপবীত ধারণ করা চাই—এইরূপ নূতন একটা মত প্রচার হইতেছিল। সেই মতে গান্ধী পরিবারের কয়েকজন যজ্ঞোপবীত ধারণ করিতেও আরম্ভ করিয়াছিলেন। যে ব্রাহ্মণ আমার দুই তিন বন্ধুকে রামরক্ষা পাঠ শিক্ষা দিতেন তিনি আমাকে উপবীত দেওয়াইলেন। আমার চাবি রাখার কোনও আবশ্যক না থাকিলেও আমি দুই তিনটা চাবি লট্‌কাইলাম। উপবীত ছিঁড়িয়া যাইতেই তাহার মোহও ছিন্ন হইল কিনা মনে নাই, তবে নূতন উপবীত আর পরি নাই। বয়স বাড়িলে ভারতবর্ষে ও দক্ষিণ আফ্রিকাতে অপরে আমাকে উপবীত ধারণ করাইতে চেষ্টা করিয়াছিলেন। কিন্তু আমার উপর তাঁহাদের যুক্তির প্রভাব হয় নাই। শূদ্র যদি না উপবীত ধারণ করিতে পারে, তবে অপর তিন বর্ণ কেন ধারণ করিবে? যে বাহ্য বস্তু ধারণ করা আমার পরিবারের রীতি ছিল না, তাহা গ্রহণ করার উপযোগী

কোনও সঙ্গত কারণ পাইলাম না। আমি উপবীতের অভাব বোধ করিতাম না, উহা ধারণ করার হেতুর অভাব বোধ করিতাম। বৈষ্ণব বলিয়া আমি কণ্ঠি পরিতাম। শিখা বড় ভাইয়েরা রাখিতেন। বিলাত গিয়া খোলা মাথায় শিখা দেখিয়া যদি গোরারা কখনো হাসে—এই লজ্জায় শিখা কাটিয়া ফেলিয়াছিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার ভ্রাতুষ্পুত্র ছগনলাল আমাদের সঙ্গে থাকিত। সে বড় শ্রদ্ধার সহিত শিখা রাখিত। শিখা থাকিলে তাহার সাধারণ সেবার কাজের অসুবিধা হইবে এই ভাবিয়া তাহার মনে দুঃখ দিয়াও তাহার শিখা কাটাইয়া ফেলিয়াছি। শিখায় আমার এইরূপ লজ্জা ছিল।

স্বামীজীকে আমি উপরের অবস্থা শুনাইলাম এবং বলিলাম—"উপবীত আমি ধারণ করিব না। অসংখ্য হিন্দু যাহা না পরিলেও হিন্দু বলিয়া গণ্য হয়, তাহা পরার আবশ্যকতা আমি দেখি না। উপবীত ধারণ করা মানে দ্বিতীয় জন্ম লওয়া, নিজেকে ইচ্ছাপূর্ব্বক শুদ্ধ রাখা, উর্দ্ধগামী হওয়া। এখন হিন্দুস্থানী ও হিন্দুস্থান উভয়েই পতিত, এমত অবস্থায় উপবীত গ্রহণের মত অধিকার আছে কি? ভারতবর্ষ যদি অস্পৃশ্যতার ময়লা ধুইয়া ফেলে, উচ্চনীচের কথা ভুলিয়া যায়, গৃহের অন্য দোষ দূর করে, চতুর্দ্দিকে যে অধর্ম্ম ও ভণ্ডামি বিস্তৃত রহিয়াছে তাহা দূর করে, তবেই তাহার উপবীতে অধিকার আসে। এই উপবীত গ্রহণের কথা আমি এখন মানিয়া লইতে পারি না। কিন্তু শিখা-সম্বন্ধে আপনার কথা অবশ্য বিচার করিব। আমি ত শিখা রাখিতাম। আমি লজ্জা ও স্বার্থের ভয়ে উহা কাটিয়া ফেলিয়াছি। উহা ধারণ করা দরকার একথা এখন আমার মনে হয়। সুতরাং আমার সাথীদের সহিত একথার আলোচনা করিব।"

উপবীত সম্বন্ধে আমার যুক্তি স্বামীজীর পছন্দ হইল না। আমি যে সকল কারণে উহা না পরাই উচিত মনে করি, তিনি সেই সকল কারণেই উহা গ্রহণ করিতে বলেন। উপবীত-সম্বন্ধে হৃষীকেশে যে ধারণা মনে আসিয়াছিল আজও তাহাই বজায় আছে। যতদিন পর্য্যন্ত বিভিন্ন ধর্ম্ম আছে, ততদিন পর্য্যন্ত প্রত্যেক ধর্ম্মেরই বাহ্যিক চিহ্নের আবশ্যকতা আছে, কিন্তু যখন সেই চিহ্ন আড়ম্বরের হেতু হয় কিংবা নিজের ধর্ম্ম অপরের ধর্ম্ম, অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ বলিয়া গণ্য করার হেতু হয়, তখন তাহা ত্যাজ্য হইয়া পড়ে। এইজন্য উপবীত-ধারণ হিন্দু ধর্ম্মকে উন্নত করিবার কোনও সাধন নহে। আর সেই জন্যই এ বিষয়ে আমি নির্ব্বিকার আছি। আমি লজ্জা-বশে শিখা ত্যাগ করিয়াছিলাম, সেই জন্য সঙ্গীদের সহিত আলোচনা করিয়া শিখা রাখার সঙ্কল্প করিলাম। এখন আমাদিগকে লছ্‌মন ঝোলা যাইতে হইবে।

হৃষীকেশ ও লছ্‌মন ঝোলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্য বড়ই মনোরম। এখানে আসিয়া, আমাদের পূর্ব্বপুরুষদের সৌন্দর্য্য বোধ সম্বন্ধে, তাঁহাদের কলাশিল্প বিষয়ে, ধার্ম্মিক দৃষ্টি সম্বন্ধে এবং তাঁহাদের দূরদর্শিতা সম্বন্ধে আমার প্রগাঢ় শ্রদ্ধা জন্মিল।

মানুষের কাণ্ড দেখিয়া কোথাও চিত্তে শান্তি আসে না। যেমন হরিদ্বারে তেমনি হৃষীকেশে লোকে গঙ্গার সুন্দর তীর নোংরা করিয়া রাখে। গঙ্গার পবিত্র জল কলুষিত করিতে তাহাদের সঙ্কোচ হয় না। পায়খানায় যাওয়ার আবশ্যক হইলে দূরে না গিয়া, যেখানে মানুষের যাতায়াত সেইখানেই যায়। ইহা দেখিয়া হৃদয়ে বড় আঘাত লাগে।

লছ্‌মন ঝোলায় যাইতে লোহার পুল দেখিলাম। লোকের নিকট শুনিলাম যে, এই পুল পূর্ব্বে খুব মজবুত দড়ির তৈরী ছিল। কোন

উদারচিত্ত মারওয়াড়ী গৃহস্থ উহাকে ফেলিয়া দিয়া অনেক খরচ করিয়া লোহার পুল তৈরী করিয়া উহার চাবি সরকারের হাতে দিয়াছেন। দড়ির পুল কেমন ছিল, সে সম্বন্ধে আমার কোনও ধারণা নাই। কিন্তু লোহার পুল স্থানীয় প্রাকৃতিক সৌন্দর্য্যকে কলুষিত করিয়াছে, ইহা অনেকের চোখেই লাগিত। যাত্রীদিগের এই রাস্তার চাবি সরকারের হাতে সমর্পণ করাটা আমার তখনকার দিনের রাজভক্তিতেও অসহ্য বোধ হইয়াছিল।

এখানে স্বর্গাশ্রমের দৃশ্য সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখদায়ক। করোগেট টীনের কতকগুলি কদর্য্য কুঠরীর নাম স্বর্গাশ্রম দেওয়া হইয়াছে। সাধকদের জন্য উহা নির্ম্মাণ করা হইয়াছে বলিয়া শুনিলাম। সেখানে কদাচিৎ কোনও সাধক এ সময়ে থাকে। এখানকার প্রধান গৃহে যাঁহারা ছিলেন, তাঁহারা নিজেদের সম্বন্ধে আমার মনে ভাল ধারণা জন্মাইতে পারেন নাই।

যাহা হউক, হরিদ্বারের অভিজ্ঞতা আমার নিকট অমূল্য। আমি কি করিব, কোথায় বসিব—এ বিষয়ে হরিদ্বারের অভিজ্ঞতা আমাকে খুব সাহায্য করিয়াছিল।

৯

আশ্রম স্থাপনা

কুম্ভমেলায় যাওয়াতে আমার দ্বিতীয়বার হরিদ্বার দর্শন হইয়াছিল। সত্যাগ্রহাশ্রম ১৯১৫ সালের ২৫শে মে স্থাপিত হয়। শ্রদ্ধানন্দজীর অভিপ্রায় ছিল যে, আমি হরিদ্বারে বসি। কলিকাতার কয়েকজন মিত্র আমাকে বৈদ্যনাথধামে বসিতে বলিয়াছিলেন, আবার কতক মিত্রের আমাকে রাজকোটে বসাইবার খুব আগ্রহ ছিল।

যখন আমি আহ্‌মেদাবাদের ভিতর দিয়া যাইতেছিলাম তখন অনেক মিত্র আহ্‌মেদাবাদকেই পছন্দ করিতে বলিলেন। আশ্রমের খরচা তাঁহারাই সংগ্রহ করিয়া দিবেন বলিলেন। বাড়ী খোঁজ করিয়া দেওয়ার ভারও তাঁহারাই লইতে চাহিলেন। আহ্‌মেদাবাদের জন্য আমার আকর্ষণ ছিল। গুজরাটী বলিয়া গুজরাটী ভাষার সাহায্যেই আমি সর্ব্বাপেক্ষা বেশী সেবা দিতে পারিব—এইরূপ মনে করিতাম। আহ্‌মেদাবাদ এককালে হাতের তাঁতে বোনা কাপড়ের কেন্দ্র ছিল বলিয়া এখানেই হাতে সূতা কাটা—এই গৃহশিল্পের পুনরুদ্ধারের কাজ সব চাইতে ভাল চলিতে পারিবে বলিয়া আমার বিশ্বাস্ হয়। গুজরাটের প্রধান নগর বলিয়া এইখানেই ধনাঢ্য লোক ধনদ্বারাও সাহায্য করিতে পারিবেন—এ আশাও ছিল।

আহ্‌মেদাবাদের মিত্রদিগের সহিত স্বভাবতঃই অস্পৃশ্যতার সম্বন্ধে আলোচনা হইত। আমি স্পষ্ট ভাষায় বলিতাম যে, কোনও অন্ত্যজ

ভাই আশ্রমে প্রবেশ করিতে চাহিলে তাহাকে অবশ্যই আশ্রমভুক্ত করিয়া লওয়া হইবে।

"আপনার সর্ত্ত পালন করিতে পারে এমন অন্ত্যজই বা কোথায় পড়িয়া আছে?"—এই বলিয়া এক বৈষ্ণব মিত্র নিজের মনের আনন্দ জানাইলেন। অবশেষে আমি আহ্‌মেদাবাদে বসাই স্থির করিলাম।

বাড়ী খুঁজিতে আমাকে আহ্‌মেদাবাদবাসীদের মধ্যে শ্রীজীবনলালজী ব্যারিষ্টারই বেশী সাহায্য করিয়াছিলেন। তাঁহারই কোচরবের বাড়ী ভাড়া লওয়া স্থির করিলাম।

আশ্রমের কি নাম রাখা হইবে এ প্রশ্ন শীঘ্রই উঠিল। মিত্রদের সহিত আলোচনা করিলাম। কতকগুলি নাম পাওয়া গেল। সেবাশ্রম, তপোবন, ইত্যাদির প্রস্তাব আসিল। সেবাশ্রম নামটি ভাল ছিল, কিন্তু তাহাতে সেবার রীতির পরিচয় দেওয়া হয় না। তপোবন নাম পছন্দ হইল না, কেননা এই নাম প্রিয় হইলেও উহা আমাদের পক্ষে গুরুতর নাম বলিয়া মনে হইল। আমাদের ত সত্যের পূজা, সত্যের অনুসন্ধান করিতে হইবে, তাহারই আগ্রহ রাখিতে হইবে, এবং দক্ষিণ আফ্রিকায় আমি যে পদ্ধতির ব্যবহার করিয়াছিলাম, তাহার পরিচয় ভারতবর্ষকে দিতে হইবে, তাহার শক্তি কত ব্যাপক হইতে পারে তাহা দেখিতে হইবে। সেই হেতু আমি ও সঙ্গীরা 'সত্যাগ্রহ' নামই পছন্দ করিলাম। উহাতে সেবার ভাব ও সেবার পদ্ধতির ভাব সহজেই ব্যক্ত হয়।

আশ্রম চালাইবার জন্য নিয়মাবলীর আবশ্যক। সেইজন্য নিয়মাবলী তৈরী করিয়া সে সম্বন্ধে বন্ধুদের মত জিজ্ঞাসা করিলাম। অনেক অভিমতের ভিতর সার গুরুদাস ব্যানার্জ্জীর প্রেরিত অভিমত আমার

স্মরণ আছে। তাঁহার এই নিয়মাবলী পছন্দ হইয়াছিল। তিনি প্রস্তাব করিয়া পাঠাইয়াছিলেন যে, ব্রতের ভিতর 'নম্রতা' একটা ব্রত থাকা চাই। তাঁহার পত্রের ভিতর এই ভাব ফুটিয়া উঠিয়াছিল যে, আমাদের যুবকদের ভিতর নম্রতার অভাব আছে। যদিও নম্রতার অভাব আমি ভালরকমই অনুভব করিতেছিলাম, তথাপি নম্রতাকে ব্রতের মধ্যে স্থান দিলে, নম্রতারই নষ্ট হওয়ার আশঙ্কা থাকে। নম্রতার সম্পূর্ণ অর্থ ত আত্মাভিমানশূন্যতা। এই অভিমানশূন্যতায় পঁহুছানোর জন্যই অন্য সকল ব্রত। অভিমানশূন্যতা মোক্ষ প্রাপ্তিরই অবস্থা। মুমুক্ষুর বা সেবকের প্রত্যেক কাযে যদি নম্রতা বা নিরভিমানিতা না থাকে, তবে সে মুমুক্ষু নয়,—সেবক নয়, সে স্বার্থপর, সে অহঙ্কারী।

আশ্রমে এই সময় প্রায় ১৩ জন তামিল ছিলেন। আমার সহিত দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে পাঁচ জন তামিল বালক আসিয়াছিল, আর বাকী কয়জন ছিলেন স্থানীয় লোক। ২৫ জন স্ত্রী-পুরুষ লইয়া আশ্রম আরম্ভ হইল। সকলে এক পাকশালায় খাইত এবং একই পরিবারের মত চলার চেষ্টা করিত।

১০

কষ্টিপাথরে পরীক্ষা

আশ্রম-স্থাপনার কয়েক মাস পরেই এমন এক পরীক্ষা আমাদের সম্মুখে উপস্থিত হইল যাহা কখনও আশা করি নাই। ভাই অমৃতলাল ঠক্কর পত্র দিলেন,—"এক গরীব ও সৎ অন্ত্যজ পরিবার আছে। আপনার আশ্রমে আসিয়া থাকার তাহাদের ইচ্ছা হইয়াছে। সেই পরিবারকে কি লইবেন?"

আমি বিচলিত হইলাম। ঠক্কর বাপার ন্যায় লোকের নিকট হইতে পরিচয়পত্র লইয়া অন্ত্যজ পরিবার এখানে থাকিতে আসিবে, তাহা আমি আশা করি নাই। সাথীদিগকে পত্র পড়িয়া শুনাইলাম। তাঁহারা খুসী হইয়া সম্মতি জানাইলেন। ভাই অমৃতলাল ঠক্করকে জানাইলাম যে, সে পরিবার যদি আশ্রমের নিয়ম মানিয়া চলিতে প্রস্তুত হয়, তবে তাহাদিগকে লওয়া যাইতে পারে।

দুদাভাই, তাঁহার পত্নী দানীবহিন এবং একরত্তি মেয়ে লক্ষ্মী—এই পরিবারটি আশ্রমে আসিলেন। দুদাভাই বোম্বাইয়ে শিক্ষকের কাজ করিতেন। তাঁহারা নিয়ম পালন করিতে প্রস্তুত হওয়ায় আশ্রমে লওয়া গেল।

যে বন্ধুমণ্ডল সাহায্য করিতেছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। যে কূপ হইতে বাংলোর মালিক জল লইতেন সে কূপ হইতে জল লওয়ার অসুবিধা হইল। যে ব্যক্তি জল উঠানোর জন্য মালিকের তরফ হইতে নিযুক্ত ছিল, সে তাহার বৃহৎ জলপাত্রে

(কোষে) আমাদের জলের ছিঁটা পড়িবে বলিয়া আপত্তি তুলিল। তারপর আমাদিগকে গালি দিতে আরম্ভ করিল, দুদাভাইকে পীড়ন করিতে আরম্ভ করিল। আমি সকলকে বলিয়া দিলাম যে, গালি সহ্য করিবে ও দৃঢ়তার সহিত জলও তুলিবে। আমরা গালি সহ্য করিতেছি দেখিয়া জলের কোষ-ওয়ালা লজ্জা পাইল এবং বিরক্ত করা বন্ধ করিল। টাকা-পয়সার সাহায্য আসাও বন্ধ হইয়া গিয়াছিল। যে ভাই, অন্ত্যজেরা আশ্রমের নিয়ম পালন করিবে না বলিয়া প্রথমেই সন্দেহ করিয়াছিলেন, তাঁহার আশা ছিল না যে, সত্যই আশ্রমে কোনও অন্ত্যজ প্রবেশ করিবে। টাকার সাহায্য বন্ধ হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে আমাদিগকে 'বয়কট' করার কথাও শোনা যাইতে লাগিল। আমি সাথীদিগের সহিত আলোচনা করিয়া এই সিদ্ধান্তে আসিলাম—"যদি আমাদিগকে সমাজ হইতে বহিষ্কার করা হয়, আর আমাদের নিকট কোনও সাহায্য না আসে তাহা হইলেও আমরা আহ্‌মেদাবাদ ত্যাগ করিব না। অন্ত্যজদিগের পাড়ায় গিয়া তাহাদের সহিতই থাকিব, আর যাহা কিছু পাওয়া যায় তাহার উপর নির্ভর করিব, অথবা মজুরী করিয়া দিন চালাইব।"

অবশেষে একদিন মগনলাল আমাকে নোটিশ দিলেন—"আগামী মাসের আশ্রম চালাইবার খরচা আমাদের নিকটে নাই।" আমি ধৈর্য্যের সহিত উত্তর দিলাম—"তবে আমাদিগকে অন্ত্যজ পাড়ায় উঠিয়া যাইতে হইবে।" এইরূপ পরীক্ষা আমার এই প্রথম নহে। প্রত্যেকবারেই শেষ অবস্থায় ঈশ্বর সাহায্য পাঠাইয়াছেন।

মগনলালের নোটিশ দেওয়ার দুই একদিন পরেই এক প্রাতঃকালে কোনও বালক সংবাদ দিল, "বাহিরে মোটর দাঁড়াইয়া আছে, ও এক

শেঠ আপনাকে ডাকিতেছেন।” আমি মোটরের নিকটে গেলাম। শেঠ আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন—“আশ্রমে কিছু সাহায্য করার ইচ্ছা করি, আপনি কি লইবেন?” আমি জবাব দিলাম—“যদি কিছু দেন, তবে আমি অবশ্যই লইব, আমাকে স্বীকার করিতে হইবে যে, এখন আমি পরীক্ষায় পড়িয়াছি।”

“আমি কাল এই সময় আশ্রমে আসিব, আপনি কি তখন আশ্রমে থাকিবেন?” আমি ‘হাঁ’ বলিলে শেঠ চলিয়া গেলেন। দ্বিতীয় দিন নির্দ্দিষ্ট সময় মোটরের আওয়াজ শোনা গেল। বালকেরা খবর দিল। শেঠ ভিতরে আসিলেন না; আমি তাঁহার সহিত দেখা করিতে গেলাম। তিনি আমার হাতে ১৩০০০৲ তের হাজার টাকার নোট দিয়া চলিয়া গেলেন।

এই সাহায্যের আশা আমি কখনো করি নাই। সাহায্য দেওয়ার এই রীতি নূতন লাগিল। তিনি আশ্রমে পূর্ব্বে কখনো পা দেন নাই। আমি তাঁহার সহিত একবার মাত্র মিশিয়া ছিলাম বলিয়া মনে হয়। আশ্রমে আসা নাই, জিজ্ঞাসা করা নাই; সোজা টাকা দিয়া চলিয়া গেলেন। এ রকম অভিজ্ঞতা আমার এই প্রথম। এই সাহায্য পাওয়ার ফলে আমাদের অন্ত্যজ পাড়ায় যাওয়া বন্ধ হইল, প্রায় এক বৎসরের খরচ পাওয়া গিয়াছিল।

বাহিরে যেমন গোলমাল হইয়াছিল, আশ্রমের ভিতরেও তেমনি চাঞ্চল্য ছিল। দক্ষিণ আফ্রিকাতে আমার নিকট অন্ত্যজ আসিত, থাকিত, খাইত, কিন্তু এখানে অন্ত্যজ যে একেবারে পরিবারের ভিতর প্রবেশ করিল, তাহা আমার স্ত্রীর ও অপর স্ত্রীলোকদিগের ভাল লাগিয়াছিল, একথা বলা যায় না। দানীবহিনের প্রতি অপ্রীতি

না হোক্ উদাসীনতা আমি চোখে ও কানে দেখিতে ও শুনিতে লাগিলাম। আর্থিক সাহায্যের অভাবের জন্য আমি মোটেই চিন্তায় পড়ি নাই, কিন্তু এই ভিতরের গোলমাল আমাকে বড়ই আঘাত করিল। দানীবহিন সাধারণ স্ত্রীলোক ছিলেন। দুদাভাই অল্প শিক্ষিত ছিলেন, কিন্তু বুদ্ধিমান লোক ছিলেন। তাঁহার ধৈর্য্য আমার ভাল লাগিত। তাঁহার কখনও কখনও ক্রোধ হইত; তাহা হইলেও তাঁহার সহ্যশক্তি আমার মনে দৃঢ় ভাবে মুদ্রিত হইয়াছিল। অল্পস্বল্প অপমান সহ্য করিয়া যাইতে আমি দুদাভাইকে মিনতি করিতাম; তাহা নিজে তিনি বুঝিতেন ও দানীবহিনকে দিয়া সহ্য করাইতেন।

এই পরিবারকে আশ্রমে রাখিয়া আশ্রমের বেশ শিক্ষা হইয়াছিল। আশ্রমে যে অস্পৃশ্যতার স্থান নাই তাহা আরম্ভ-কালেই স্পষ্ট হইয়া যাওয়ায় আশ্রমের কর্ম্ম-সীমা নির্দ্দিষ্ট হইয়া গিয়াছিল। এই দিক্ দিয়া আশ্রমের কাজও খুব সহজ হইয়া গিয়াছিল।

অস্পৃশ্য পরিবার লইলেও আশ্রমের দিনদিন যে খরচা বাড়িয়া যাইতেছিল, সে খরচার প্রধান অংশই নিষ্ঠাবান্ হিন্দুদের নিকট হইতে পাওয়ায় ইহা স্পষ্ট বুঝিতে পারা গেল যে, অস্পৃশ্যতার মূল আল্‌গা হইয়া গিয়াছে। উহার আরো অনেক প্রমাণ আছে। কিন্তু যেখানে অন্ত্যজের হাতে খাওয়া পর্য্যন্ত চলিতেছে সেখানে, যাঁহারা সনাতনী হিন্দু বলিয়া গণ্য তাঁহারাও সাহায্য করিতেছেন, ইহা কম প্রমাণ নয়।

এই প্রশ্ন-সংক্রান্ত অন্য অসুবিধা, উহা হইতে উদ্ভূত অন্য সূক্ষ্ম প্রশ্ন ও নানা অপ্রত্যাশিত বাধা-প্রাপ্তি ইত্যাদি সত্যের অনুসন্ধানের ও প্রয়োগের ব্যাপার এখানে লেখার ইচ্ছা থাকিলেও দেওয়া যাইতেছে

না বলিয়া আমার দুঃখ হইতেছে। ইহার পরবর্ত্তী অধ্যায় সম্বন্ধেও এই দোষ থাকিয়া যাইবে। আমাকে অগত্যা অনেক প্রয়োজনীয় ঘটনার বর্ণনা বাদ দিতে হইবে, কেননা তাহাতে যাঁহারা জড়িত তাঁহারা জীবিত আছেন। তাঁহাদের অনুমতি ব্যতীত তাঁহাদের নামের সহিত যুক্ত প্রসঙ্গের উল্লেখ করা উচিত মনে হয় না। সেই সকল ব্যক্তির সম্মতি যখন তখন চাহিয়া লওয়া অথবা তাহাদের সম্বন্ধে কিছু উল্লেখ করিবার পূর্ব্বে তাঁহাদিগকে দেখাইয়া লওয়া সম্ভব নয় এবং ঐ প্রকার করাও এই আত্মকথার সীমার বহির্ভূত। সেইজন্য অতঃপর যে সকল সত্যের অনুসন্ধান এবং প্রয়োগ জানাইবার যোগ্য বলিয়া মনে হইবে তাহা অসম্পূর্ণ হইলেও, এই অসম্পূর্ণতা রাখিয়াই উল্লেখ করিয়া যাইতে হইবে বলিয়া আশঙ্কা করিতেছি। তবুও যদি ঈশ্বর করেন, তবে অসহযোগের যুগ পর্য্যন্ত পঁহুছিব এই প্রকার আমার ইচ্ছা ও আশা আছে।

১১

এগ্রিমেণ্ট প্রথা

নূতন প্রতিষ্ঠার সঙ্গে সঙ্গেই বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ ঝড়ের মধ্য দিয়া যে আশ্রম উত্তীর্ণ হইতেছিল তাহার কথা এখন রাখিয়া, এগ্রিমেণ্ট প্রথার সম্বন্ধে কিছু আলোচনা করা আবশ্যক হইয়াছে। যে সকল ভারতীয় মজুর পাঁচ বৎসর, বা কখনও তাহার চাইতে কম সময়ের জন্য কাজ করিবার চুক্তিপত্র (এগ্রিমেণ্ট) সহি করিয়া এ দেশ হইতে বিদেশে যায় তাহাদিগকে 'এগ্রিমেণ্টী' বলা হয়।

১৯১৪ সালেই নাতালের এগ্রিমেণ্টীদের উপর হইতে বার্ষিক তিন পাউণ্ড কর রদ করা হইয়াছিল। কিন্তু ঐ এগ্রিমেণ্ট প্রথা তখন পর্য্যন্তও বন্ধ হয় নাই। সন ১৯১৬ সালে ভারতভূষণ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য ব্যবস্থাপক-সভায় এই প্রশ্ন তোলেন, তদুত্তরে লর্ড হার্ডিং তাঁহার নির্দ্ধারণ স্বীকার করিয়া লইয়া প্রকাশ করেন যে, এই প্রথা, "সময় হইলে" তুলিয়া দেওয়ার আশ্বাস তিনি মহামান্য সম্রাটের নিকট হইতে পাইয়াছেন। কিন্তু আমার মনে হইল, এই প্রথা এখনই বন্ধ করার জন্য চেষ্টা করা দরকার। বস্তুতঃ কেবল ভারতবর্ষের অসাবধানতা বশতঃই এই প্রথা এতদিন চলিয়া আসিতেছে। এখন এই প্রথা বন্ধ করিয়া দেওয়ার মত জাগরণ ভারতবাসীর মধ্যে আসিয়াছে। ইহাই আমার ধারণা ছিল। কয়েকজন নেতার সহিত সাক্ষাৎ করিলাম, সংবাদপত্রেও এ বিষয় লিখিলাম, এবং আমি দেখিলাম যে, এই প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার পক্ষে লোকমত রহিয়াছে। ইহাতে

কি সত্যাগ্রহের প্রয়োগ হইতে পারে? এ বিষয়ে আমার সন্দেহ ছিল না যে, সত্যাগ্রহ প্রয়োগ করা যায়। কিন্তু কেমন করিয়া উহা প্রয়োগ করা যায় তাহা আমি জানিতাম না।

ইতিমধ্যে ভাইস্‌রয় (বড়লাট) "সময় হইলে" শব্দের অর্থ পরিষ্কার করিয়া লইয়াছেন। তিনি ইহার এই অর্থ প্রকাশ করিয়া বলিয়াছেন যে, "অন্য ব্যবস্থা করিতে যত সময় লাগে তত সময়ের পর" এই প্রথা উঠাইয়া দেওয়া হইবে।

অতঃপর ১৯১৭ সালের ফেব্রুয়ারীতে পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য এগ্রিমেণ্ট প্রথা এখনই উঠাইয়া দেওয়ার জন্য এক আইন করার প্রস্তাব ব্যবস্থাপক সভায় উত্থাপন করার নিমিত্ত ভাইস্‌রয়ের অনুমতি চান। তিনি উহা নামঞ্জুর করিলেন। ইহার পরই এই প্রশ্ন লইয়া আমি ভারতবর্ষে ভ্রমণ আরম্ভ করিলাম।

আন্দোলন আরম্ভ করার পূর্ব্বে ভাইস্‌রয়ের সহিত সাক্ষাৎ করিয়া লওয়া উচিত মনে করিলাম। তিনি জিজ্ঞাসামাত্রই আমার সহিত দেখা করার তারিখ জানাইয়া দিলেন। সেই সময় মিঃ মফী, এক্ষণে সার জন মফী, তাঁহার সেক্রেটারী ছিলেন। মিঃ মফীর সহিত আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হইয়াছিল। লর্ড চেমস্‌ফোর্ডের সহিত আমার সন্তোষজনক কথাবার্ত্তা হয়। তিনি নিশ্চয় করিয়া কিছু বলিতে পারিলেন না, কিন্তু আমাকে সাহায্য করিবেন বলিয়া আশা দিলেন।

বোম্বাই হইতেই ভ্রমণ আরম্ভ করিলাম। বোম্বাইয়ে সভা করার ভার মিঃ জাহাঙ্গীর পেটিট লইলেন। 'ইম্পিরিয়াল সিটিজন-সিপ্ এসোসিয়েস্‌নের' নামে সভা হইল। ঐ এসোসিয়েসনের কমিটি হইতে সভার প্রস্তাব নির্দ্ধারিত হইল। ঐ কমিটির সভায় ডাক্তার রীড্,

সার্ লালুভাই সমলদাস, মিঃ নটরাজন্ ইত্যাদি ছিলেন। মিঃ পেটিট্ ত ছিলেনই। নির্দ্ধারণে 'এগ্রিমেণ্ট' রদ করার জন্য মিনতি ছিল, কেন বন্ধ করা দরকার তাহাও বলা হইয়াছিল। কমিটির সম্মুখে ঐ প্রথা রদ করার সময়-সম্বন্ধে তিনটি প্রস্তাব ছিল;—'যত শীঘ্র হয় তত শীঘ্র', '৩১শে জুলাইয়ের মধ্যে', 'শীঘ্র'। আমার প্রস্তাব ছিল "৩১শে জুলাই।" আমার নিশ্চিত একটা তারিখেরই দরকার ছিল, কেননা সেই সময়ের মধ্যে যদি কিছু না হয়, তবে কি করিব অথবা কি করিতে পারি তাহা তখন বিচার করা যাইবে। সার লালু ভাইয়ের প্রস্তাব ছিল 'শীঘ্র' ব্যবহার করা। তিনি বলিলেন যে, ৩১শে জুলাই অপেক্ষা 'শীঘ্র'ত অনেক পূর্ব্বেই বুঝায়। আমি বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, জনসাধারণ 'শীঘ্র' শব্দ বুঝিতে পারিবে না। জনসাধারণের নিকট হইতে যদি কোনও কাজ আদায় করিতে হয়, তবে তাহাদের সম্মুখে নিশ্চয়াত্মক শব্দ থাকা চাই। 'শীঘ্র' শব্দের অর্থ ত প্রত্যেকেই নিজ নিজ ইচ্ছানুরূপ করিয়া লইবে। সরকার এক রকম অর্থ করিবেন, জনসাধারণ আর এক প্রকার করিবে। "৩১শে জুলাইয়ের" অর্থ সকলেই একই প্রকার বুঝিবে, ও সেই তারিখে যদি 'এগ্রিমেণ্ট' না উঠিয়া যায়, তবে নিজেরা কি উপায় গ্রহণ করিবে তাহা বুঝিতে পারিবে। ডাঃ রীড্ এই যুক্তি তখনই বুঝিলেন। অবশেষে সার লালু ভাইও '৩১শে জুলাই' তারিখ স্বীকার করায়, সেই তারিখই স্থির রহিল। সাধারণ সভায় এই নির্দ্ধারণ গৃহীত হইল ও পরে অন্য সকল সভাতেও তাহাই গৃহীত হইল।

শ্রীমতী জায়জী পেটিটের বিপুল অধ্যবসায়ের ফলে ভাইসরয়ের নিকট এক 'ডেপুটেশন' গেল। তাহাতে লেডী তাতা, ৺দিলশাদ বেগম ইত্যাদি ছিলেন। ভগ্নীগণের সকলের নাম মনে নাই। এই

ডেপুটেশনের প্রভাব খুব ভাল হইয়াছিল, কেননা, 'ভাইসরয়' খুব আশাপ্রদ উত্তর দিয়াছিলেন।

কলিকাতা, করাচী প্রভৃতি স্থানে আমি গিয়াছিলাম। সকল স্থানেই ভাল সভা হইয়াছিল। সকল স্থানের লোকই খুব উৎসাহ দেখাইতেছিল। যখন আন্দোলন আরম্ভ করিয়াছিলাম তখন এত সভা হইবে এবং এত সংখ্যক লোক তাহাতে যোগ দিবে, সে আশা করি নাই।

এই সময় আমি একক ভ্রমণ করিতাম ও তাহাতে আশ্চর্য্য অভিজ্ঞতাও হইত। ডিটেক্‌টিভ ত পিছনে লাগিয়াই ছিল। ইহাদের সহিত আমার তক্‌রার করার কারণ ছিল না। আমার কিছু লুকাইবার নাই, এইজন্য তাহারা আমাকে অসুবিধায় ফেলে নাই, আমিও তাহাদিগকে কষ্ট দিই নাই। সৌভাগ্যবশতঃ এই সময়ে আমার 'মহাত্মা' ছাপ প্রাপ্তি ঘটে নাই, যদিও যেখানেই লোকে আমাকে চিনিত সেই-খানেই ঐ নামে চীৎকারের সোর পড়িত। একবার রেলে যাইতে কয়েকটি ষ্টেশনে ডিটেক্‌টিভ আমার টিকিট দেখিতে আসে ও নম্বর টুকিয়া লয়। তাহারা অনেক প্রশ্নও করিতেছিল এবং আমি তৎক্ষণাৎ তাহার জবাবও দিতেছিলাম। আশেপাশের যাত্রীরা ভাবিল, আমি কোনও সাধু অথবা ফকীর। দুই চার ষ্টেশনে ডিটেক্‌টিভ্‌ আসিতেই যাত্রীরা তাহার উপর রাগিয়া উঠিল এবং গালি ও ধমক দিতে লাগিল। "এই বেচারা সাধুকে মিছামিছি কেন কষ্ট দিতেছ?" আমার দিকে তাকাইয়া বলিল—"এই বদ্‌মাসকে টিকিট দেখাইও না।"

আমি বিনয় করিয়া যাত্রীদিগকে বলিলাম—"টিকিট দেখিতেছে তাহাতে আমার কোনও লোকসান নাই; তাহার প্রতি যাহা আদেশ

আছে সে তাহাই পালন করিতেছে, তাহাতে আমার কোনও দুঃখ নাই।" যাত্রীদের একথা পছন্দ হইল না। তাহারা আমার প্রতি দয়া প্রকাশ করিতে লাগিল এবং পরস্পর বলিতে লাগিল যে, নির্দোষ মানুষকে কেন এমন করিয়া হয়রাণ করা হয়।

বলিতে গেলে, ডিটেক্‌টিভেরা ত আমাকে কিছুই কষ্ট দেয় নাই। ক্লেশ রেলে ভিড়ের জন্যই লাহোর হইতে দিল্লীর মধ্যে খুব হইয়াছিল। করাচী হইতে কলিকাতা লাহোর হইয়া যাইতে হয়। লাহোরে ট্রেন বদ্‌লাইতে হয়। এই ট্রেনে কোথাও উঠিবার জায়গা ছিল না। যাত্রীরা জোর করিয়া উঠিতেছিল। দরজা বন্ধ থাকে ত জানালা দিয়া ভিতরে প্রবেশ করে। আমার কলিকাতায় নির্দ্দিষ্ট তারিখে পঁহুছিবার কথা। এই ট্রেন ফেল করিলে সময়মত কলিকাতা পঁহুছানো হয় না। আমি জায়গা পাওয়ার আশা ছাড়িয়া দিলাম। কেহই আমাকে নিজেদের গাড়ীতে লয় না। একজন মুটিয়া আমাকে জায়গা খুঁজিতে দেখিয়া বলিল—"আমাকে বারো আনা দাও ত জায়গা করিয়া দিব।" বলিলাম —"জায়গা যদি করিয়া দিতে পার তবে অবশ্য বারো আনা দিব।" বেচারা মুটিয়া যাত্রীদিগকে হাতজোড় করিয়া মিনতি করিতে লাগিল, কিন্তু কেহই আমাকে প্রবেশ করিতে দিতে প্রস্তুত নয়। ট্রেন তখন প্রায় ছাড়ে। এক কামরা হইতে কয়েকজন যাত্রী বলিল—"ইহার ভিতর জায়গা নাই, তবে ইহার ভিতর ঢুকাইয়া দিতে পার ত দাও, দাঁড়াইয়া থাকিতে হইবে।" মুটিয়া বলিল—"কি বলেন?" আমি "হাঁ" বলাতে আমাকে তুলিয়া সে জানালা দিয়া গলাইয়া দিল। আমি ভিতরে প্রবেশ করিতে পারিলাম, সেই মুটিয়াও বারো আনা রোজগার করিল।

সে রাত্ আমার বড়ই কষ্টে কাটিয়াছিল। অন্য যাত্রীরা যেমন-তেমন করিয়া বসিয়া গেল। আমি উপরের বাঙ্কের শিকল ধরিয়া দুই ঘণ্টা দাঁড়াইয়া রহিলাম। ইতিমধ্যে কয়েকজন যাত্রী ধম্‌কাইতে লাগিল—"আরে, এখনো বসিতেছ না কেন?" আমি তাহাদিগকে বুঝাইতে চেষ্টা করিলাম যে, বসিবার স্থান নাই। কিন্তু আমার দাঁড়াইয়া থাকা তাহারা সহ্য করিতে পারিতেছিল না। যদিও তাহারা উপরের বাঙ্কে আরাম করিয়া লম্বা হইয়া পড়িয়াছিল, তবু বারবার বিরক্ত করিতেছিল। কিন্তু যখনই বিরক্ত করে তখনই আমি ধীরভাবে উত্তর দিই।' ইহাতেই অবশেষে তাহারা নরম হইল, এইবার আমার নাম-ধাম জিজ্ঞাসা করিবার পালা। যখন আমার নাম জানিল তখন লজ্জিত হইয়া মাফ্‌ চাহিল এবং নিজেদের কাছে যায়গা করিয়া দিল। "সবুরে মেওয়া মিলে" এই প্রবাদ স্মরণ হইল। আমি বড়ই শ্রান্ত হইয়াছিলাম, মাথা ঘুরিতেছিল। বসার জায়গা যখন বড়ই আবশ্যক হইয়াছিল তখনই ঈশ্বর তাহা মিলাইয়া দিলেন।

এমনি করিয়া কোনও রকমে সময়মত কলিকাতায় পঁহুছিলাম। কাসিমবাজারের মহারাজা তাঁহার বাড়ীতে উঠিবার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন। তিনি কলিকাতার সভায় সভাপতি হইয়াছিলেন। করাচীতে যেমন, তেমনি কলিকাতাতেও লোকের উৎসাহ উথলিয়া উঠিয়াছিল। সভায় জনকয়েক ইংরেজও উপস্থিত হইয়াছিলেন।

৩১শে জুলাইয়ের পূর্ব্বেই গবর্ণমেণ্ট জানাইয়া দিলেন যে, এগ্রিমেণ্ট প্রথা বন্ধ করা হইল। ১৮৯৪ সালে এই প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার দরখাস্তের খসড়া আমি করিয়াছিলাম। কিছুদিনের মধ্যে এই 'অর্দ্ধ ক্রীত-দাসত্ব' প্রথা রদ হইবে এই প্রকার আশা করিয়াছিলাম।

১৮৯৪ সাল হইতে এই চেষ্টায় অনেকে সাহায্য করিয়াছেন। কিন্তু শুদ্ধ সত্যাগ্রহ ব্যবহৃত হওয়াতেই যে তাড়াতাড়ি এই প্রথার অন্ত হইল—একথা না বলিলে চলে না। এই কাহিনীর সমস্ত ঘটনা ও তাহাতে যাঁহারা অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন তাঁহাদের বিষয় দক্ষিণ আফ্রিকার সত্যাগ্রহের ইতিহাসে পাঠকেরা পুরাপুরি পাইবেন।

১২
নীলের দাগ

চম্পারণ জনক রাজার ভূমি। চম্পারণে আজ যেমন আমের বাগিচা আছে, ১৯১৭ সাল পর্যন্ত তেমনি ওখানে নীলের ক্ষেতও ছিল। নিজের জমির প্রতি বিঘায় তিন কাঠা করিয়া জমিতে চাষারা মূল মালিকের জন্য নীল চাষ করিবে, এই ছিল সেখানকার নিয়ম। ইহাকে "তিন কাঠিয়া" বলা হইত। বিশ কাঠায় সেখানে এক একর হয়। বিশ কাঠার মধ্যে তিন কাঠা নীলের চাষের জন্য আলাদা করিয়া রাখার নাম 'তিন কাঠিয়া' প্রথা।

আমাকে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তখন আমি চম্পারণের নাম ঠিকানাও জানিতাম না। নীলের যে চাষ হয় তাহাও জানিতাম না। নীলের প্যাকেট দেখিয়াছি, কিন্তু উহা যে চম্পারণে তৈরী হয়, তাহা জানিতাম না এবং উহার জন্য যে হাজার হাজার কৃষকের দুঃখ রহিয়াছে তাহার খবরও জানা ছিল না।

রাজকুমার শুক্ল নামে চম্পারণের একজন চাষা ছিল। তাহার মাথায় দুঃখ ভাঙ্গিয়া পড়িল। এই দুঃখ তাঁহাকে বিঁধিলেও, এই নীলের দাগ সকলের উপর হইতে ধুইয়া ফেলিতে ঐকান্তিক ইচ্ছা, উহা হইতেই তাহার হয়।

লক্ষ্ণৌ মহাসভায় আমি গিয়াছিলাম, সেইখানে এই কৃষক আমাকে পাইয়া বসিল। "উকীলবাবু আপনাকে সব অবস্থা বলিবেন"—এইকথা বলিয়া আমাকে সে চম্পারণ যাওয়ার নিমন্ত্রণ দেয়। এই উকীলবাবু

আমার চম্পারণের প্রিয় সঙ্গী ও বিহারের সেবা-জীবনের প্রাণস্বরূপ ব্রজকিশোর বাবু। তাঁহাকে রাজকুমার শুক্ল আমার তাঁবুতে লইয়া আসিল। তাঁহার কালো আল্‌পাকার আচ্‌কান, পাতলুন ইত্যাদি পরা ছিল। তাঁহাকে দেখিয়া আমার বিশেষ কিছু ভাল ধারণা হইল না। আমি ধরিয়াই লইলাম যে, অবোধ চাষাকে যে সব উকীল লুট করিয়া থাকে, ইনি তাহাদেরই একজন উকীল সাহেব।

আমি চম্পারণের কাহিনী তাঁহার নিকট হইতে কিছু কিছু শুনিলাম। আমার রীতি অনুসারে আমি জবাব দিলাম—"না দেখিয়া শুনিয়া এ বিষয়ে আমি কিছু বলিতে পারি না। আপনি মহাসভায় এই বিষয় উত্থাপন করিবেন, এখন আমাকে রেহাই দিন।" রাজকুমার শুক্লকে ত মহাসভার সাহায্য লইতেই হইবে। ব্রজকিশোর বাবু চম্পারণের দুঃখের কথা কংগ্রেসে বলিলেন এবং সমবেদনা জ্ঞাপন করিয়া এক প্রস্তাব গৃহীত হইল।

রাজকুমার শুক্ল খুসী হইল, কিন্তু উহাতে তাহার মন উঠিল না। সে আমাকে বলিতেছিল যে, আমি যাইয়া যেন চম্পারণের কৃষকের দুঃখ দেখি। আমি বলিলাম—"আমার ভ্রমণের স্থানগুলির ভিতর চম্পারণ থাকিবে এবং সেখানে এক দিন থাকিব।" সে বলিল "এক দিনই যথেষ্ট, চোখে দেখিলেই হইল।"

লক্ষ্ণৌ হইতে আমি কানপুর গেলাম। সেখানেও রাজকুমার শুক্ল হাজির। "এখান হইতে চম্পারণ খুব কাছে—একটা দিন চম্পারণের জন্য দিন্।" "এখন আমাকে মাফ্ কর, তবে আমি যাইব এই কথা দিতেছি"—এই বলিয়া নিজেকে আরো বাঁধিয়া ফেলিলাম।

আমি আশ্রমে ফিরিলাম। রাজকুমার শুক্ল এখানেও আমার পিছনে আসিয়াছে। সে বলিল—"এইবার দিন স্থির করুন।"

আমি বলিলাম—"এখন যাও, অমুক তারিখ আমাকে কলিকাতায় যাইতে হইবে, সেই সময় আমাকে কলিকাতা হইতে লইয়া যাইও।" কোথায় যাইব, কি করিব, কি দেখিব—এসব বিষয়ে আমার কোনও ধারণা ছিল না। কলিকাতায় আমি ভূপেন বাবুর নিকট পঁহুছিলাম। তাহার পূর্ব্বেই সে সেই বাড়িতে গিয়া হাজির ছিল। এই অশিক্ষিত সরল, কিন্তু দৃঢ়সঙ্কল্প চাষা এখনি করিয়া আমাকে জয় করিল।

১৯১৭ সালের আরম্ভে কলিকাতা হইতে আমরা দুইজন রওনা হইলাম। দুইজনকেই একজোড়া চাষার মত দেখাইতেছিল। রাজকুমার শুক্ল যে গাড়ীতে লইয়া গেল সেইখানেই দুইজনে বসিলাম। প্রাতঃকালে পাটনা পঁহুছিলাম।

পাটনায় আসা এই আমার প্রথম। পাটনায় কাহারও বাড়ীতে উঠিতে পারি, এমন পরিচয় আমার কাহারও সহিত ছিল না। আমার এইরূপ মনে হইয়াছিল যে, রাজকুমার শুক্ল সাধারণ কৃষক মাত্র হইলেও পাটনায় উহার কোনও অবলম্বন থাকিবেই। ট্রেনে রাজকুমারের সব খবর জানিতে পারিলাম। পাটনায় উহার মূল্য কি তাহা ভাল করিয়াই বুঝিলাম। রাজকুমার শুক্লের বুদ্ধি নির্দ্দোষ ছিল। সে যাহাদিগকে মিত্র মনে করিত সেই উকীলেরা তাহার মিত্র ছিল না, পরন্তু রাজকুমার ছিল তাহাদের ভৃত্যেরই সমকক্ষ চাষা মক্কেল, ও তাহার এবং উকীলের মধ্যে যে ব্যবধান তাহা প্লাবনের গঙ্গার মত বিস্তৃত।

আমাকে সে রাজেন্দ্র বাবুর বাড়ীতে লইয়া গেল। রাজেন্দ্র বাবু

পুরী না কোথায় গিয়াছিলেন। বাংলায় দুই একজন মাত্র চাকর ছিল। খাওয়ার দ্রব্য আমার সাথে কিছু ছিল। আমার কিছু খেজুর দরকার ছিল; বেচারা রাজকুমার শুক্ল তাহা বাজার হইতে আনিয়া দিল।

এদিকে বিহারে ছোঁয়াছুঁয়ির বিচার বড় শক্ত রকমের। আমার বাল্‌তির জলের ছাঁট যদি চাকরদের বাল্‌তিতে লাগে, তবে তাহাতে তাহাদের জল অপবিত্র হইয়া যাইবে। চাকর আমার জাতের খবর ত জানে'না। রাজকুমার দেখাইয়া দিল ভিতরের পায়খানা ব্যবহার করিতে, চাকর বাহিরের পায়খানার দিকে তৎক্ষণাৎ আঙ্গুল নির্দ্দেশ করিল। এই সকল আমার নিকট আশ্চর্য্য ও বিরক্তির কারণ হয় নাই। এইপ্রকার অভিজ্ঞতায় আমি অভ্যস্ত ছিলাম। চাকর তাহার নিজের ধর্ম্মই পালন করিতেছিল—রাজেন্দ্র প্রসাদ বাবুর আদেশ পালন করিতেছে বলিয়া বুঝিতেছিল। এই উপভোগ্য অভিজ্ঞতা হইতে রাজকুমার শুক্লের সম্বন্ধে যেমন আমার শ্রদ্ধা বাড়িল, তেমনি তাহার সম্বন্ধে আমার জ্ঞানও বাড়িল। পাটনাতেই আমি বুঝিতে পারিলাম, রাজকুমার আমাকে পরিচালিত করিতে পারিবে না; 'রাশ' আমাকে নিজের হাতে গ্রহণ করিতে হইবে।

১৩

বিহারী সরলতা

মৌলানা মজহরুল হক্ ও আমি একসময় লণ্ডনে একত্র পড়িয়াছিলাম। তারপর ১৯১৫ সালে বোম্বাইয়ের কংগ্রেসে আমাদের দেখা হয়। সেই বৎসর তিনি মুশ্লিম লীগের সভাপতি ছিলেন। তিনি পুরানো পরিচয় বশতঃ আমাকে, পাটনা গেলে তাঁহার বাড়ীতেই উঠার জন্য নিমন্ত্রণ করিয়া রাখিয়াছিলেন। ঐ নিমন্ত্রণের কথা স্মরণ করিয়া তাঁহাকে চিঠি দিলাম ও আমার কাজের বিষয় জানাইলাম। তিনি তখনই নিজের মোটর লইয়া আসিলেন এবং আমাকে তাঁহার সহিত লইয়া যাওয়ার জন্য আগ্রহ করিলেন। আমি তাঁহার উপকার স্বীকার করিয়া, আমার যেখানে যাওয়ার কথা, সেইস্থানে প্রথম ট্রেনেই পাঠাইয়া দিতে অনুরোধ করিলাম। রেলওয়ে গাইড হইতে গন্তব্য স্থান খুঁজিয়া বাহির করা আমার সাধ্য ছিল না। তিনি রাজকুমার শুক্লের সহিত কথা বলিলেন এবং আমার প্রথমতঃ মজঃফরপুর যাইতে হইবে বলিলেন। সেই সন্ধ্যাতেই মজঃফরপুরের ট্রেনে তিনি আমাকে রওনা করিয়া দিলেন। মজঃফরপুরে সেই সময় আচার্য্য কৃপলানী থাকিতেন। তাঁহাকে আমি জানিতাম। যখন হায়দ্রাবাদ গিয়াছিলাম, তখন তাঁহার মহান্ ত্যাগের বিষয়, তাঁহার সরল জীবন-যাত্রার বিষয় ও তাঁহার অর্থে পরিচালিত আশ্রমের বিষয় ডাঃ চৌথরামের নিকট শুনিয়াছিলাম। তিনি মজঃফরপুর কলেজের প্রফেসর ছিলেন। সেই সবে মাত্র তিনি সে কর্ম্ম ত্যাগ করিয়াছেন। আমি তাঁহাকে তার করিয়াছিলাম। মধ্যরাত্রে মজঃফরপুরে ট্রেন যায়। তিনি সেই

সময় একদল ছাত্র লইয়া ষ্টেশনে উপস্থিত হইয়াছিলেন। তিনি অধ্যাপক মালকানীর নিকট থাকিতেন। আমাকে তিনি সেইখানে লইয়া গেলেন। মালকানী সেখানকার কলেজের প্রফেসর। তখনকার দিনে সরকারী কলেজের প্রফেসরের পক্ষে আমাকে স্থান দেওয়া অসাধারণ কার্য্য বলিয়া মনে হয়।

কৃপলানীজী বিহারের এবং তাহার মধ্যে আবার ত্রিহুতের দীন-দশার কথা আমাকে বলিয়া আমার কার্য্যের কঠিনতার বিষয় জানাইয়া দিলেন। কৃপলানীজী বিহারীদের সহিত ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধে বদ্ধ হইয়াছিলেন। তিনি তাহাদের সহিত আমার কার্য্যের কথা পূর্ব্বেই আলোচনা করিয়াছিলেন। প্রাতঃকালে উকীলদের ছোট একদল আমার নিকট আসিয়া হাজির হইল। তাঁহাদের মধ্যে রামনবমী প্রসাদের কথা আমার স্মরণ আছে। তিনি নিজের আগ্রহের আতিশয্যের দ্বারা আমার মনোযোগ আকৃষ্ট করিয়াছিলেন।

"আপনি যে কাজে আসিয়াছেন তাহা এখান হইতে হইবে না। আপনাকে আমাদের ওখানে গিয়া থাকিতে হয়। গয়াবাবু এখানকার নামজাদা উকীল। তাঁহার অনুরোধেই আপনাকে তাঁহার বাড়ীতে উঠিবার জন্য আগ্রহ করিতেছি। আমরা সকলেই সরকারের ভয় করিয়া থাকি, কিন্তু আমাদের দ্বারা যতটা সম্ভব, সে সাহায্য আমরা অবশ্যই আপনাকে করিব। রাজকুমার শুক্লের অনেক কথাই সত্য। দুঃখের বিষয় এই যে, আমাদের নেতা আজ এখানে নাই। বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ ও রাজেন্দ্র প্রসাদকে আমি তার করিয়াছি। উভয়েই শীঘ্রই আসিয়া পড়িবেন এবং তাঁহারা পুরাপুরি সাহায্য করিবেন। আপনি দয়া করিয়া গয়াবাবুর ওখানে চলুন।"

এ কথায় আমার লোভ হইল। আমাকে লইয়া পাছে গয়াবাবুর অসুবিধা হয়, তাই সঙ্কোচ হইতেছিল। কিন্তু রামনবমীবাবু এবিষয়ে আমাকে নিশ্চিন্ত করিলেন।

আমি গয়াবাবুর ওখানে গেলাম। তিনি ও তাঁহার পরিবারবর্গ আমাকে প্রেমে মুগ্ধ করিয়া রাখিলেন।

ব্রজকিশোর বাবু দ্বারভাঙ্গা হইতে আসিলেন। রাজেন্দ্রবাবু পুরী হইতে আসিলেন। এখন যাঁহাকে দেখিলাম ইনি লক্ষ্ণৌয়ের সে বাবু ব্রজকিশোর প্রসাদ নহেন। ইঁহার মধ্যে বিহারীদের নম্রতা, সরলতা ভালমানুষী ও অসাধারণ শ্রদ্ধা দেখিয়া আমার হৃদয় আনন্দে পূর্ণ হইয়া গেল। বিহারী উকীলদের ব্রজকিশোর বাবুর প্রতি সম্মানের ভাব দেখিয়া আনন্দিত ও আশ্চর্য্য হইলাম। এই দলের সহিতও আমার জন্মের মত গাঢ় বন্ধন হইয়া গেল।

ব্রজকিশোর বাবু আমাকে সকল অবস্থার সহিত পরিচিত করাইলেন। তিনি গরীব কৃষকদিগের ঐসকল মোকদ্দমা লইয়া লড়িতেন। ঐরূপ দুইটি মোকদ্দমা তাঁহার হাতে ছিল। এই প্রকার মোকদ্দমা করিয়া গরীবদের জন্য কিছু করিতেছেন বলিয়া মনকে প্রবোধ দিতে পারিতেন। কখন কখন মোকদ্দমা নিষ্ফল হইত। এই সকল মূঢ় কৃষকের নিকট হইতে তিনি 'ফী' লইতেন। ত্যাগী হইলেও ব্রজকিশোর বাবু অথবা রাজেন্দ্রপ্রসাদ বাবু 'ফী' লইতে সঙ্কোচ বোধ করিতেন না। ব্যবসায়ে ফী যদি না লওয়া যায়, তবে সংসার খরচা চলিবে না, এবং লোককে সাহায্যও করিতে পারিবেন না—এই তাঁদের যুক্তি ছিল। তাঁহারা যে 'ফী' লইতেন এবং বাংলায় ও বিহারে ব্যারিষ্টারেরা যে ফী লইয়া থাকেন তাহার অঙ্ক শুনিয়া আমার মাথা ঘুরিয়া গেল।

—"সাহেবকে আমরা ওপিনিয়নের (পরামর্শের) জন্য ১০,০০০ টাকা দিয়াছি।" হাজার ছাড়া ত আমি কথাই শুনিলাম না।

এই বিষয়ে এই মিত্র-মণ্ডল আমার নিকট মিষ্ট ভাষায় কিছু শক্ত কথা শুনিলেন। কিন্তু তাঁহারা উহাতে কিছু মনে করিলেন না।

"এই সকল মোকদ্দমার বিবরণ পড়িয়া আমার মত এই যে, আপনারা এই ধরণের মোকদ্দমা করা ছাড়িয়া দিন। এই সকল মোকদ্দমা হইতে লাভ খুব কমই হয়। যেখানকার রায়তেরা এত ভীরু, যেখানে সকলেই এত ভয়-ভীত, সেখানে আদালতের দ্বারা কমই সাহায্য হইতে পারে। লোকের ভয় দূর করাই এখানে সর্ব্বাগ্রে দরকার। যে পর্য্যন্ত এই 'তিনকাঠিয়া' প্রথা না যায়, সে পর্য্যন্ত আপনারা সুখে বসিয়া থাকিতে পারিবেন না। আমি ত দুই দিনে যাহা দেখা যায় তাহাই দেখিতে আসিয়াছিলাম। কিন্তু এখন দেখিতেছি, এই কার্য্য দুই বৎসরও লইতে পারে। যতটা সময় লাগে তাহা আমি দিতে প্রস্তুত আছি। এই কার্য্যের জন্য কি করা আবশ্যক তাহা আমি এখন বুঝিতে পারিতেছি, কিন্তু আপনাদের সাহায্য চাই।

ব্রজকিশোর বাবুকে আমি খুব স্থিরবুদ্ধি দেখিলাম। তিনি শান্ত-ভাবে জবাব দিলেন—"আমাদের দ্বারা যতটা সাহায্য হইতে পারে ততটা সাহায্য আপনাকে করিব, কিন্তু আপনি কি প্রকারের সাহায্য চাহেন তাহা আমাদিগকে বুঝাইয়া দিন্।" এই কথাপ্রসঙ্গে আমাদের রাত কাটিল। আমি ব্রজকিশোর বাবুকে বলিলাম,—"আপনাদের ওকালতী বুদ্ধি আমার খুব কম কাজে লাগিবে, আপনাদের নিকট হইতে আমি কেরাণীর ও দোভাষীর কাজ চাই। ইহাতে জেলে যাইতেও হইবে দেখিতেছি। আপনারা সে বিপদ্ বরণ করেন ত'

আমার ভাল লাগিবে। তবে যদি ঐ বিপদ্ ঘাড়ে লইতে ইচ্ছা না হয় তবে লইবেন না। উকীল হইতে কেরাণী হওয়া ও অনিশ্চিত কালের জন্য নিজেদের ব্যবসা বন্ধ রাখাও আমি কিছু কম কাজ মনে করি না। এখানকার হিন্দী বুলী বুঝিতে আমার কষ্ট হয়। কাগজপত্র সব কায়েথী বা উর্দ্দুতে লেখা, উহা আমি পড়িতে পারিব না। ঐ সকলের তর্জ্জমা আপনারা করিয়া দিবেন সে আশা রাখি। এই কাজ পয়সা দিয়া করা চলিবে না। ইহা কেবল সেবা-ভাব হইতে ও বিনা পয়সায় হওয়া চাই।

ব্রজকিশোর বাবু বুঝিলেন এবং তিনি আমাকে ও নিজের সঙ্গীদিগকে জেরা করিতে লাগিলেন। আমার কথার অর্থের প্রসার কতদূর তাহা জিজ্ঞাসা করিতে লাগিলেন। আমার আন্দাজে কতদিন উকীলদের সময় দিতে হইবে, কয়জন চাই, কেহ যদি অল্পস্বল্প সময়ের জন্য আসে ত চলে কিনা ইত্যাদি প্রশ্ন আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন। উকীলদিগের মধ্যে আবার কে কি পরিমাণ ত্যাগ করিতে পারেন তাহাও জিজ্ঞাসা করিলেন।

অতঃপর তিনি সব স্থির করিয়া আমাকে জানাইলেন যে,—'আমাদের মধ্যে এই কয়জন, আপনি যে কাজ করিতে বলেন তাহাই করিতে প্রস্তুত আছেন। ইহাদের মধ্যে যতজনকে যতদিনের জন্য আপনার নিকট থাকিতে বলিবেন ততদিন থাকিবেন। জেলে যাওয়ার কথা আমাদের কাছে নূতন। সেজন্য আমরা শক্তি অর্জ্জন করার চেষ্টা করিব।"

১৪

অহিংসা দেবীর সাক্ষাৎকার

আমাকে কৃষকদের অবস্থার অনুসন্ধান করিতে হইত, এবং নীলকর মালিকের বিরুদ্ধে যে অভিযোগ ছিল, তাহার কতটা সত্য তাহা দেখিতে হইত। এই কার্য্যের জন্য হাজারো কৃষকের সহিত সাক্ষাৎ করা আবশ্যক হইত। কিন্তু তাহাদের সহিত এই বিষয় লইয়া বসিবার পূর্ব্বে নীলের মালিকদিগের সহিত ও কমিশনারের সহিত সাক্ষাৎ করা আমি আবশ্যক বিবেচনা করিলাম। উভয়কেই পত্র দিলাম।

নীল-মালিকদিগের সেক্রেটারী দেখা করার সম্বন্ধে সাফ্ লিখিয়া দিলেন যে, আপনাকে বিদেশী মনে করি, আমাদের ও কৃষকের মধ্যে আপনার আসা উচিত নহে, তাহা হইলেও যদি আপনার কিছু বলার থাকে তবে তাহা লিখিয়া জানাইবেন।

আমি সেক্রেটারীকে বিচারপূর্ব্বক জানাইলাম যে, আমি নিজেকে বিদেশী বলিয়া মনে করি না; আর যদি কৃষকেরা ইচ্ছা করে, তবে তাহাদের অবস্থার পূরাপুরি অনুসন্ধান করার অধিকার আমার আছে। কমিশনার সাহেব দেখা করিলেন। তিনি ত ধম্‌কাইতেই আরম্ভ করিলেন এবং আমাকে অতঃপর আর অগ্রসর না হইয়া ত্রিহুত ত্যাগ করিতে উপদেশ দিলেন। আমি সাথীদিগের সহিত সকল কথা আলোচনা করিয়া বলিলাম যে, অনুসন্ধান করাও সরকার বন্ধ করিয়া দিবে এমনটা হইতে পারে। জেলে যাওয়ার যখন সময় আসিবে বলিয়া ধারণা করিয়াছিলাম তাহার পূর্ব্বেই হয়ত সে সময় আসিবে। যদি

গ্রেপ্তার হইতে হয় তবে আমার মতিহারীতে, অথবা যদি সম্ভব হয় তবে বেতিয়াতেই গ্রেপ্তার হওয়া চাই।

চম্পারণ ত্রিহুত বিভাগের জেলা এবং মতিহারী তাহার প্রধান সহর। বেতিয়ার কাছাকাছি রাজকুমার শুক্লের বাড়ী, আর তাহার আশে-পাশের কৃষক অধিকাংশই হত-দরিদ্র। তাহাদের অবস্থা দেখাইতে রাজকুমার শুক্লের লোভ হইত। এখন আমার সেইখানে যাওয়ার ইচ্ছা হইল।

সেই হেতু সাথীদিগকে লইয়া আমি সেই দিনই মতিহারী যাওয়ার জন্য রওনা হইলাম। মতিহারীতে গোরক্ষ বাবু আশ্রয় দিলেন এবং তাঁহার বাড়ী ধর্ম্মশালায় পরিণত হইল। আমাদের সকলের ঠেসাঠেসি করিয়া সেখানে কুলাইত। যে দিন মতিহারী পঁহুছিলাম সেই দিনই শুনিলাম যে, মতিহারী হইতে মাইল পাঁচেক দূরে এক কৃষকের উপর অত্যাচার হইয়াছে। তাহাকে দেখিতে ধরণীধর প্রসাদ উকীলকে লইয়া সকালে যাইতে হইবে, এই প্রকার স্থির করিলাম। আমরা প্রাতঃকালে হাতীতে চড়িয়া বাহির হইয়া পড়িলাম। চম্পারণে হাতীর ব্যবহার অনেকটা গুজরাটের গো-গাড়ী ব্যবহারের মত। অর্দ্ধেক পথ গিয়াছি এমন সময় পুলিশ সুপারিণ্টেণ্ডেণ্টের লোক আসিয়া পঁহুছিল এবং আমাকে বলিল—"আপনাকে সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট সাহেব সেলাম দিয়াছেন।" আমি বুঝিতে পারিলাম। ধরণীধর বাবুকে আমি অগ্রসর হইয়া যাইতে বলিলাম। তারপর সেই লোক যে ভাড়ার গাড়ী আনিয়াছিল, তাহাতে চড়িয়া বসিলাম। সে আমাকে চম্পারণ পরিত্যাগ করার নোটীশ দিল। আমাকে বাড়ীতে ফিরাইয়া লইয়া গেল এবং আমার স্বাক্ষর চাহিল। আমি জবাব লিখিয়া দিলাম যে, আমার চম্পারণ ছাড়িয়া যাওয়ার ইচ্ছা

নাই, আমাকে আরো অগ্রসর হইতে হইবে এবং অনুসন্ধান করিতে হইবে। চম্পারণ ত্যাগের আদেশ অমান্য করার জন্য পরের দিন কোর্টে হাজির হওয়ার সমন আসিল।

সারারাত ধরিয়া আমার যত চিঠি লেখার ছিল লিখিলাম ও যে যে নির্দ্দেশ দেওয়ার ছিল তাহা ব্রজকিশোর বাবুকে দিলাম।

সমনের কথা ক্ষণকালমধ্যেই প্রচার হইয়া গেল। লোকে বলে যে, মতিহারী সেদিন যে দৃশ্য দেখিয়াছিল পূর্ব্বে এমন কখনো দেখে নাই। গোরক্ষ বাবুর বাড়ী ও কোর্ট লোকে লোকারণ্য হইয়া গেল। সৌভাগ্যক্রমে আমার সমস্ত কার্য্যই আমি রাত্রিতে শেষ করিয়া রাখিয়াছিলাম, সেইজন্য সেই ভিড়ের দিকে আমি মন দিতে পারিলাম। সাথীদের যে মূল্য কি, তাঁহাদের তখন তাহার পুরাপুরি পরিচয় দিতে হইল। তাঁহারা লোকদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিতে লাগিয়া গেলেন। কাছারীতে যেখানে যাই লোক দলে দলে আমার পিছনে চলে।

কলেক্টর, ম্যাজিষ্ট্রেট ও সুপারিণ্টেণ্ডেণ্ট এবং আমার মধ্যে এক রকমের একটা প্রীতির বন্ধন উৎপন্ন হইল। সরকারী নোটীশ ইত্যাদি যদি আইনমত অগ্রাহ্যই করিতে হইত, তবে আমি তাহা করিতে পারিতাম। তাহার পরিবর্ত্তে তাঁহাদের সমস্ত নোটীশ আমি স্বীকার করিয়া লইয়াছিলাম; এবং কর্ম্মচারীদিগের সহিত ব্যক্তিগত ভদ্রব্যবহার করাতে তাঁহারা বুঝিয়া গেলেন যে, তাঁহাদের সহিত আমার বিরোধ নাই—আমি সবিনয়ে তাঁহাদের হুকুমেরই বিরোধিতা করিব। ইহাতে তাঁহারা এক প্রকার অভয় পাইলেন। আমাকে বিরক্ত করার পরিবর্ত্তে তাঁহারা খুসী হইয়া লোকদিগকে নিয়ন্ত্রিত করিবার জন্য আমার ও আমার সাথীদের সাহায্য লইলেন। তবে সাথে সাথে তাঁহারা ইহাও বুঝিয়া-

ছিলেন যে, তাঁহাদের ক্ষমতা আজ হইতে লোপ পাইল—লোকে মুহূর্ত্তের জন্য দণ্ডের ভয় ত্যাগ করিল এবং তাহাদের নূতন মিত্রের প্রেমের বশীভূত হইল।

স্মরণ রাখিতে হইবে যে, চম্পারণে কেহ আমাকে চিনিত না। কৃষকেরা সকলেই অজ্ঞ লোক ছিল। চম্পারণ গঙ্গার অপর পারে, অনেক উত্তরে, হিমালয়ের তলদেশে নেপালের নিকটস্থ প্রদেশ। সেখানে অনেকে কংগ্রেসের নামও শোনে নাই—কংগ্রেসের সভা কাহাকেও পাওয়া যায় না। যাহারা কংগ্রেসের নাম জানে তাহারা উহার সভা হওয়া দূরে থাকুক, নাম লইতেই ভয় পায়। আজ কংগ্রেস ও কংগ্রেসের সেবক এই প্রদেশে প্রবেশ করিয়াছে—কংগ্রেসের নামে নয়, উহার সত্য স্বরূপে।

সাথীদের সহিত কথা বলিয়া আমি স্থির করিলাম যে, এখানে কংগ্রেসের নামে কোনও কাজ করিব না। নামের দরকার নাই, কাজের দরকার—ছায়া নয় কায়া চাই। কংগ্রেসের নাম ইহাদের কাছে অপ্রীতিকর, কেন না এ প্রদেশে কংগ্রেস মানে উকীলের মারামারী ও আইনের ফাঁকি দিয়া পালানোর প্রযত্ন ; কংগ্রেস মানে বোমা ও গুলি, কংগ্রেস মানে বলা এক, করা আর। এখন বোঝাপড়া হইতেছে সরকারের সাথে এবং সরকারেরও যে সরকার সেই নীলকুঠীর মালিকের সাথে। তাহারা কংগ্রেস বলিয়া যাহা জানিত, কংগ্রেস তাহা নয়। কংগ্রেস কি তাহাই আমাকে এখানে বুঝাইতে হইবে। সেইজন্য আমি কোথাও কংগ্রেসের নাম না লইতে এবং লোককে কংগ্রেসের ভৌতিক দেহের সহিত পরিচয় না করাইতেই কৃতনিশ্চয় হইলাম। কংগ্রেসের দেহকে না জানিয়া যদি লোকে তাহার আত্মাকে জানে ও অনুসরণ করে,

তাহা হইলেই যথেষ্ট, তাহাই কংগ্রেসের সত্য পরিচয়—ইহাই আমরা বিচার করিয়া ঠিক করিয়া ফেলিয়াছিলাম।

সেইজন্য কংগ্রেসের পক্ষ হইতে কোনও গোপন বা প্রকাশ্য দূত প্রেরণ করিয়া সেখানে ক্ষেত্র প্রস্তুত করার আবশ্যক হয় নাই। রাজকুমার শুক্লের পক্ষে হাজার হাজার লোকের ভিতর প্রবেশ করার শক্তি ছিল না। তাহাদের মধ্যে কেহ এ পর্য্যন্ত রাজনৈতিক কোন কার্য্য করে নাই। চম্পারণের বাহিরের জগৎটা কি তাহা তাহারা জানিত না। তাহা হইলেও এই লোকগুলির সহিত আমার মিলন যেন পুরানো মিত্রের সহিত মিলনের ন্যায় হইয়াছিল। ঈশ্বর, অহিংসা ও সত্যের সাক্ষাৎ এই জনসঙ্ঘের ভিতর পাইয়াছিলাম, একথা বলিলে অতিশয়োক্তি হয় না, বরং উহাই অক্ষরশঃ সত্য। এই সাক্ষাৎকারে আমার অধিকার অনুসন্ধান করিলে লোকের প্রতি প্রেম ভিন্ন আর কিছুই দেখিতে পাই না। অহিংসার উপর আমার সহজ শ্রদ্ধাই এই প্রেমের অন্য নাম।

চম্পারণের এই দিন আমার জীবনে কখনো ভুলিবার নয়। এই দিন আমার ও কৃষকদের পক্ষে এক উৎসবের দিন। সরকারী নিয়ম অনুসারে মোকদ্দমা আমার বিরুদ্ধে চালাইবার কথা। কিন্তু সত্য সত্য দেখিতে গেলে, এই মোকদ্দমা সরকারের বিরুদ্ধেই হইতেছিল। আমাকে আটকাইবার জন্য কমিশনার যে জাল রচনা করিয়াছেন, সেই জালে তিনি সরকারকেই ফেলিলেন।

১৫

মোকদ্দমা তুলিয়া লওয়া

মোকদ্দমা চলিল। সরকারী উকীল, ম্যাজিষ্ট্রেট ইত্যাদি বিপদে পড়িয়াছিলেন। তাঁহারা কি করিবেন বুঝিতে পারিতেছিলেন না। সরকারী উকিল মোকদ্দমার শুনানী মুলতুবী রাখার দরখাস্ত করিয়া রাখিয়াছিলেন। আমি মধ্যে পড়িয়া মিনতি জানাইলাম যে, মুলতুবী রাখার কোন আবশ্যকতা নাই, কেন না চম্পারণ ত্যাগ করার নোটিশ অমান্য করার দোষ আমি স্বীকার করিব। এই বলিয়া আমি খুব সংক্ষেপে এক উক্তি লিখিয়াছিলাম তাহা পড়িলাম। উহা এই রকম ছিল:—

"দণ্ডবিধির ১৪৪ ধারা অনুসারে প্রদত্ত হুকুম অমান্য করার ন্যায় গুরুতর কার্য্য আমি কেন করিলাম, সে বিষয়ে আদালতকে সংক্ষেপে কিছু জানাইতে ইচ্ছা করি। আমার মতে বস্তুতঃ ইহা আইন অমান্যের প্রশ্ন নয়, ইহা স্থানীয় সরকারের সহিত আমার মত ভেদের প্রশ্ন। এই প্রদেশে জন-সেবা ও দেশ-সেবা করার জন্য প্রবেশ করিয়াছি। রায়তের সহিত নীলকরের ন্যায়ানুমোদিত ব্যবহার নাই, এই জন্য রায়তদিগকে সাহায্য করার নিমিত্ত আমাকে খুব আগ্রহ সহকারে কেহ কেহ ডাকিয়াছে বলিয়া আমাকে আসিতে হইয়াছে। সমস্ত বিষয়টা ভাল করিয়া না জানিয়া আমি তাহাদিগকে কেমন করিয়া সাহায্য করিব? সেই জন্য আমি এই বিষয় বুঝিতে—সম্ভব হইলে

সরকার ও নীলকরের সাহায্যেই বুঝিতে—আসিয়াছি। আমার অন্য কোনও উদ্দেশ্য নাই। আমার আসার জন্য লোকের মধ্যে শান্তি ভঙ্গ হইবে, খুনাখুনি হইবে একথা আমি স্বীকার করি না। এই বিষয়ে আমার অভিজ্ঞতা খুব খাঁটি—ইহা আমি দাবী করিতেছি। কিন্তু সরকারের বিচার এই বিষয়ে আমার বিপরীত। তাঁহাদের অসুবিধা আমি বুঝিতেছি। আমি ইহাও স্বীকার করি—তাঁহারা যে প্রকার অবস্থার সংবাদ পান তাহারই উপর তাঁহাদের বিশ্বাস রাখিতে হয়। আইন-মান্যকারী প্রজা হিসাবে আমার উপর যে হুকুম হইয়াছে উহা মান্য করাই স্বাভাবিক হইত। কিন্তু তাহা করিলে আমি যাহাদের জন্য এখানে আসিয়াছি তাহাদিগকে আঘাত করা হয় বলিয়া আমার ধারণা। আমার মনে হয় যে, তাহাদের সেবা আমি আজ তাহাদের মধ্যে থাকিয়াই করিতে পারি। সেই জন্য স্বেচ্ছায় চম্পারণ ছাড়িতে পারি না। এই ধর্ম্ম-সঙ্কটে আমাকে চম্পারণ হইতে সরাইয়া দেওয়ার দায়িত্ব সরকারের উপর না ফেলিয়া পারি না। আমার ন্যায় ব্যক্তির পক্ষে উপরি উক্ত পথ গ্রহণ করায় যে দৃষ্টান্ত লোককে দেখানো হয়, তাহার দায়িত্ব আমি খুব বুঝিতেছি। কিন্তু আমার দৃঢ় বিশ্বাস যে, আমার মত অবস্থায় পতিত আত্মসম্মানশীল মানুষের পক্ষে এই হুকুম অমান্য করা এবং এজন্য যাহা সাজা হয় তাহা গ্রহণ করা ব্যতীত অন্য কোনও সম্মানজনক পথ নাই। আমাকে কম করিয়া সাজা দেওয়া হোক্, এই জন্য এই উক্তি আমি করিতেছি না। আইন অনুযায়ী প্রতিষ্ঠিত কর্ত্তৃত্বের অস্বীকার করাই আমার উদ্দেশ্য নহে, কিন্তু আমার অন্তরের সর্ব্বশ্রেষ্ঠ নিয়ন্তার যে নিয়ম আমি স্বীকার করি, তাঁহার

প্রতি আমার অন্তরাত্মার আহ্বান স্বীকার করাই আমার এই আদেশ অমান্যের উদ্দেশ্য বলিয়া আমি জানাইতেছি।"

এক্ষণে মোকদ্দমা মুলতুবী রাখার হেতু আর রহিল না। কিন্তু ম্যাজিষ্ট্রেট ও উকীল এই রকম হইবে বলিয়া আশা করেন নাই। সেই জন্য কি সাজা দেওয়া হইবে তাহা পরে জানাইবার অছিলায় মোকদ্দমা মুলতুবী রাখা হইল। আমি ভাইস্‌রয়কে সমস্ত অবস্থা জানাইয়া তার করিলাম। ভারতভূষণ পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য প্রভৃতিকেও অবস্থা জানাইয়া তার পাঠাইয়াছিলাম। সাজা লওয়ার জন্য কোর্টে যাওয়ার পূর্ব্বেই আমার উপর ম্যাজিষ্ট্রেটের হুকুম আসিল যে, গভর্ণর সাহেবের হুকুম অনুসারে এই মোকদ্দমা উঠাইয়া লওয়া হইতেছে। কলেক্টরের পত্রও পাইলাম যে, আমার যাহা অনুসন্ধান করিতে হয় তাহা করিতে পারিব ও তাহার জন্য সরকারী কর্ম্মচারীদের নিকট হইতে যে সাহায্য প্রয়োজন তাহা যেন চাহিয়া লই। এই রকম শীঘ্র এবং এই প্রকার শুভ পরিণামের আশা আমরা কেহ করি নাই।

আমি কলেক্টর মিঃ হেককের সহিত সাক্ষাৎ করিলাম। তাঁহাকে ভাল মানুষ ও ন্যায়পরায়ণ বলিয়া জানিলাম। কোনও কাগজপত্র দরকার হইলে আমি পাইব এবং যখন ইচ্ছা তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিতে পারি, তিনি এই কথা বলিয়া দিলেন।

অন্য দিক দিয়া দেশ সত্যাগ্রহ অথবা সবিনয় আইন অমান্যের একটা স্থানীয় দৃষ্টান্ত পাইল। খবরের কাগজে খুব আলোচনা হইল। চম্পারণ ও আমার অনুসন্ধান সম্বন্ধে খুব রটনা হইল।

আমার অনুসন্ধানের জন্য সরকারের দিক হইতে পক্ষপাতশূন্যতার

আবশ্যক হইলেও সংবাদপত্রে চর্চ্চা ও সমর্থনের আবশ্যক ছিল না। কেবল তাহাই নহে, কাগজে লম্বা মন্তব্য ও অনুসন্ধানের বড় বড় রিপোর্ট দ্বারা ক্ষতি হওয়ারই সম্ভাবনা ছিল। সেই জন্য আমি প্রধান প্রধান সংবাদপত্রের সম্পাদকদিগকে অনুরোধ করিয়াছিলাম যে, তাঁহারা যেন রিপোর্টার পাঠাইবার হাঙ্গামা না করেন। যতটুকু ছাপানো আবশ্যক ততটুকু আমিই পাঠাইয়া দিব এবং তাঁহাদিগকে সংবাদ দিতে থাকিব।

চম্পারণের নীলকরেরা চটিয়া গিয়াছিল তাহা আমি বুঝিয়াছিলাম। সরকারী কর্ম্মচারীরাও যে মনে মনে খুসী ছিল না তাহাও আমি বুঝিতে পারিয়াছিলাম।

সংবাদ পত্রে সত্য মিথ্যা খবর উঠিলে তাহাতে তাহারা খুবই অসন্তুষ্ট হইবে এবং তাহাদের এই ক্রোধ আমার উপর না পড়িয়া গরীব ভীত রায়তের উপরেই পড়িবে। আর তাহা হইলে যে সত্য অবস্থার অনুসন্ধান আমি করিতে চাহি তাহাতেও বিঘ্ন আসিবে। নীলকরের দিক হইতে বিষময় আন্দোলন আরম্ভ হইল। তাহাদের পক্ষ হইতে আমার ও আমার সঙ্গীদের নামে সংবাদপত্রে নানা মিথ্যা প্রচারিত হইতে লাগিল। কিন্তু আমার অত্যন্ত সাবধানতার জন্য, অতি সামান্য বিষয়েও সত্য অবলম্বন করিয়া থাকার জন্য, তাহাদের বাণ লক্ষ্যভ্রষ্ট হইয়া গেল।

ব্রজকিশোর বাবুর নানা প্রকার নিন্দা করিতে নীলকরেরা একটুও ত্রুটী করিল না। কিন্তু তাহারা যতই নিন্দা করিতে লাগিল ততই ব্রজকিশোর বাবুর প্রতিষ্ঠা বাড়িতে লাগিল।

এই সঙ্কটের সময় আমি রিপোর্টারদিগকে আসিতে আদৌ উৎসাহিত করি নাই। নেতৃবর্গকে ডাকি নাই। মালব্যজী আমাকে বলিয়া

রাখিয়াছিলেন যে, আবশ্যক হইলে যেন সংবাদ দিয়া তাঁহাকে লইয়া আসি। তাঁহাকেও কষ্ট দেই নাই। এই লড়াইকে রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করিতে দেই নাই। যাহা ঘটিতেছিল সে বিষয়ে মাঝে মাঝে আমি প্রধান সংবাদপত্রগুলিকে সংবাদ পাঠাইয়া দিতাম। তাহাও তাহাদের নিজেদের অবগতির জন্য মাত্র। রাজনৈতিক কাজ করিতেও যেখানে রাজনৈতিক রূপ দেওয়ার আবশ্যক নাই সেখানে ঐ প্রকার রূপ দিলে, রাজনীতির ও কার্য্যের উভয়েরই হানি হয় এই অভিজ্ঞতা আমি ভাল রকম পাইয়াছিলাম। শুদ্ধ লোক-সেবাতে, প্রত্যক্ষ না হোক্ পরোক্ষ রাজনীতি যে রহিয়াছেই তাহা চম্পারণের যুদ্ধে প্রমাণ হইয়া গিয়াছিল।

১৩
কার্য্যপদ্ধতি

চম্পারণের অনুসন্ধানের বিবরণ দেওয়া, আর চম্পারণের কৃষকদের ইতিহাস লেখা একই কথা। সে সমস্ত কথা এই অধ্যায়ে দেওয়া যায় না। ইহাই বলা যায় যে, চম্পারণের অনুসন্ধান-কার্য্য অহিংসা এবং সত্যের বড় রকমের এক প্রয়োগ। এই জন্য ঐ দৃষ্টি হইতে যতটা পারি সপ্তাহে সপ্তাহে লিখিব। এই যুদ্ধের সমস্ত বিবরণ বাবু রাজেন্দ্র-প্রসাদের লিখিত হিন্দী পুস্তক * হইতে পাঠক পাইবেন।

এক্ষণে এই প্রকরণের বর্ণনীয় বিষয়ের কথা লিখিতেছি। গোরক্ষ বাবুর ওখানে বসিয়া যদি এই অনুসন্ধান করিতে হয়, তবে গোরক্ষ বাবুকে তাঁহার বাড়ী খালি করিয়া দিতে হয়। মতিহারীতে ভাড়া চাহিলেই কেহ এজন্য বাড়ী ভাড়া দিবে, এমন নির্ভীকতা লোকের ভিতর তখনও আসে নাই। কিন্তু চতুর ব্রজকিশোর বাবু এক বিস্তৃত প্রাঙ্গণযুক্ত বাড়ী ভাড়া করিয়া ফেলিলেন; আমরা সেখানে গেলাম।

টাকা ব্যতীত শেষ পর্য্যন্ত এই কার্য্য চালানো যাইতে পারে না। তখন পর্য্যন্তও সাধারণের কাজের জন্য জনসাধারণের নিকট হইতে টাকা লওয়ার প্রথা হয় নাই। ব্রজকিশোর বাবুর দল প্রধানতঃই উকীল ছিলেন। প্রয়োজন মত তাঁহারা নিজেদের টাকাতেই ব্যয় সম্পন্ন করিতেন, অথবা নিজেদের বন্ধুদের নিকট হইতে টাকা লইতেন। যাঁহাদের নিজেদের টাকা পয়সা আছে তাঁহারা অপরের নিকট

* ইহার ইংরাজী সংস্করণ মাদ্রাজের শ্রীগণেশমের নিকট পাওয়া যায়।

কেমন করিয়া ভিক্ষা চাহিবেন, ইহাও ছিল তাঁহাদের যুক্তি। চম্পারণের রায়তদিগের নিকট হইতে এক পয়সাও লওয়া হইবে না—ইহা আমার দৃঢ় প্রতিজ্ঞা ছিল। উহা লইলে উহাতে লোকে খারাপ অভিপ্রায় আরোপ করিতে পারিত। এই অনুসন্ধানের জন্য হিন্দুস্থানের জনসাধারণের নিকট হইতে চাঁদা লইব না ইহাও স্থির করিয়াছিলাম। ঐ প্রকার করিলে এই অনুসন্ধান রাষ্ট্রীয় এবং রাজনৈতিক রূপ গ্রহণ করিত। বোম্বাইয়ের বন্ধুরা আমাকে ১৫,০০০৲ টাকা পাঠাইবেন বলিয়া টেলিগ্রাফ করিয়াছিলেন। তাঁহাদিগের ঐ সাহায্যও ধন্যবাদ সহকারে অস্বীকার করিলাম। আমি স্থির করিয়াছিলাম যে, যে-সকল অবস্থাপন্ন বিহারী, বিহারের বাহিরে থাকেন, তাঁহাদের নিকট হইতে ব্রজকিশোর বাবু ও তাঁহার মিত্র মণ্ডলের সাহায্যে টাকা সংগ্রহ করা হইবে। যাহা কম পড়ে তাহা ডাক্তার প্রাণজীবনদাস মেহ্‌তার নিকট হইতে লওয়া স্থির করিলাম। ডাক্তার মেহ্‌তা যাহা দরকার হয় তাহাই চাহিয়া পাঠাইতে লিখিলেন। এমনি করিয়া টাকার সম্বন্ধে আমরা নিশ্চিন্ত হইলাম, দরিদ্রের মত খুবই কম ব্যয় করিয়া এই যুদ্ধ চালাইতে হইবে বলিয়া অনেক টাকার আবশ্যক হওয়ার কথা নয়। কার্যতঃ টাকার বেশী আবশ্যকও হয় নাই। আমার ধারণা যে, সমস্ত লইয়া দুই তিন হাজার টাকার বেশী খরচ হয় নাই। ঐ রূপ খরচ করিয়া ৫০০৲ কি ১০০০৲ টাকা বাঁচিয়াছিল বলিয়া স্মরণ হয়।

প্রথম প্রথম আমাদের থাকার ধরণ বিচিত্র ছিল, আর উহা লইয়া রোজই আমাকে তামাসা উপভোগ করিতে হইত। উকীলদের প্রত্যেকের জন্য একজন করিয়া বামুন ও চাকর ছিল। প্রত্যেকের জন্য আলাদা করিয়া রান্না হইত, আর সকলে রাত্রি বারোটায় আহার

করিতেন। এই ভদ্র লোকেরা নিজের নিজের খরচাতেই থাকিতেন, তবুও আমার নিকট তাঁহাদের এই প্রকারে থাকা বিশ্রী লাগিত। আমার ও আমার মিত্রদের মধ্যে এখন প্রীতির বন্ধন দৃঢ় হইয়াছিল বলিয়া আমাদের মধ্যে বুঝিবার ভুল হওয়ার সম্ভাবনা ছিল না। তাঁহারা আমার বাক্যবাণ প্রেমের সঙ্গেই লইতেন। অবশেষে এই প্রকার হইল যে, চাকরদিগকে বিদায় দিয়া সকলে একত্র খাওয়া হইত—খাওয়ার সময়ও নির্দ্দিষ্ট হইল। সকলে নিরামিষাহারী ছিলেন না, কিন্তু দুইটা রান্নার ব্যবস্থা করিলে খরচ বেশী হয় বলিয়া একটা পাকশালায় একত্র নিরামিষ ভোজনের ব্যবস্থা হইল। সাদাসিধা খাওয়া দাওয়ারই ব্যবস্থা হইল। ইহাতে ব্যয় কমিল, কাজ করিবার শক্তি বাড়িল ও সময়ও বাঁচিল।

সময় ও শক্তি এই দুইয়ের খুব আবশ্যকতা হইয়া পড়িয়াছিল। কৃষকেরা দলে দলে নিজেদের দুঃখের কথা লিখাইয়া দিতে আসিতে আরম্ভ করিয়াছিল। যাহারা লিখাইতে আসিত তাহাদের সঙ্গে দলে দলে লোকও আসিত। ইহাতে বাড়ী ভরিয়া যাইত। আমাকে দর্শন-অভিলাষীদিগের নিকট হইতে মুক্ত করিবার জন্য সঙ্গীরা নিষ্ফল চেষ্টা করিতেন। নির্দ্দিষ্ট সময়ে এক একবার করিয়া আমাকে বাহিরে আসিয়া দর্শন দিতে হইত। লোকের জবানবন্দী লিখিবার জন্য পাঁচ সাত জন সব সময় থাকিতেন। কিন্তু তবুও দিনের শেষে সকলকার জবানী লেখা হইয়া উঠিত না। এত বেশী জবানবন্দী লওয়ার আবশ্যক ছিল না, কিন্তু উহা লইলে লোকের সন্তোষ হইত এবং আমিও তাহাদের অবস্থার খবর পাইতাম।

জবানবন্দী-লেখকগণকে কতকগুলি নিয়ম পালন করিতে হইত।

প্রত্যেক কৃষককেই জেরা করা হইবে। জেরায় যাহার কথা না টিকে তাহার কথা লেখা হইবে না। যাহার কথা গোড়াতেই ভিত্তিহীন দেখা যায়, তাহার জবানী লেখা হইবে না। এই নিয়ম পালন করায় সময় কিছু বেশী লাগিত, কিন্তু জবানীগুলি অনেকটা সত্য ও প্রমাণ যোগ্য হইত।

এই জবানবন্দী লওয়ার সময় ডিটেকৃটিভ পুলিশের দুই এক জন কর্ম্মচারী উপস্থিত থাকিত। এই কর্ম্মচারীদের আসা বন্ধ করা যাইত। কিন্তু আমরা গোড়াতেই স্থির করিয়া লইয়াছিলাম যে, ইহাদিগকে আসিতে দেওয়া বন্ধ করিব না, কেবল ইহাই নহে, উঁহাদের সহিত বিনীত ভাবে ব্যবহার করিব এবং যে খবর দেওয়া যায় সে খবরও দিব। উঁহাদের চোখের সাম্‌নে সমস্ত জবানবন্দী লওয়া হইত। তাহাতে লাভ এই হইল যে, লোকের মধ্যে খুব নির্ভীকতা দেখা দিল। এক দিক দিয়া পুলিশের ভয় যেমন গেল, তেমনি অপর দিকে পুলিশের উপস্থিতির জন্য অতিশয়োক্তির ভয়ও কমই রহিল। মিথ্যা বলিলে কর্ম্মচারী মুস্কিলে ফেলিবে এই ভয়ে তাহাদিগকে সাবধানতার সহিত জবানবন্দী দিতে হইত।

আমার কাজ ছিল নীলকরদিগকে উত্ত্যক্ত না করিয়া বিনয়ের দ্বারা তাঁহাদিগকে জয় করা। সেই জন্য যাঁহার নামে বিশেষ অভিযোগ আসিত, তাঁহাকে পত্র দিতাম এবং তাঁহার সহিত দেখা করিতে প্রযত্ন করিতাম। আমি নীলকর মণ্ডলের সহিতও দেখা করিতাম এবং রায়তদিগের অভিযোগ তাঁহাদিগকে জানাইয়া তাঁহাদের অবস্থাও শুনিয়া লইতাম। তাঁহাদের মধ্যে কেহ কেহ আমাকে তিরস্কার করিতেন, কেহ উদাসীন থাকিতেন, আবার কেহ বা বিনয় প্রকাশ করিতেন।

১৭

সঙ্গীগণ

ব্রজকিশোর বাবু ও রাজেন্দ্রবাবু মিলিয়া এক অদ্বিতীয় জুড়ী হইয়াছিলেন। তাঁহারা না হইলে আমার এক পা চলারও শক্তি ছিল না। তাঁহাদের প্রেম আমাকে এমনি অশক্ত করিয়া রাখিয়াছিল। তাঁহাদের শিষ্যই বলুন, আর সঙ্গীই বলুন,—শম্ভুবাবু, অনুগ্রহ বাবু, ধরণীবাবু, রামনবমী বাবু ইত্যাদি উকীলরা প্রায় সকল সময়ে আমার সঙ্গেই থাকিতেন। বিন্ধ্যবাবু ও জনকধারী বাবু মধ্যে মধ্যে আসিতেন। বিহারী সঙ্ঘ ইঁহারাই ছিলেন। ইঁহাদের প্রধান কাজ ছিল জবানবন্দী লওয়া।

অধ্যাপক কৃপলানী আমাদের সহিত জড়িত না হইয়া থাকার লোক নহেন। তিনি সিন্ধী হইলেও বিহারীদের অপেক্ষাও বেশী বিহারী ছিলেন। আমি এরূপ সেবক খুব কমই দেখিয়াছি, যাঁহারা যখন যে প্রদেশে যান সেই প্রদেশের সহিত এমন ভাবেই মিশিয়া যান যে, তাঁহারা যে, অন্য প্রদেশের লোক তাহা কাহাকেও জানিতে দেন না; কৃপলানী সেই অল্পসংখ্যকদিগের মধ্যে একজন। তাঁহার প্রধান কাজ ছিল দারোয়ানী করা। দর্শনার্থীদিগের নিকট হইতে আমাকে বাঁচানোও তাঁহার জীবনের এক সার্থকতা বলিয়া তিনি এই সময় গণ্য করিয়াছিলেন। কাহাকেও মিষ্ট কথায় আমার নিকট আসা আটকাইতেন, আবার কাহাকেও বা অহিংসভাবে ধমকাইয়া ঠকাইতেন, রাত হইলে তিনি অধ্যাপকের

ব্যবসা আরম্ভ করিয়া সকলকে হাসাইতেন, আর যদি কোনও ভীরু স্বভাবের লোক আসিয়া পড়িত তবে তাহার ভয় ভাঙ্গাইয়া দিতেন।

মৌলানা মজহরুল হক আমার সাহায্যকারী হিসাবে নাম লিখাইয়া রাখিয়াছিলেন ও মাসের মধ্যে দুই একবার করিয়া আসিয়া দেখিয়া যাইতেন। তাঁহার তখনকার দিনের ঠাট ও জাঁকজমক এবং আজকার দিনের সাদাসিধা চাল-চলনের মধ্যে আকাশ পাতাল প্রভেদ! আমাদের নিকট আসিয়া তিনি নিজের হৃদয় খুলিয়া দিতেন, কিন্তু তাঁহার সাহেবীর জন্য বাহিরের লোকের মনে হইত যে, তিনি আমাদের মত নহেন।

যেমন আমার অভিজ্ঞতা বাড়িতেছিল তেমনি আমার মনে হইতেছিল যে, চম্পারণে বরাবর কাজ করিতে হইলে গ্রামের মধ্যে শিক্ষা প্রবেশ করানো আবশ্যক। লোকের অজ্ঞতা দেখিয়া দয়া হইত। গ্রামের ছেলেরা ঘুরিয়া বেড়াইত, অথবা দুই তিনটা পয়সার জন্য নীল-ক্ষেতে সারাদিন মজুরী করিত। এই সময় পুরুষদিগের মজুরী দশ পয়সার বেশী ছিল না। স্ত্রীলোকদিগের ছয় পয়সা ও বালকদিগের তিন পয়সা। যে চার আনা মজুরী পায় সে কৃষক ত ভাগ্যবান।

সঙ্গীদের সহিত যুক্তি করিয়া গ্রামে গ্রামে বিদ্যালয় খোলা স্থির করিলাম। সর্ত্ত এই যে, সেই সেই গ্রামের প্রধানেরা মিলিয়া স্কুল-গৃহ ও শিক্ষকের খোরাক দিবে, আর তাহার অন্য খরচা আমাদের দিতে হইবে। এখানে গ্রামে পয়সা না থাকিলেও লোকের শস্যাদি দেওয়ার ক্ষমতা ছিল, সেই জন্য লোকে কাঁচা খাদ্যদ্রব্য দিতে প্রস্তুত হইল।

শিক্ষক কোথা হইতে পাওয়া যাইবে, এ এক বিষম প্রশ্ন ছিল। বিহারের শিক্ষকদের মধ্যে কেহ কম বেতন লইবে অথবা বিনা বেতনে

কাজ করিবে এমন কাহাকেও পাওয়া অসম্ভব ছিল। আমার কল্পনা ছিল যে, সাধারণ শিক্ষকের হাতে ছেলেদিগকে ফেলিয়া দেওয়া হইবে না। শিক্ষকের লেখাপড়ার বিদ্যা কম থাকে ত থাকুক, কিন্তু চরিত্রবান হওয়া চাই।

এই কার্য্যের স্বেচ্ছাসেবকের জন্য আমি প্রকাশ্যভাবে আবেদন করিলাম। তাহার উত্তরে গঙ্গাধররাও দেশপাণ্ডে, বাবাসাহেব সোমন ও পুণ্ডরীককে পাঠাইলেন। বোম্বাই হইতে অবন্তিকাবাঈ গোখলে আসিলেন। আমি ছোটলাল, সুরেন্দ্রনাথ ও আমার ছেলে দেবদাসকে আনাইলাম। এই সময় আমি মহাদেব দেশাই ও নরহরি পরীখকে পাইলাম। মহাদেব দেশাইএর পত্নী দুর্গা বেন ও নরহরি পরীখের পত্নী মণি বেনও আসিলেন। কস্তুর-বাঈকেও আমি সংবাদ দিয়া আনিলাম। ইহা দ্বারা শিক্ষক ও শিক্ষয়িত্রীর সঙ্ঘ পূর্ণ হইল। শ্রীমতী অবন্তিকা-বাঈ ও আনন্দী-বাঈ শিক্ষিতা বলিয়া গণ্য, কিন্তু দুর্গা বেন ও মণি বেন্ পরীখের ত সামান্য গুজরাটী জ্ঞান ছিল, আর কস্তুর-বাঈয়ের তাহাও ছিল না। এই মহিলারা হিন্দীভাষা বালকদিগকে কেমন করিয়া শিখাইবেন?

যুক্তি করিয়া আমি স্ত্রীলোকদিগকে বুঝাইলাম যে, তাঁহাদের বালকদিগকে ব্যাকরণ ইত্যাদি পড়াইতে হইবে না, ছেলেদিগকে রীতিনীতি শেখানোই তাঁহাদের কাজ হইবে। হিন্দী, মারাঠী ও গুজরাটীর মধ্যে খুব বড় প্রভেদ নাই, ইহাও তাঁহাদিগকে বুঝাইয়া দিলাম ও প্রথম শিক্ষার্থীদিগকে অক্ষরের আঁচড় কাটিতে ও এক দুই লিখিতে শিখানো বড় বিশেষ কঠিন কাজ নয় বলিলাম। ফলে দেখা গেল স্ত্রীবর্গ খুব সুন্দরভাবে কাজ চালাইতে লাগিলেন। মহিলাদিগের মধ্যে আত্মবিশ্বাস

আসিল ও তাঁহারা নিজেরা এই কাজে আনন্দ পাইতে লাগিলেন। অবন্তী বেনের পাঠশালা ত আদর্শ-স্থান লইয়াছিল। তিনি তাঁহার শিক্ষা-শালার প্রাণ স্বরূপ ছিলেন, যদিও তাঁহার অসুবিধা অনেক ছিল। এই স্ত্রীলোকদিগের মারফৎ গ্রামের স্ত্রীলোকদিগের মধ্যে প্রবেশ করা সম্ভব হইয়াছিল।

কিন্তু কেবল শিক্ষাতেই আমার কাজ শেষ হওয়ার নয়। গ্রামের অস্বাস্থ্যকর অবস্থার শেষ ছিল না। গলিগুলিতে ময়লা, কূপের পাশে কাদা ও দুর্গন্ধ, আঙ্গিনার দিকে তাকানো যায় না। বয়স্ক লোকদিগকেও পরিচ্ছন্নতা শিখানো দরকার ছিল। চম্পারণের লোকদিগকে পীড়াগ্রস্ত দেখিতে পাওয়া যাইত। যতটা সংস্কার করিতে পারা যায় তাহার চেষ্টা করা হইবে ও এই ভাবে জীবনের প্রত্যেক বিভাগে প্রবেশ করা হইবে, এই সঙ্কল্প ছিল। এই কার্য্যে ডাক্তারের সাহায্যের দরকারও ছিল। সেই জন্য আমি গোখলের সোসাইটির নিকট ডাক্তার দেবকে চাহিলাম। তাঁহার সহিত আমার প্রেমের বন্ধন পূর্ব্ব হইতেই ছিল। ছয় মাসের জন্য তাঁহার সেবা পাওয়ার সুবিধা আমাদের হইল। তাঁহার তত্ত্বাবধানে শিক্ষক শিক্ষয়িত্রীদিগকে কাজ করিতে হইবে।

সকলের সহিত এই বোঝাপড়া হইয়াছিল যে, কেহ নীলকরের বিরুদ্ধে অভিযোগের আলোচনা করিবেন না, রাজনীতির আলোচনা করিবেন না। যাহারা অভিযোগ করিতে চায় তাহাদিগকে আমার নিকট পাঠাইয়া দিবেন। কেহ নিজের নির্দ্দিষ্ট সীমার বাহিরে এক পাও যাইবেন না। চম্পারণে এই সাথীরা এই সকল নিয়ম আশ্চর্য্যরূপে পালন করিয়াছিলেন। কেহ নির্দ্দিষ্ট নিয়ম লঙ্ঘন করিয়াছেন বলিয়া একবারও শুনিয়াছি—একথা মনে পড়ে না।

১৮

গ্রামে প্রবেশ

সাধারণতঃ প্রত্যেক বিদ্যালয়ের জন্য একজন পুরুষ ও একজন স্ত্রীলোক লইয়া এক গোষ্ঠী হইত। তাঁহাদের হাত দিয়াই ঔষধ দেওয়া ও সংস্কারের কাজ করা হইত। স্ত্রীলোকদিগের হাত দিয়া স্ত্রীলোকের ভিতর কার্য্য করানো হইত। ঔষধ দেওয়ার কাজ খুব সহজ করিয়া ফেলা হইয়াছিল। রেড়ীর তেল, কুইনাইন ও এক প্রকার মলম প্রত্যেক স্কুলে রাখা হইত। জিভে যদি ময়লা দেখা যায় বা কোষ্ঠ বদ্ধ হয়, তবে রেড়ীর তেল দিতে হইবে, জ্বর হইলে প্রথম রেড়ীর তেল দিয়া পরে কুইনাইন দেওয়া হইত। ফোড়া পাঁচড়া হইলে উহা ধুইয়া উহার উপর মলম লাগানো হইত। খাওয়ার ঔষধ বা মলম সঙ্গে করিয়া লইয়া যাইতে দেওয়া হইত না। কোনও গুরুতর পীড়া হইলে অথবা রোগ বুঝা যাইতেছে না এমন হইলে ডাক্তার দেবের জন্য অপেক্ষা করা হইত। ডাক্তার নির্দ্দিষ্ট দিনে বিভিন্ন স্থানে গিয়া দেখিয়া আসিতেন। এইরূপ সহজ ব্যবস্থার সুবিধা লোকে বুঝিতে পারিতেছিল। ব্যাপক রোগ অল্পই ছিল, সেজন্য বড় বিশেষজ্ঞের কিছু আবশ্যক ছিল না—একথা মনে রাখিলে উপরের ব্যবস্থা কাহারও হাস্যজনক মনে হইবে না। লোকের কাছে ইহা মোটেই হাসিয়া উড়াইবার মত জিনিষ ছিল না।

সংস্কারের কাজ কঠিন। লোকে বদ অভ্যাস ত্যাগ করিতে প্রস্তুত নহে। যে রোজ নিজে হাতে ক্ষেতের কাজ করে, সেও নিজের হাতে

নিজেদের আবর্জ্জনা সাফ্ করিতে প্রস্তুত নহে। ডাক্তার দেব পরাজয় স্বীকার করার পাত্র নহেন। তিনি নিজ হাতে ও স্বেচ্ছাসেবকদের দ্বারা একটা গ্রাম সাফ্ করিতে মন দিলেন ; লোকের আঙ্গিনা হইতে আবর্জ্জনা দূর করিলেন, গ্রামের রাস্তা সাফ্ করিলেন, কূপের আশপাশের গর্ত্ত বুজাইলেন, কাদা সাফ করিলেন ও গ্রামের লোককে প্রেমপূর্ব্বক স্বাস্থ্য ব্যবস্থা বুঝাইয়া দিতে লাগিলেন। কোনও কোনও স্থানে লোকেরা লজ্জা পাইয়া কাজ করিতে আরম্ভ করিল। কয়েকটি স্থানে ত লোকেরা এত উৎসাহিত হইয়াছিল যে, আমার যাওয়ার জন্য মোটরের রাস্তা পর্য্যন্ত নিজের হাতে করিয়া দিয়াছিল। এই সকল মধুর অভিজ্ঞতার সহিত লোকের অমনোযোগিতার তিক্ত অভিজ্ঞতাও জড়িত ছিল। আমার মনে আছে, এক গ্রামের লোকের ভিতর সংস্কারের কথা শুনিয়া অসন্তোষ উপস্থিত হইয়াছিল।

এই সকল অভিজ্ঞতার ভিতর আর একটা কথা বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না এবং একথা আমি অনেক স্ত্রী-সভায় বলিয়া আসিয়াছি। ভীতিহারোয়া একটি ছোট গ্রাম, তাহার কাছেই আবার তাহার চেয়েও ছোট গ্রাম আছে। সেইস্থানের কতকগুলি স্ত্রীলোকের কাপড় বড়ই ময়লা দেখা গেল। আমি কস্তুর-বাঈকে বলিলাম যে, এই বহিনদিগকে কাপড় সাফ্ করার কথা যেন বলিয়া দেন। তিনি তাঁহাদের সহিত কথা বলিলেন। তাহাদের মধ্যে একজন তাঁহাকে কুটীরে লইয়া গেল ও বলিল—"তুমি দেখ, এখানে কোনও বাক্স ডেক্স নাই যাহাতে কাপড় থাকিতে পারে ; আমার কাছে, যে শাড়ীখানা পরিয়া আছি কেবলমাত্র সেইখানাই আছে। আমি কেমন করিয়া কাপড় ধুইব ? মহাত্মাজীকে বলিও যে, যদি কাপড় পাঠান তবে রোজ স্নান

করিতে ও কাপড় বদলাইতে প্রস্তুত আছি।” হিন্দুস্থানের গ্রামে গ্রামে এই রকম কুটীর কিছু আশ্চর্য্য পদার্থ নয়। অসংখ্য কুটীরে আসবাব-পত্র, বাক্স-পেটারা, কাপড়-চোপড় নাই। অসংখ্য লোক কেবল এক বস্ত্রে লজ্জা নিবারণ করিয়া দিন যাপন করিতেছে।

আর একটা অভিজ্ঞতাও উল্লেখযোগ্য। চম্পারণে বাঁশের ও ঘাসের অভাব নাই। ভীতিহারোয়ার লোকেরা যে স্কুলের ঘর তৈরী করিয়া দিয়াছিল তাহাও বাঁশ ও ঘাসের। কোনও লোক রাত্রে তাহা পোড়াইয়া দেয়। আশেপাশের নীলকরের লোকের উপরই সন্দেহ হয়। ইহার পর আবার ঐ বাঁশ ও ঘাসের ঘর তৈরী করা উচিত বোধ হইল না। এই স্কুল শ্রীযুত সোমন ও কস্তুরবাঈয়ের হাতে ছিল। শ্রীযুত সোমন ইট পোড়াইয়া ঘর তৈরী করিতে কৃতনিশ্চয় হইলেন। তাঁহার হাতে কাজ করার দৃষ্টান্ত অপর লোকেরাও অনুকরণ করিল, তাহাতে শীঘ্রই পাকা ঘর তৈরী হইল, আর আগুনে পোড়ার ভয় রহিল না।

এই প্রকারে পাঠশালা-সংস্কার-কার্য্য ও ঔষধ দেওয়ার কার্য্য দ্বারা লোকের স্বেচ্ছাসেবার বিষয়ে মর্য্যাদা বাড়িল ও লোকের উপর ইহার প্রভাব ভাল হইল।

দুঃখের সহিত স্বীকার করিতে হইবে যে, আমার এই কার্য্য স্থায়ী করার ইচ্ছা পূর্ণ হয় নাই। স্বেচ্ছাসেবক যাহা পাওয়া গিয়াছিল তাহা নির্দ্দিষ্ট সময়ের জন্য। অপর নূতন স্বেচ্ছাসেবক পাওয়ায় অসুবিধা হইল, এবং বিহার হইতে এই কাজের যোগ্য স্থায়ী সেবক পাওয়া গেল না। আমার চম্পারণের কাজ শেষ হইতেই, অন্যত্র যে কর্ম্ম তৈরী হইয়াছিল তাহা আমাকে টানিয়া

লইয়া গেল। তাহা হইলেও এই ছয় মাসের কার্য্য এতদূর পর্য্যন্ত মূল বিস্তার করিয়াছিল যে, আজ পর্য্যন্তও তাহার প্রভাব কোনও না কোনও স্বরূপে কাজ করিতেছে।

১৯

উজ্জ্বল দিক

যখন পূর্ব্বের অধ্যায়ে লিখিত সমাজ সেবার কার্য্য এক রকম চলিতেছিল, অন্যদিকে তখনই আবার লোকের দুঃখের কথা লেখার কাজ বাড়িতেছিল। হাজার হাজার লোকের দুঃখের কাহিনী লেখা হইতেছে, ইহার কল না হইয়া যায় কোথায়? আমার কাছে আসার লোকের সংখ্যা যেমন বাড়িতে লাগিল, নীলকরের ক্রোধও তেমনি বাড়িতে লাগিল। আমার এই অনুসন্ধান কার্য্য বন্ধ করার জন্য তাহাদের চেষ্টা ক্রমশঃ বাড়িতে লাগিল।

এক দিন আমি বিহার-গবর্ণমেণ্টের পত্র পাইলাম। তাহার ভাবার্থ এই প্রকার—"আপনার অনুসন্ধান কার্য্য কিছু লম্বা রকমের হইতেছে, আপনার উহা বন্ধ রাখিয়া বিহার ত্যাগ করা উচিত।" চিঠি বিনয় পূর্ণ হইলেও উহার অর্থ স্পষ্ট। আমি লিখিলাম যে, অনুসন্ধান লম্বা হইতেছে সত্য, কিন্তু তাহা হইলেও লোকের দুঃখের নিবারণ না হওয়া পর্য্যন্ত আমার বিহার ত্যাগ করার সম্ভাবনা নাই।

আমার অনুসন্ধান বন্ধ করার জন্য গবর্ণমেণ্টের কেবলমাত্র একটি পথই ছিল, তাহা হইতেছে লোকের অভিযোগ সত্য মানিয়া তাহার প্রতিকার করা, অথবা অভিযোগ স্বীকার করিয়া গবর্ণমেণ্টের নিজ তরফ হইতে অনুসন্ধান কার্য্য চালানো। গভর্ণর সার এডোয়ার্ড গেইট্ আমাকে ডাকিলেন এবং নিজে অনুসন্ধান কার্য্য চালাইবার জন্য ইচ্ছা

জানাইলেন এবং সেই অনুসন্ধান সভার সভ্য হওয়ার জন্য আমাকে নিমন্ত্রণ করিলেন। এই সভার অন্য সভ্যদের নাম জানিয়া আমি আমার সাথীদের সহিত যুক্তি করিয়া এই সর্ত্তে সভ্য হইতে স্বীকার করিলাম যে, আমার সঙ্গীদিগের সহিত পরামর্শ করিবার অধিকার থাকিবে, এবং সভ্য হইলেও আমি যে সকল কৃষকদের পৃষ্ঠপোষক সে সম্বন্ধ বহাল থাকিবে ও অনুসন্ধানের পর আমি যদি সঙ্গত মনে করি তবে তখন রায়তদিগকে ইচ্ছা মত চালাইবার স্বাধীনতা আমার থাকিবে।

সার এডোয়ার্ড গেইট এই সর্ত্ত ন্যায্য গণ্য করিয়া ইহাতে সম্মত হইলেন। স্বর্গগত সার ফ্রাঙ্কশ্লাই এই সভার সভাপতি নিযুক্ত হইলেন। অনুসন্ধান সমিতি কৃষকদিগের সমস্ত অভিযোগ সত্য বলিয়া নির্দ্ধারণ করিলেন। তাঁহারা নীলকরের অবৈধভাবে গৃহীত টাকার নির্দ্দিষ্ট ভাগ ফেরৎ দেওয়ার ও "তিন কাঠিয়া" প্রথা উঠাইয়া দেওয়ার পরামর্শ দিলেন।

সার এডোয়ার্ড গেইট এই রিপোর্ট সর্ব্বসম্মত করিতে, ও পরে এই অনুযায়ী আইন প্রস্তুত করিতে একটা বড় অংশ গ্রহণ করিয়াছিলেন। তিনি যদি দৃঢ় না থাকিতেন, অথবা তাঁহার কার্য্য-কুশলতার যদি পুরা ব্যবহার না করিতেন, তবে এই রিপোর্টে সকলে একমত হইতেন না এবং অবশেষে যে আইন পাশ হইয়াছিল তাহাও হইতে পারিত না। নীলকরদের ক্ষমতা প্রভূত ছিল। রিপোর্ট সত্ত্বেও নীলকরদের কেহ কেহ বিলের তীব্র বিরোধ করিয়াছিলেন। কিন্তু সার এডোয়ার্ড গেইট্ শেষ পর্য্যন্ত দৃঢ় ছিলেন এবং অনুসন্ধান সভার সমস্ত মন্তব্য কার্য্যে পরিণত করিয়াছিলেন।

এই প্রকারে শতবর্ষ হইতে প্রচলিত "তিন কাঠিয়া" প্রথা উঠিয়া গেল, এবং তাহার সহিত নীলকর-রাজ্য অস্তমিত হইল। যে রায়তেরা

কেবল পিষ্ট হইত, তাহারা নিজ শক্তির কিছু অনুভব করিল এবং নীলের দাগ যে ধোয়া যাইবে না—এ ভুল দূর হইল।

চম্পারণে আরব্ধ সংগঠন-কার্য্য সমান ভাবেই চালাইয়া কয়েক বৎসর ধরিয়া কাজ করিতে, অনেকগুলি পাঠশালা খুলিতে, অনেক গ্রামে প্রবেশ করিতে আমার ইচ্ছা হইয়াছিল। ক্ষেত্র প্রস্তুত ছিল। কিন্তু আমার মনের ইচ্ছা ঈশ্বর অনেকবার পূর্ণ হইতে দেন নাই। আমি স্থির করিলেও আমাকে দৈব অন্য কার্য্যে টানিয়া লইয়া গেল।

২০

মজুরদের সহিত সম্বন্ধ

যখন চম্পারণে আমি কমিটীর কার্য্য শেষ করিতেছিলাম, তখন খেড়া হইতে মোহনলাল পাণ্ড্যা ও শঙ্করলাল পরীখের পত্রে খেড়া জেলায় ফসল না হওয়ার সংবাদ পাইলাম। সেখানকার যে সব লোক খাজনা দিতে অক্ষম, তাহাদিগকে পরিচালিত করিতে তাঁহারা আমাকে অনুরোধ জানাইলেন। স্থানীয় অবস্থা অনুসন্ধান না করিয়া আমার পরামর্শ দেওয়ার ইচ্ছাও ছিল না, শক্তি ও সাহসও ছিল না।

অন্য দিক হইতে শ্রীমতী অনসূয়া-বাঈয়ের পত্রে তাঁহার মজুর-সঙ্ঘের অবস্থা সম্বন্ধে আলোচনা ছিল। মজুরদের বেতন কম ছিল। তাহাদের বেতন বাড়াইবার জন্য দীর্ঘদিন হইতে আবেদন চলিতেছিল। এই বিষয়ে তাহাদিগকে পরিচালিত করার আমার ইচ্ছা ছিল। এতদূর হইতে এই সামান্য কাজও পরিচালনা করিতে পারিব—এ বোধ আমার ছিল না। সেইজন্য সুবিধা হওয়া মাত্রই আমি আহ্‌মেদাবাদ পঁহুছিলাম। আমার মনে এক ইচ্ছা ছিল যে, এই দুইটি বিষয়ের অনুসন্ধান করিয়া অল্প সময়ের মধ্যেই চম্পারণে ফিরিয়া আসিব এবং সেখানকার গঠনমূলক কার্য্যের তত্ত্বাবধান করিব।

কিন্তু আহ্‌মেদাবাদে পঁহুছিলে এমন কাজ বাহির হইয়া পড়িল যে, আমি কতকদিন পর্য্যন্ত চম্পারণে যাইতে পারিলাম না এবং যে সব স্কুল চলিতেছিল একটার পর একটা তাহা ভাঙ্গিতে লাগিল। সঙ্গীরা ও

আমি কতই আকাশ কুসুম রচনা করিয়াছিলাম, কিন্তু ক্ষণমধ্যে তাহা ভূমিসাৎ হইল।

চম্পারণে গ্রাম্য পাঠশালা ও গ্রাম্য সংস্কার ভিন্ন আমি গো-রক্ষার কাজ হাতে লইয়াছিলাম। গোশালা ও হিন্দী প্রচারের ভার মারোয়াড়ী ভাইরাই লাইয়াছেন—ইহা আমি ভ্রমণকালে দেখিয়াছিলাম। বেতিয়াতে এক মারোয়াড়ী ভাই নিজের ধর্ম্মশালায় আমাকে আশ্রয় দিয়াছিলেন। বেতিয়ার মারোয়াড়ী গৃহস্থেরা তাঁহাদের গোশালার কার্য্যে আমার মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিলেন। আজ গো-রক্ষা সম্বন্ধে আমার যে কল্পনা আছে তখনই তাহা গঠিত হইয়াছিল। গো-রক্ষা মানে গোবংশ বৃদ্ধি, গোজাতির সংস্কার, বলদ খাটাইয়া পরিমাণ মত কার্য্য লওয়া, আদর্শ দুগ্ধালয় বসানো ইত্যাদি। এই কার্য্যে মারোয়াড়ী ভাইয়েরা পুরা সাহায্য করিবেন বলিয়া কথা দিয়াছিলেন। কিন্তু আমি চম্পারণে স্থির হইয়া বসিতে পারিলাম না বলিয়া সেই কার্য্য অসম্পন্নই রহিয়া গেল। বেতিয়ার গোশালা আজও চলিতেছে, কিন্তু তাহা আদর্শ দুগ্ধালয় হয় নাই। চম্পারণে বলদ খাটাইয়া আজও অতিরিক্ত কাজ লওয়া হয়। নামে হিন্দু হইয়াও লোকে বলদকে অতিরিক্ত মারে ও ধর্ম্ম খোয়ায়—এই খেদ আমার বরাবর রহিয়া গিয়াছে। আজ যখনই চম্পারণে যাই, তখনই এই অসম্পূর্ণ কার্য্য, যাহা অগত্যা ফেলিয়া গিয়াছিলাম, তাহা স্মরণ করিয়া দীর্ঘশ্বাস ফেলি এবং এই কার্য্য অসম্পূর্ণ রাখার জন্য মারোয়াড়ী ভাইদিগকে ও বিহারীদিগকে মিষ্ট মিষ্ট কথা শুনাইয়া থাকি।

শিক্ষা-শালার কার্য্য কোনও না কোনও রকমে নানাস্থানেই চলিতেছে। কিন্তু গো-সেবার কার্য্য তেমন করিয়া কোথাও শিকড় গাড়ে নাই। সেইজন্য ইহা ঠিক দিকে চলিতে পারিতেছে না।

আহ্মেদাবাদে খেড়ার কার্য্য সম্বন্ধে আলোচনা যখন চলিতেছিল, তখনই মজুরদের কাজ আমি হাতে লইলাম।

আমার অবস্থা বড় কঠিন ছিল। আমি জানিলাম যে, মজুরদের দাবী ঠিক। শ্রীমতী অনস্য়া বেনকে তাঁহার আপন ভাইয়ের সহিত লড়িতে হইয়াছিল। মজুর ও মালিকের মধ্যে এই দারুণ যুদ্ধে শ্রীমতী অনস্য়া বেনের ভ্রাতা শ্রীঅম্বালাল সারাভাই মালিকদের পক্ষে মুখ্যস্থান লইয়াছিলেন। মিল-মালিকদের সহিত আমার একটা মধুর সম্পর্ক ছিল। তাঁহাদের বিরুদ্ধে দাঁড়ানো আমার পক্ষে বিষম কাজ। তাঁহাদের সহিত আলোচনা করিয়া মজুরদের দাবীর বিষয়ে একটা সালিশী বসাইতে অনুরোধ করিলাম। কিন্তু মালিকেরা তাঁহাদের ও তাঁহাদের মজুরের মধ্যে একটা সালিশের স্থান দেওয়ার যৌক্তিকতা স্বীকার করিলেন না।

মজুরদিগকে আমি হরতাল (ধর্ম্মঘট) করিতে যুক্তি দিলাম। এই যুক্তি দেওয়ার পূর্ব্বে মজুরদের ও তাহাদের নেতাদের সহিত ভালরকম কথা বলিয়া লইলাম। তাহাদিগকে হরতাল করার এই সর্ত্ত বুঝাইলাম—

১। শান্তি ভঙ্গ করিবে না।

২। যে ব্যক্তি কাজে যাইতে চায় তাহার উপর জোর করিবে না।

৩। মজুরেরা ভিক্ষান্ন খাইবে না।

৪। হরতাল যত লম্বাই হোক্ না কেন, তবু দৃঢ় থাকিবে ও যদি পয়সা ফুরাইয়া যায় তবে খাওয়া মাত্র যাহাতে চলে এমন মজুরী করিবে।

এই সর্ত্ত উহাদের প্রধানেরা বুঝিয়াছিল ও স্বীকার করিয়াছিল। মজুরেরা প্রকাশ্য সভা করিয়া স্থির করিল যে, তাহাদের দাবী যতদিন

স্বীকৃত না হয় অথবা তাহাদের দাবীর ন্যায় অন্যায় স্থির করার জন্য যত দিন সালিশ না বসে, ততদিন তাহারা কাজে যোগ দিবে না।

এই হরতালের মধ্যে শ্রীযুত বল্লভভাই প্যাটেল ও শ্রীযুত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারের সহিত আমি ভালরকম পরিচয় করিলাম। শ্রীমতী অনসূয়া বেনের পরিচয় ইতিপূর্ব্বে আমি ভালরকম করিয়াই লইয়াছিলাম।

হরতালকারীদের সভা প্রত্যহই নদীতীরে এক ঝাউ গাছের নীচে হইলে লাগিল। সেখানে তাহারা প্রত্যেকেই প্রতিদিন হাজির হইতে লাগিল। আমি প্রতিদিন তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইতাম, শান্তি রাখিতে ও আত্মসম্মান রাখিতে প্রতিদিন উপদেশ দিতাম। তাহারাও নিজেরা "একটেক" (প্রতিজ্ঞা-অটল) লেখা পতাকা লইয়া সহরে শোভাযাত্রা করিয়া বেড়াইত ও সভায় হাজির হইত।

এই হরতাল ২১ দিন চলিয়াছিল। তাহার মধ্যে মাঝে মাঝে আমি মালিকদিগের সহিত মন্ত্রণা করিতাম, এবং ন্যায় আচরণ করিতে অনুনয় করিতাম।

"আমাদের প্রতিজ্ঞা কি স্থির থাকিবে না ? আমাদের ও আমাদের মজুরদের মধ্যে বাপ-বেটা সম্বন্ধ......তাহার মধ্যে অন্য কেহ আসিয়া পড়িলে আমরা কেমন করিয়া সহ্য করিব ? ইহার মধ্যে আবার সালিশ কি ?"—এইরূপ জবাব আমি পাইতাম।

২১

আশ্রমে ক্ষণিক দর্শন

মজুরদের সম্বন্ধে আরো বলিবার পূর্ব্বে একবার আশ্রমের দিকে দৃষ্টি দেওয়ার আবশ্যকতা আছে। চম্পারণে থাকা কালেও আমি আশ্রমকে বিস্মৃত হইতে পারি নাই। কখন কখন আসা-যাওয়া করিতাম।

কোচরব আহ্‌মেদাবাদের পার্শ্বেই ছোট গ্রাম। কোচরবে মড়ক দেখা দিল। ছেলেপিলেদিগকে সেই বস্তিতে নিরাপদে রাখা সম্ভবপর ছিল না। আশ্রমে পরিচ্ছন্নতার নিয়ম খুব পালিত হইলেও আশেপাশের অপরিচ্ছন্নতা হইতে আশ্রমকে মুক্ত রাখা অসম্ভব ছিল। কোচরবের লোকদিগকে দিয়া স্বাস্থ্য ও পরিচ্ছন্নতার নিয়ম পালন করানো অথবা কোচরবের লোকদিগকে সেবা করার শক্তি এসময় আমাদের ছিল না। আমাদের আদর্শ ছিল—আশ্রমকে সহর বা গ্রাম হইতে দূরে স্থাপিত করা, তবে এত দূরে নয় যে সেখানে পঁহুছিতে কষ্ট হয়। কোনও দিন আশ্রমকে আশ্রম-রূপে নিজস্ব খোলা জমির উপর প্রতিষ্ঠিত করার সঙ্কল্প ছিল।

মড়ককেই কোচরব ছাড়ার নোটিশ বলিয়া গণ্য করিলাম। শ্রীযুত পুঞ্জাভাই হীরাচন্দ আশ্রমের সহিত খুব নিকট সম্বন্ধ রাখিতেন ও আশ্রমের ছোটবড় সেবা নিরভিমানে ও শুদ্ধ ভাবে করিতেন। তিনি আহমেদাবাদের সহিত সুপরিচিত ছিলেন। তিনি আশ্রমের জন্য উপযুক্ত জমি খুঁজিয়া দেওয়ার ভার লইলেন। কোচরবের উত্তর-দক্ষিণ

ভাগ আমি তাঁহার সাহিত ঘুরিলাম। তারপর উত্তর দিকে ৩।৪ মাইল দূরে যদি জমি পাওয়া যায় তবে তাহার খবর লইতে বলিলাম। এখন যেখানে আশ্রম আছে সেই জমি তিনি খোঁজ করিয়া আসিলেন। উহা জেলের নিকট ছিল বলিয়া আমার পক্ষে খুব প্রলোভনের বিষয় ছিল। সত্যাগ্রহ-আশ্রমবাসীর কপালে জেল ত লেখা আছেই, এইরূপ বিশ্বাস ছিল বলিয়া, জেলের প্রতিবাসী হইতে আমার ভাল লাগিল। আমি জানিতাম, জেল, চারিদিকে পরিছন্নতা আছে এমন স্থান দেখিয়াই বসানো হয়।

দিন আটের মধ্যেই জমি কেনা হইয়া গেল। জমির উপর একটা ঘর কি একটা গাছও ছিল না। নদীর তীর এবং নির্জ্জন বলিয়া ইহা পছন্দসই ছিল। আমরা তাবুতে থাকা স্থির করিলাম। রান্নার জন্য একটা করোগেটের কাজ চালানো মত ছাপ্পর বাঁধিয়া লইয়া ধীরে ধীরে ঘর তৈরী করা স্থির করিলাম।

এই সময় আশ্রমের বাসিন্দা বাড়িয়া গিয়াছিল। ছোট বড় ও স্ত্রী-পুরুষ লইয়া ৪০ জন ছিলেন। সকলেই এক পাকশালায় খাইতেন বলিয়া সুবিধা ছিল। আশ্রম সরাইয়া লওয়ার ব্যবস্থা দেওয়ার কাজ ছিল আমার, আর তাহা সম্পাদন করার কাজ পূর্ব্ববৎ স্বর্গীয় মগন-লালের ছিল।

স্থায়ী গৃহাদি নির্ম্মাণের পূর্ব্বে অসুবিধার শেষ ছিল না। সম্মুখে বর্ষাকাল। দ্রব্যাদি সমস্তই ৪ মাইল দূরবর্ত্তী সহর হইতে আনিতে হইত। এই পতিত জমিতে সর্পাদি ত ছিলই। ইহাতে ছেলেপিলে লইয়া বাস করার বিপদ কম ছিল না। সর্পাদি না মারার প্রথা ছিল, কিন্তু সাপের ভয় হইতে মুক্ত আমাদের মধ্যে কেহ ছিল না, আজও নাই।

হিংস্র জীবদিগকে না মারার নিয়ম 'ফিনিক্স', 'টলষ্টয়'ও 'সবরমতী' —এই তিন জায়গায় যথাশক্তি পালন করা হইতেছে। এই তিন স্থানেই পতিত জমিতে বসবাস করিতে হইতেছে, তিন জায়গাতেই সর্পাদির উপদ্রব খুব বেশী ছিল। তাহা হইলেও আজ পর্য্যন্ত একজনও মারা যায় নাই। ইহাতে আমার ন্যায় শ্রদ্ধালু, ঈশ্বরের হাত ও তাঁহার কৃপা দেখিতে পায়। ঈশ্বর পক্ষপাত করেন না, মানুষের প্রতিদিনের কাজে তাঁহার হাত দেওয়ার আবশ্যক নাই, এই প্রকার নিরর্থক শঙ্কা যেন কেহ না করে। এই বস্তু অনুভব ব্যতীত ভাষায় ব্যক্ত করার মত জ্ঞান আমার নাই। লৌকিক ভাষায় ঈশ্বরের বিভূতি ব্যক্ত হইলেও, আমি জানি যে, তাঁহার কার্য্য অবর্ণনীয়। কিন্তু মরণশীল মানুষ যদি তাঁহার কার্য্য বর্ণনা করিতে চায়, তবে নিজের অসম্পূর্ণ বাক্‌শক্তি মাত্রই তাহার সম্বল। সাধারণতঃ সর্পাদিকে না মারিলেও এতগুলি লোকের পঁচিশ বৎসর সর্পাঘাতাদি হইতে বাঁচিয়া যাওয়া আকস্মিক ঘটনা বলিয়া না মানিয়া ঈশ্বর কৃপা মানা যদি ভুল হয়, তবে সে ভুল পোষণ করার যোগ্য।

যখন মজুরদের হরতাল হইল তখন আশ্রমের গৃহাদির ভিত্তি গাঁথা হইতেছিল। তখন আশ্রমের প্রধান কার্য্য ছিল বস্ত্র-বয়ন। সূতাকাটা তখন পর্যন্তও ঠিক করিয়াই উঠিতে পারি নাই। বয়নশালা প্রথমে নির্ম্মাণ করা স্থির হইয়াছিল। সেই জন্যই তাহার ভিত্তি নির্ম্মিত হইতেছিল।
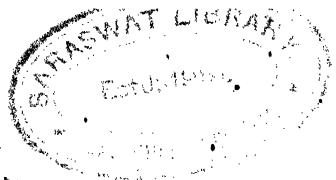
২২

উপবাস

মজুরেরা প্রথম দুই সপ্তাহ যথেষ্ট সাহস দেখাইল। শান্তিও খুব রাখিয়াছিল। প্রতিদিনের সভায় অনেক সংখ্যায় উপস্থিত হইত। আমি প্রতিদিন তাহাদিগকে প্রতিজ্ঞা স্মরণ করাইয়া দিতাম। "আমরা মরিব তবু আমাদের 'এক্‌টেক' (প্রতিজ্ঞা) কখনো ছাড়িব না"—এই কথা প্রতিদিনই তাহারা চীৎকার করিয়া বলিত।

অবশেষে তাহারা পিছাইয়া পড়িতে লাগিল। যেমন দুর্ব্বল লোক হিংস্র হয়, তেমনি দুর্ব্বল হওয়ার পর, যাহারা মিলে কাজে যাইত তাহাদের প্রতি তাহারা দ্বেষ করিতে আরম্ভ করিল। আমার আশঙ্কা হইতে লাগিল—কে কখন জবরদস্তি আরম্ভ করে। দিনের পর দিন সভায় হাজিরা কমিতে লাগিল। তাহাদের মুখে চোখে উদাসীনতা ফুটিয়া উঠিল। শেষে আমার নিকট খবর আসিল যে, তাহারা সঙ্কল্পত্যাগ করার উপক্রম করিয়াছে। আমি ব্যথিত হইলাম এবং এই সময় আমার ধর্ম্ম কি তাহা ভাবিতে লাগিলাম। দক্ষিণ আফ্রিকায় মজুরদের হরতালের অভিজ্ঞতা আমার ছিল। কিন্তু এ অনুভব নূতন। যে প্রতিজ্ঞার প্রেরণা আমার দ্বারাই দেওয়া হইয়াছে, যে প্রতিজ্ঞায় আমি প্রতিদিন সাক্ষী হইয়াছি, সে প্রতিজ্ঞা কেমন করিয়া ভাঙ্গিতে দেওয়া যায়? এই প্রকার বিচারকে অভিমানও বলা যায়, অথবা মজুরদের প্রতি ও সত্যের প্রতি প্রেম বলিয়াও গণ্য করা যায়। সে দিন প্রাতঃকালে আমি মজুরদের সভায় আসিয়াছি। আমার মনে কিছুই স্থির ছিল না যে, কি করিব। কিন্তু সভায় আমার মুখ হইতে এই

কথা বাহির হইয়া গেল—"যতদিন মজুরেরা ফিরিয়া না দাঁড়ায়, যতদিন মিটমাট না হয়, ততদিন হরতাল চলিবে ও ততদিন আমাকে উপবাস করিতে হইবে।"

উপস্থিত মজুরেরা স্তম্ভিত হইল। অনসূয়া বেনের চোখ দিয়া জলধারা পড়িতে লাগিল। মজুরেরা বলিয়া উঠিল—"তোমার নয়, আমাদেরই উপবাস করা উচিত, তোমাকে উপবাস করিতে দেওয়া হইবে না। আমাদিগকে মাফ্ কর, আমরা প্রতিজ্ঞা পালন করিব।"

আমি বলিলাম,—"তোমাদের উপবাস করার আবশ্যকতা নাই। তোমরা যদি তোমাদের প্রতিজ্ঞা পালন কর তাহা হইলেই যথেষ্ট। আমাদের কাছে পয়সা নাই, আমরা মজুরদিগকে ভিক্ষান্ন খাওয়াইয়া হরতাল চালাইব না। তোমাদের মধ্যে কেহ কেহ মজুরী আরম্ভ কর, যাহাতে কোনও রকমে তোমাদের খাওয়া জোটে। তাহা হইলে আমরা যতদিন খুসী হরতাল চালাইতে পারিব। তোমরাও নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিবে। আর আমার উপবাসও মিটমাট হইলেই ভাঙ্গিবে।" বল্লভভাই তাহাদের জন্য ম্যুনিসিপালিটিতে কাজ খুঁজিতেছিলেন, কিন্তু সেখানে কিছু কাজের আশা পাওয়া গেল না। মগনলাল বলিলেন—"আশ্রমের বয়নশালার মেঝে বালি ভরাট করিতে হইবে, তাহাতে অনেক মজুরকে কাজ দেওয়া যাইবে।" মজুরেরা সেই কাজ করিতে প্রস্তুত হইল। অনসূয়া বেন প্রথমে টুক্‌রী ধরিলেন এবং তিনি নদী হইতে বালি মাথায় করিয়া আনিতেই, মজুরদিগের দল ঐ কাজে লাগিয়া গেল। এই দৃশ্য দেখার মত। মজুরদের মধ্যে নূতন বল আসিল, যাহারা তাহাদিগকে হিসাব করিয়া পয়সা বিলি করিতেছিল, তাহাদের কাজ শেষ করা কঠিন হইয়া উঠিল।

এই উপবাসে এক দোষ ছিল। মালিকদিগের সহিত আমার যে প্রীতির সম্বন্ধ ছিল তাহা আমি পূর্ব্বেই লিখিয়াছি। সেই জন্য এই উপবাস তাহাদিগকে স্পর্শ করিবেই। সত্যাগ্রহী হিসাবে তাহাদের বিরুদ্ধে আমার উপবাস করা চলে না, একথা আমি জানিতাম। তাহাদের উপর উপবাসের যে প্রভাব পড়িবে তাহা সেখানে না পড়িয়া মজুরদের উপরেই পড়া উচিত। প্রায়শ্চিত্ত মালিকদের দোষের জন্য নয়, মজুরদের দোষের জন্যই আমি গ্রহণ করিয়াছিলাম। আমি মজুরদের প্রতিনিধি ছিলাম, সেই জন্য তাহাদের দোষে আমিও দোষী হই। মালিকদিগের নিকট আমার অনুনয় করার কথা, তাঁহাদের বিরুদ্ধে উপবাস করা ত জোর করার সামিল। কিন্তু তাহা হইলেও আমার উপবাসের প্রভাব তাঁহাদের উপর পড়িবেই ইহাও আমি জানিতাম। কিন্তু উপায় ছিল না। আমার উপবাস না করিয়া থাকার শক্তিই ছিল না। এই প্রকার দোষময় উপবাস করা আমার ধর্ম্ম বলিয়া আমি প্রত্যক্ষ দেখিলাম।

মালিকদিগকে আমি বুঝাইলাম—"আমার উপবাস-বশতঃ আপনাদিগকে আপনাদের পথ এতটুকুও ছাড়িতে হইবে না।" তাঁহারা আমাকে মিঠা-কড়া কথা শুনাইয়া দিলেন। তাঁহাদের শুনাইবার অধিকারও ছিল।

শেঠ অম্বালাল এই হরতালের বিপক্ষে দৃঢ়ভাবে দাঁড়াইতে অগ্রসর হইয়াছিলেন। তাঁহার দৃঢ়তা আশ্চর্য্য ধরণের ছিল। তাঁহার মিটমাটের বিরুদ্ধে এই দৃঢ়ভাব আমার ভাল লাগিয়াছিল। তাঁহার বিরুদ্ধে লড়া আমার পক্ষে আনন্দের বিষয় ছিল। তাঁহার সহিত বিরোধ করিতে যাহারা সহসা অগ্রসর হইয়াছে, তাহাদেরই পক্ষ হইয়া তাঁহার উপর

উপবাসের প্রভাব ফেলায় আমার পীড়া বোধ হইল। তাঁহার পত্নী সরলা দেবী আমাকে সহোদরের ন্যায় ভালবাসিতেন। আমার উপবাস হেতু তিনি যে ব্যথা পাইতেছিলেন তাহা দেখা আমার পক্ষে, অসহনীয় ছিল।

আমার উপবাসের প্রথম দিন অনসূয়া বেন, অন্যান্য অনেক মিত্র ও মজুরেরাও সঙ্গে সঙ্গে উপবাস করিয়াছিলেন। পরের দিন আমার সহিত উপবাস করা হইতে তাঁহাদিগকে বিরত করিয়াছিলাম। তাঁহাদিগকে বুঝানো শক্ত হইয়াছিল। এই প্রকারে চারিদিকের আবেষ্টন প্রেমময় হইয়াছিল। মিলের মালিকেরা কেবল আমার প্রতি দয়ার বশবর্ত্তী হইয়া মিটমাটের রাস্তা খুঁজিতে লাগিলেন। অনসূয়া বেন তাঁহাদের সহিত কথাবার্ত্তা চালাইতে লাগিলেন। শ্রীযুক্ত আনন্দ শঙ্কর ধ্রুব মাঝখানে আসিয়া পড়িলেন। তাহার পর তাঁহারা সালিশ নির্ব্বাচিত করিলেন ও হরতাল ভঙ্গ করা হইল। আমাকে তিনি দিন উপবাস করিতে হইয়াছিল। মালিকেরা মজুরদের মধ্যে মিঠাই বিতরণ করিয়াছিলেন। ২১ দিনে এই হরতাল শেষ হয়। মিটমাট সূচক এক সভা হয়। তাহাতে মিলের মালিকগণ ও বিভাগীয় কমিশনার হাজির ছিলেন। কমিশনার মজুরদিগকে উপদেশ দিলেন—“গান্ধী যাহা বলেন, তোমাদের সব সময় তাহাই করা উচিত।” এই মিটমাটের অল্প দিন পরেই আমাকে তাঁহার বিরুদ্ধেই দাঁড়াইতে হয়। সময় বদলাইল বলিয়া তিনিও বদলাইয়া গেলেন। তিনি খেড়ার পাতীদারদিগকে বলিতে লাগিলেন—আমার পরামর্শ তাহারা যেন না শোনে।

এই মিটমাট সম্পর্কে একটি রসপূর্ণ অথচ করুণা-উদ্দীপক বিষয় লক্ষ্য করিতে হইবে। মালিকেরা প্রচুর মিঠাই তৈরী করাইয়াছিলেন। কি করিয়া উহা পরিবেশন করা যায়, সে সম্বন্ধে এক প্রশ্ন উঠিল। যে

ঝাউ গাছের তলায় মজুরেরা প্রতিজ্ঞা লইয়াছিল, সেখানেই মিঠাই বিতরণ করা ভাল, এত লোকের উপযুক্ত অন্য সুবিধা-জনক স্থান পাওয়া যাইবে না বলিয়া সেই খোলা মাঠেই মিঠাই বিতরণ করা স্থির হয়। আমি ধরিয়া লইয়াছিলাম যে, ২১ দিন পর্য্যন্ত যাহারা নিয়ম পালন করিয়া আছে, তাহারা এ সময়ে অবশ্যই স্থির হইয়া দাঁড়াইয়া থাকিয়া মিঠাই লইবে, অধীর হইয়া মিঠাইয়ের উপর আসিয়া পড়িবে না। দুই তিনবার মিঠাই বিতরণ করার চেষ্টা নিষ্ফল হইল। লাইন করিয়া দাঁড় করাইয়া দুই তিন মিনিট স্থির রাখা হয়, তারপরই লাইন ভাঙ্গিয়া ভিড় হইয়া যায়। মজুরদের প্রধানেরা খুব চেষ্টা করিয়াছিল, কিন্তু তাহাদের চেষ্টা ব্যর্থ হয়। মজুরেরা তারপর ভিড় করিয়া মিঠাইয়ের উপর গিয়া পড়ে ও কতক মিঠাই মাটিতে পড়িয়া নষ্ট হয়। ফলে ময়দানে বিতরণ বন্ধ করিতে হয় ও অতি কষ্টে যতটা মিঠাই বাঁচানো গিয়াছিল তাহা শ্রীযুত অম্বালালের মির্জ্জাপুরের বাংলায় লইয়া যাওয়া হয়। তাহার পরের দিন এই মিঠাই বাংলার মাঠে বিতরণ করা হয়।

এই ব্যাপার স্পষ্টতঃই হাস্যকর। 'একটেকের' ঝাউগাছের তলায় মিঠাই বিতরণ করা হইবে—ইহা শুনিয়া আহ্‌মেদাবাদের ভিখারীরা সব সেখানে জড় হইয়াছিল ও তাহারাই লাইন ভাঙ্গিয়া মিঠাইয়ের উপর হুড়মুড় করিয়া পড়িতে চেষ্টা করিতেছিল—ইহাই ইহার করুণ দিক।

এই দেশ ক্ষুধায় এত পীড়িত যে, ভিখারীর সংখ্যা বাড়িয়াই চলিয়াছে ও তাহাদের আহার পাওয়ার জন্য ব্যগ্রতা সাধারণ মর্য্যাদা-বোধ লোপ করিয়া দিয়াছে। ধনীরা এই ভিখারীদিগের জন্য কাজের ব্যবস্থা না করিয়া বিনা বিচারে তাহাদিগকে ভিক্ষা দিয়া পুষিতেছেন।

২৩

খেড়ায় সত্যাগ্রহ

মজুরদের হরতাল শেষ হওয়ার পর আমি নিঃশ্বাস লওয়ারও অবকাশ পাই নাই, অমনি খেড়া জেলার সত্যাগ্রহের কার্য্য হাতে লইতে হয়। খেড়া জেলায় দুর্ভিক্ষের মত অবস্থা উপস্থিত হওয়ায় খাজনা আদায় মাফ্ করার জন্য খেড়ার পাতীদারেরা আন্দোলন করিতেছিল। এই বিষয়ে শ্রীযুক্ত অমৃতলাল ঠক্কর অনুসন্ধান করিয়া রিপোর্ট করিয়াছিলেন। আমি কোনও নির্দ্দেশ দেওয়ার পূর্ব্বে কমিশনারের সহিত দেখা করিয়াছিলাম। শ্রীযুত মোহনলাল পাণ্ড্যা ও শ্রীযুত শঙ্করলাল পরীখ এজন্য খুব পরিশ্রম করিতেছিলেন। ৺গোকুল দাস কহান দাস পারেখ ও শ্রীযুক্ত বিঠলভাই পাটেলের সাহায্যে তাঁহারা কাউন্সিলে খাজনা মাফ্ করার জন্য খুব আন্দোলন করিতেছিলেন। সরকারের নিকট একাধিক প্রতিনিধিদলের ডেপুটেশন গিয়াছিল।

এই সময় আমি গুজরাট সভার সভাপতি ছিলাম। সভা হইতে কমিশনার ও গভর্ণরের নিকট দরখাস্ত পাঠাই, টেলিগ্রাম করি এবং তাঁহাদের নিকট হইতে অপমান সহ্য করি। তাঁহারা সভার উপর যে ধমক চালান তাহা চুপ করিয়া হজম করি। সেই সময়কার সরকারী কর্ম্মচারীদের ব্যবহার এখন হাস্যজনক মনে হয়। তাঁহাদের সে সময়কার তাচ্ছিল্যযুক্ত ব্যবহার এখনকার দিনে অসম্ভব লাগে।

লোকের প্রার্থনা এত পরিষ্কার ছিল, এত সামান্য ছিল যে, উহা বিরোধ করার যোগ্যই ছিল না। যে বৎসর চার আনা বা চার আনার

কম ফসল হয়, সে বৎসর খাজনা মাফ হওয়ার নিয়ম ছিল। কিন্তু এখানে সরকারের কর্ম্মচারীদের আন্দাজে ফসল চার আনার বেশী হইয়াছিল। লোকের দিক হইতে যে প্রমাণ ছিল তাহাতে ফসল চার আনার কম ধরাই উচিত। কিন্তু সরকার তাহা মানিবেন কেন? লোকের দিক হইতে সালিশ নিযুক্ত করার জন্য অনুরোধ গেল, সরকারের কাছে তাহা অসহ্য বোধ হইল। যতটা অনুনয় করা যায় তাহা করার পর, সাথীদের সহিত কথাবার্ত্তা বলিয়া আমি সত্যাগ্রহ করার জন্য যুক্তি দেই।

আমাদের সঙ্গীদের ভিতর খেড়া জেলার সেবক ব্যতীত শ্রীযুত বল্লভ-ভাই প্যাটেল, শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, শ্রীমতী অনসূয়া বেন. শ্রীযুত ইন্দুলাল কানাইয়ালাল যাজ্ঞিক ও শ্রীমহাদেব দেশাই ইত্যাদি ছিলেন। বল্লভভাইয়ের ওকালতীর উপার্জ্জন খুব বেশী ছিল, ও ব্যবসা বাড়িয়া চলিতেছিল; তিনি তাহা ছাড়িয়া আসিলেন। তাহার পর তাঁহার আর স্থির হইয়া বসিয়া ওকালতী করাই হয় নাই—একথা বলা চলে।

আমরা নড়িয়াদ অনাথ আশ্রমে বাস করিতাম। অনাথ আশ্রমে বাস করার বিশিষ্টতা কিছু নাই। নড়িয়াদে এতগুলি লোক বাস করিতে পারে এমন খালি বাড়ী ছিল না।

নীচের লিখিত মত প্রতিজ্ঞা পত্রে শেষকালে আমরা লোকদের দস্তখত লই :—

"আমাদের গ্রামের ফসল চার আনার বেশী হয় নাই, ইহা আমরা জানি। এই কারণে খাজনা আদায় আগামী বৎসর পর্য্যন্ত মুলতবী রাখার জন্য আমরা সরকারের নিকট দরখাস্ত করিয়াও আদায় বন্ধ করাইতে পারি নাই। সেইজন্য আমরা নিম্ন-স্বাক্ষরকারীরা প্রতিজ্ঞা

করিতেছি যে, এই বৎসরের পুরা বাকী খাজনা, অথবা আমাদের মধ্যে যাহার আংশিক বাকী আছে সেই আংশিক খাজনা, আমরা দিব না। এই খাজনা আদায় করার জন্য সরকার আইন অনুসারে যাহা করিতে চাহেন করিতে দিব এবং তাহার জন্য দুঃখ সহ্য করিব। আমাদের জমি যদি বাজেয়াপ্ত করা হয়, তবে তাহা করিতে দিব। তবুও আমরা হাতে তুলিয়া সরকারকে খাজনা দিয়া আমাদের অভিযোগ মিথ্যা প্রমাণ করিয়া আত্মসম্মান খোয়াইব না। যদি সরকার আগামী কিস্তি আদায় সমস্ত জেলায় মুলতুবী রাখেন, তবে আমাদের মধ্যে যাহাদের শক্তি আছে তাহারা পুরা বা আংশিক বাকী খাজনা জমা দিতে প্রস্তুত আছি। আমাদের মধ্যে যাহাদের খাজনা দিতে পারে এমন শক্তি আছে, তাহাদেরও খাজনা না দেওয়ার কারণ এই যে, যাহাদের শক্তি আছে তাহারা খাজনা দিলে, যাহাদের শক্তি নাই তাহারা ভয়ে যাহা পাইবে তাহাই বেচিয়া বা কর্জ্জ করিয়া খাজনা দিবে ও দুঃখ পাইবে। এই অবস্থায় গরীবদিগকে বাঁচানো শক্তিমানের অবশ্য কর্ত্তব্য বলিয়া আমরা মনে করি।”

এই লড়াইয়ের বর্ণনায় আমি আর বেশী অধ্যায় নিয়োগ করিতে পারিব না। তাহার জন্য অনেক আনন্দদায়ক স্মৃতি বাদ দিয়া যাইতে হইবে। যাঁহারা এই লড়াইয়ের সমস্ত ঘটনায় ভাল করিয়া ও গভীর ভাবে প্রবেশ করিতে চান, তাহারা শ্রীযুত শঙ্করলাল পরীখ লিখিত ও প্রামাণিক বলিয়া গণ্য খেড়া সত্যাগ্রহের ইতিহাস পড়িতে পারেন।

২৪

পেঁয়াজ চোর

চম্পারণ হিন্দুস্থানের এক কোণায় অবস্থিত বলিয়া এবং সেখানে সংবাদপত্রে এই আন্দোলন বর্জন করা হইয়াছিল বলিয়া, বাহিরের লোক উহাতে আকৃষ্ট হইয়া সেখানে আসেন নাই। খেড়ার যুদ্ধ সংবাদপত্রে উঠিয়া গিয়াছিল। গুজরাটীরা এই নূতন রকম যুদ্ধের আস্বাদ ভাল করিয়া পাইয়াছিলেন। তাঁহারা ইহার কৃতকার্য্যতার জন্য অর্থ ঢালিয়া দিতে প্রস্তুত হইয়াছিলেন। সত্যাগ্রহ-যুদ্ধ টাকা দিয়া চালানো যায় না এবং ইহাতে ধনের আবশ্যকতা কমই আছে—একথা তাঁহাদিগকে সহজে বুঝানো যায় নাই। আমি মানা করিলেও বোম্বাইয়ের শেঠেরা আবশ্যকের অতিরিক্ত টাকা দিয়াছিলেন, ও যুদ্ধের পরও কিছু টাকা অবশিষ্ট ছিল।

অন্য দিক হইতে সত্যাগ্রহী-সৈন্যদিগকে সাদাসিধা চাল-চলনের নূতন পাঠ দিতে হইতেছিল। ঐ শিক্ষা তাহারা পুরাপুরি গ্রহণ করিতে পারিয়াছিল একথা বলিতে পারি না। তবে তাহারা সাধ্যমত ঐ সংস্কার অনেক পরিমাণে গ্রহণ করিয়াছিল।

পাতীদারদিগের পক্ষে এই ধরণের লড়াই নূতন। আমাদিগকে গ্রামে গ্রামে ঘুরিয়া সত্যাগ্রহের অর্থ বুঝাইতে হইত। সরকারী কর্ম্মচারীরা প্রজার মনিব নহে—ভৃত্য, প্রজার পয়সাতেই তাহারা বেতন ভোগ করে, ইহা বুঝাইয়া তাহাদের ভয় দূর করার আবশ্যক ছিল। কিন্তু নির্ভয় হইয়া সঙ্গে সঙ্গে যে বিনয়ী হইতে হয় একথা বুঝাইয়া

উঠা এক প্রকার অসম্ভব ছিল। একবার সরকারী কর্ম্মচারীর ভয় ত্যাগ করিলে, উহাদের দেওয়া অপমানের প্রতিশোধ না নিয়া কে থাকিতে পারে? আর যদিই সত্যাগ্রহী ঐরূপ অভদ্র ব্যবহার করে, তাহা হইলে সেটা দুধের সহিত বিষ মিশানোর মতই হয়। বিনয়ের শিক্ষা যে পাতীদারেরা ভাল করিয়া গ্রহণ করিতে পারে নাই, তাহা আমি পরে বেশ বুঝিয়াছিলাম। আমি অনুভব করিতেছি যে, বিনয় সত্যাগ্রহের সর্ব্বাপেক্ষা কঠিনতম অংশ। বিনয় মানে কেবল এই টুকুই নহে যে, সম্মানের সহিত কথা বলিতে হইবে। বিনয় মানে বিরোধীর প্রতি মনে মনে সম্মানের ভাব পোষণ করা, সহজ ভাব রক্ষা করা, তাহাদের হিত ইচ্ছা করা এবং সেই অনুযায়ী আচরণ করা।

প্রথম দিকটায় লোকের খুব সাহস দেখিতে পাওয়া গিয়াছিল, আর সরকারী কার্য্য নরম ধরণের ছিল। কিন্তু যেমন লোকের দৃঢ়তা বাড়িতে লাগিল, তেমনি সরকার উগ্রভাব ধারণ করিতে লাগিলেন। সরকারী জপ্তিদারেরা (ক্রোকী পেয়াদা) লোকের গরু-বাছুর ধরিয়া বেচিতে লাগিল ও ঘর হইতে যাহা পায় তাহাই টানিয়া লইয়া যাইতে লাগিল। খাজনা না দিলে সাজা দেওয়ার নোটিশ বাহির করা হইল। কোনও কোনও গ্রামে ক্ষেতের উপরকার সমস্ত শস্য ক্রোক করিল। লোকের মধ্যে একটা ত্রাসের ভাব প্রবেশ করিল। কেহ কেহ খাজনা দিয়া ফেলিল। কেহ কেহ নিজের মাল ক্রোক হওয়ার জন্য এমন ভাবে রাখিয়া দিল, যেন উহা দিয়াই খাজনা দেওয়া হইয়া যায়। আবার এজন্য মরিতেও প্রস্তুত, এমন কোন কোন লোকও ইহার মধ্য হইতে বাহির হইল।

ইতিমধ্যে শঙ্করলাল পরীখের খাজনা তাঁহার প্রজারা দিয়া ফেলিল।

ইহাতে হাহাকার পড়িয়া গেল। শঙ্করলাল পরীখ, ঐ জমি সাধারণের হিতার্থে দান করিয়া ফেলিয়া, নিজের প্রজার দোষের প্রায়শ্চিত্ত করিলেন। তাঁহার প্রতিষ্ঠা উজ্জ্বল হইয়া পড়িল ও অপরের নিকট দৃষ্টান্ত স্বরূপ হইল।

যাহারা ভয় পাইয়া গিয়াছিল তাহাদিগকে উৎসাহিত করার জন্য আমি এক পথ গ্রহণ করিলাম। একটা তৈরী পেঁয়াজের ক্ষেত সরকার অন্যায় করিয়া বাজেয়াপ্ত করিয়াছিল। মোহনলাল পাণ্ড্যার নেতৃত্বে ঐ পেঁয়াজের ফসল তুলিয়া লইয়া আসিতে আমি পরামর্শ দিলাম। আমার দৃষ্টিতে ইহা আইন ভঙ্গকরা বলিয়া গণ্য করি নাই। আর যদি তাহাই হয়, তবুও আমি সিদ্ধান্ত করিলাম যে, ক্ষেতের উপরিস্থ শস্য ক্রোক করা আইন অনুযায়ী কার্য্য হইলেও উহা নীতি-বিরুদ্ধ, ইহা লুট করা ছাড়া আর কিছু নয়, এবং ঐ রকম ক্রোক অমান্য করাই ধর্ম্ম। ঐ কার্য্য করিলে জেলে যাওয়ার বা অন্য দণ্ড পাওয়ার ভয় আছে তাহা স্পষ্ট করিয়া বুঝাইলাম। মোহনলাল পাণ্ড্যা ত তাহাই চাহেন। সত্যাগ্রহ-সম্মত রীতিতে কেহ জেলে না যাইতেই সত্যাগ্রহ যুদ্ধ শেষ হইয়া যায়, ইহা তাঁহার পছন্দ হইতেছিল না। তিনি ঐ ক্ষেত হইতে পেঁয়াজ উঠাইয়া আনার ভার লইলেন, তাঁহার সহিত আরও ৭।৮ জন গেলেন।

সরকারের পক্ষে তাঁহাকে গ্রেপ্তার না করিয়া আর উপায় কি? মোহনলাল পাণ্ড্যা ও তাঁহার সঙ্গীদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল, ইহাতে উৎসাহ বাড়িল। যেখানে লোক জেল ইত্যাদি দণ্ডের সম্বন্ধে নির্ভয় হয়, সেখানে তখন রাজদণ্ড লোককে না দমাইয়া তাহাদিগকে আরও বীরত্ব দেয়। এই মোকদ্দমার দিন কোর্ট লোকে ভরিয়া গেল।

পাণ্ড্যার ও তাঁহার সাথীদিগের অল্প সময়ের জন্য জেল হইল। আমি মনে করি কোর্টের নির্দ্ধারণ ভুল। পেঁয়াজ তুলিয়া লওয়া চুরির সামিল হয় না। কিন্তু ঐ দণ্ডাদেশের বিরুদ্ধে আপিল করার ইচ্ছা কাহারও ছিল না।

লোকে শোভাযাত্রা করিয়া জেল পর্য্যন্ত গেল এবং সেই দিন হইতে মোহনলাল পাণ্ড্যা লোকের নিকট হইতে "ডুংলী (পেঁয়াজ) চোর" এই আখ্যা প্রাপ্ত হইলেন। আজ পর্য্যন্তও তাঁহার সেই "ডুংলী-চোর" নামই বহাল আছে।

এই যুদ্ধ কখন ও কেমন করিয়া শেষ হইল, তাহার বর্ণনা করিয়া খেড়ার কথা শেষ করিব।

২৫

খেড়াসত্যাগ্রহের অন্ত

এই যুদ্ধের শেষ অপ্রত্যাশিত ভাবে হইল। লোকে যে ক্লান্ত হইয়া পড়িয়াছিল তাহা স্পষ্ট বুঝা গিয়াছিল। যাহারা দৃঢ় ছিল, তাহাদিগকে শেষ পর্য্যন্ত স্থির থাকিয়া একেবারে নষ্ট হইতে দিতে আমার সঙ্কোচ বোধ হইতেছিল। সত্যাগ্রহী লইতে পারে এমন কোনও উপায়ে যদি এই যুদ্ধ শেষ করিতে পারা যায়, তবে তাহাই করার দিকে আমার দৃষ্টি ছিল। এই রকম উপায় অপ্রত্যাশিত ভাবে আসিয়া পড়িল। নড়িয়াদ তালুকের মামলতদার বলিয়া পাঠাইলেন যে, অবস্থাপন্ন পাতীদারেরা যদি খাজনা দেয়, তবে গরীবদের খাজনা মুলতুবী রাখা হইবে। এই মর্ম্মে আমি লিখিত স্বীকৃতি চাহিয়া পাঠাইলে তাহাও পাওয়া গেল। কিন্তু মামলতদার নিজের তালুকের জন্যই বলিতে পারে, সমস্ত জেলার সম্বন্ধে দায়িত্ব এক কালেক্টারই লইতে পারেন, সেইজন্য আমি কালেক্টারকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তিনি বলিয়া পাঠাইলেন যে, মামলতদার যাহা বলিয়াছে সেই মর্ম্মে সরকারী আদেশ পূর্ব্বেই জারী করা হইয়াছে। আমি সে সংবাদ তখনো পাই নাই, তবে হুকুম বাহির হইয়া থাকিলে লোকের প্রতিজ্ঞা রক্ষা হইয়াছে বলা যায়। প্রতিজ্ঞাও এই জন্যই লওয়া হইয়াছিল। সেই হেতু এই সরকারী আদেশে সন্তোষ হইল।

তাহা হইলেও সত্যাগ্রহের এই প্রকার অবসান হওয়াতে আমি সুখী হইতে পারি নাই। সত্যাগ্রহ-যুদ্ধের পর যে আনন্দ উপস্থিত হয় ইহাতে তাহার অভাব ছিল। কালেক্টারের ভাব এই যে, তিনি কোনও

মিটমাট করেন নাই। গরীবলোকদিগের আদায় ছাড়ার কথা হইয়াছিল, কিন্তু বড় কেহ সুবিধা পায় নাই। গরীব যে কে একথা স্থির করার প্রজার অধিকার থাকিলেও, তাহা খাটানো যায় নাই। প্রজার ভিতর এই শক্তি নাই বলিয়া মনে দুঃখ হইত; সেইজন্য যদিও সত্যাগ্রহের অবসানে জয়ের উৎসব হইয়াছিল, তথাপি ঐ দৃষ্টিতে এই উৎসবে আমার ভিতর হইতে জোর পাই নাই।

সত্যাগ্রহের আরম্ভ সময়ে প্রজার মধ্যে যে তেজ ছিল, সত্যাগ্রহ অবসানকালে যদি সেই তেজ বাড়ে, তবেই সত্যাগ্রহের ঠিক মত অবসান হইয়াছে মনে করা যায়। এখানে তাহা দেখা যায় নাই।

তাহা হইলেও এই যুদ্ধ হইতে অপ্রত্যক্ষ ফল যাহা হইয়াছে, আজও তাহার ফল প্রত্যক্ষ ভাবে দেখা যাইতেছে। খেড়ার কৃষক-যুদ্ধ হইতে গুজরাটের কৃষকবর্গের জাগৃতি ও তাহাদের রাজনৈতিক শিক্ষার আরম্ভ হয়।

বিদুষী ডাঃ বেসাণ্টের 'হোমরুলের' গৌরবময় আন্দোলন চাষাদিগকে নিশ্চয়ই স্পর্শ করিয়াছিল, কিন্তু কৃষকদের জীবনের মধ্যে শিক্ষিতবর্গ ও স্বেচ্ছাসেবকের ঐকান্তিক প্রবেশ এই যুদ্ধ হইতেই আরম্ভ হইয়াছে বলা যায়। সেবকগণ পাতীদারের জীবনের সহিত ওতঃপ্রোত ভাবে যুক্ত হইয়া পড়িয়াছিলেন। স্বেচ্ছাসেবকগণও নিজেদের কর্ম্মক্ষেত্রের মর্য্যাদা এই যুদ্ধ হইতে বুঝিতে পারিয়া তাহা যথাশক্তি বাড়াইয়াছিলেন। বল্লভভাইও নিজেকে এই যুদ্ধে চিনিতে পারিয়াছিলেন। তাহাও যে একটা কম লাভ নয়, তাহা গত বৎসর বন্যা-রিলিফের সময় ও এই বৎসর বারডোলীতে দেখিতে পাওয়া গিয়াছে। গুজরাটের প্রজা-জীবনে নূতন তেজ আসিয়াছে—নূতন উৎসাহ সঞ্চারিত হইয়াছে।

পাতীদারেরা নিজের শক্তি সম্বন্ধে যে জ্ঞান পাইয়াছে তাহা কখনও ভুলিবার নয়। সকলেই বুঝিতে পারিয়াছিলেন যে, প্রজার মুক্তি প্রজার নিজের উপরেই—নিজের ত্যাগ-শক্তির উপরেই নির্ভর করে। খেড়ার ভিতর দিয়াই সত্যাগ্রহ গুজরাটে বদ্ধমূল হইল। যদিও লড়াইয়ের অবসানের ধরণে আমি সন্তুষ্ট হইতে পারি নাই, তবু খেড়ার প্রজার উৎসাহ ছিল; কেননা তাহারা দেখিয়া লইয়াছিল যে, এজন্য যতটা করিয়াছে তাহার ফল পাইয়াছে, এবং ভবিষ্যতে রাজনৈতিক দুঃখ হইতে মুক্তির পথ জানিয়াছে। এই জ্ঞানও তাহাদের উৎসবের পক্ষে যথেষ্ট।

তবুও খেড়ার কৃষকেরা সত্যাগ্রহের স্বরূপ পুরা বুঝিতে পারে নাই এবং সেজন্য যে দুঃখ অনুভব করিতে হইয়াছে তাহা পরে লিখিতেছি।

২৬

দ্বৈধ

যখন খেড়া-সত্যাগ্রহ চলিতেছিল, তখনও ইউরোপে মহাযুদ্ধ চলিতেছিল। সেই উপলক্ষে ভাইসরয় নেতৃবর্গকে নিমন্ত্রণ করেন এবং আমাকে উপস্থিত হওয়ার জন্য আগ্রহ প্রকাশ করেন। লর্ড চেমস্‌-ফোর্ডের সহিত যে আমার মৈত্রীর সম্বন্ধ ছিল তাহা পূর্ব্বেই বলিয়াছি।

আমি এই নিমন্ত্রণে দিল্লীতে যাই। কিন্তু এই সভায় যোগ দিতে আমার একটা সঙ্কোচ ছিল। প্রধান কারণ এই যে, উহাতে আলী ভাইয়েরা, লোকমান্য ও অন্য নেতারা নিমন্ত্রিত হন নাই। সে সময় আলী ভাইয়েরা জেলে ছিলেন। তাঁহাদের সহিত আমি দুই একবার দেখা করিয়াছিলাম। তাঁহাদের সম্বন্ধে অনেক কথা শুনিয়াছিলাম। তাঁহাদের সেবাবৃত্তি ও তাঁহাদের বাহাদুরীর প্রশংসা সকলেই করিতেন। হাকিম সাহেবের সহিত তখন আমার ঘনিষ্ঠ সম্বন্ধ হয় নাই। স্বর্গীয় আচার্য্য রুদ্র ও দীনবন্ধু এণ্ড্রুজের মুখে তাঁহার প্রশংসা শুনিয়াছি। কলিকাতায় মুস্লিম লীগের অধিবেশনে আমি শৈয়ব কুরেশী ও ব্যারিষ্টার খাজার সাক্ষাৎ লাভ করি। ডাক্তার আন্সারী ও ডাঃ আবদুর রহমানের সহিতও আমার পরিচয় হইয়াছিল। ভাল মুসলমানদিগের সহিত আমি বন্ধুত্বের প্রয়াসী ছিলাম। তাঁহাদের মধ্যে যাঁহারা পবিত্র ও দেশভক্ত বলিয়া গণ্য, তাঁহাদের সংস্পর্শে আসিয়া তাঁহাদের মন জানিতে তীব্র ইচ্ছা হইত। সেই জন্য তাঁহাদের সমাজে তাঁহারা যখনই লইয়া যাইতেন তখনই বিনা আপত্তিতে আমি যাইতাম।

হিন্দু-মুসলমানের মধ্যে আন্তরিক মিত্রতা নাই, ইহা আমি দক্ষিণ আফ্রিকাতেই বুঝিতে পারিয়াছিলাম। উভয় সম্প্রদায়ের মধ্যে মিলনের বাধা দূর করিতে কোনও সুবিধাই আমি ত্যাগ করিতাম না। খোশামোদ করিয়া বা আত্মসম্মান ত্যাগ করিয়া কাহাকেও খুসী করা আমার স্বভাব নয়। আমার নিকট সেই জন্যই এই প্রকার বোধ হইত যে, আমার অহিংসার পরীক্ষা ও তাহার বিশাল-প্রয়োগ এই সম্পর্কে হইতে পারে। এই বিশ্বাস আজও আমার অবিচল রহিয়াছে। প্রতি মুহূর্ত্তেই ঈশ্বর আমাকে পরীক্ষা করিতেছেন দেখিতেছি। আমার চেষ্টাও চলিতেছে।

আমার এই মনোভাব বশতঃ বোম্বাই বন্দরে নামার পর হইতেই আলী ভাইদের সহিত মিশিতে ভাল লাগিত। আমাদের প্রীতি বাড়িতে লাগিল। আমার সহিত পরিচয় হওয়ার পর মুহূর্ত্তেই সরকার তাঁহাদিগকে জীবন্ত কবর দেন। যখন জেলারের অনুমতি পাইতেন তখনই মৌলানা মহম্মদ আলী বেতুল জেল বা ছিন্দাওয়াড়া জেল হইতে দীর্ঘ পত্র লিখিতেন। তাঁহার সহিত দেখা করিতে আমি সরকারের অনুমতি চাহিয়া পাই নাই।

আলী ভাইদিগের জেল হওয়ার পর কলিকাতা মুস্লীম লীগে আমাকে মুসলমান ভাইয়েরা লইয়া গিয়াছিলেন। তাঁহারা আমাকে সভায় বক্তৃতা দিতে বলেন। আমি বক্তৃতায় বলিয়াছিলাম যে, আলী ভাই-দিগকে জেল হইতে মুক্ত করা মুসলমানদিগের ধর্ম্ম।

অতঃপর তাঁহারা আমাকে আলীগড় কলেজে লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে আমি দেশের জন্য ফকিরী লইতে মুসলমানদিগকে আমন্ত্রণ করিলাম।

আলীভাইদিগকে খালাস দেওয়ার জন্য আমি সরকারের সহিত পত্র ব্যবহার চালাইয়াছিলাম। এই সম্পর্কে আমি আলীভাইদিগের খিলাফৎ সম্বন্ধে কার্য্য ও আদর্শের সহিত পরিচিত হই। মুসলমানদিগের সহিত আলোচনা করিলাম। আমার এই বোধ হইল যে, যদি আমি মুসলমানদের সত্যই মিত্র হইতে চাই, তবে যাহাতে আলীভাইদিগকে খালাস করিতে পারা যায় ও খিলাফতের প্রশ্নে ন্যায়ানুসারে নিষ্পত্তি হয়, সে বিষয়ে আমার সম্পূর্ণ সাহায্য করা সঙ্গত। খিলাফতের প্রশ্ন আমার কাছে সহজ বোধ হইতেছিল। উহার ভালমন্দ আমার বিচার করার আবশ্যক ছিল না, কেবল ঐ বিষয়ে মুসলমানদের দাবী নীতি-বিরুদ্ধ না হইলেই আমার সাহায্য করা উচিত বলিয়া বুঝিলাম। ধর্ম্ম-বিষয়ক প্রশ্নে শ্রদ্ধার স্থান সর্ব্বোপরি। সকলের শ্রদ্ধাই যদি একই বস্তুর উপর একই রূপ হইত, তাহা হইলে জগতে একই ধর্ম্ম হইত। খিলাফৎ বিষয়ে দাবী আমার নিকট নীতি-বিরুদ্ধ মনে হয় নাই। কেবল তাহাই নহে, এই দাবী ব্রিটিশ প্রধান মন্ত্রী লয়েড্ জর্জ্জ স্বীকার করিয়াছেন বলিয়া সেই কথা পালন করাইতে আমার সম্পূর্ণ প্রযত্ন করা উচিত বলিয়া জানিয়াছিলাম। লয়েড জর্জ্জের অঙ্গীকার এত স্পষ্ট বাক্যে ছিল যে, ঐ বিষয়ের গুণ দোষ অনুসন্ধান করা কেবল আমার অন্তরাত্মার তুষ্টির জন্যই আবশ্যক ছিল।

খিলাফৎ সম্বন্ধে আমি মুসলমানদের সঙ্গ লইয়াছি বলায় মিত্রেরা ও সমালোচকেরা আমাকে খুব শুনাইয়াছেন। ঐ সকল সমালোচনা বিচার করিয়াও, আমি যে সঙ্কল্প তখন করিয়াছিলাম ও যে সাহায্য করিয়াছিলাম তাহার জন্য আমার অনুতাপ হইতেছে না। ঐ সকল সমালোচনায় আমার সংশোধিত হওয়ার কিছুই নাই। আজও

যদি ঐ প্রকার প্রশ্ন উঠে, তবে আমার আচরণ যে ঠিক ঐ রূপই হইবে, ইহা আমার নিকট সুস্পষ্ট।

এই ধরণের চিন্তা হৃদয়ে লইয়া আমি দিল্লী গেলাম। মুসলমানদের দুঃখের কথা লইয়া ভাইস্‌রয়ের সহিত আলোচনা করিব মনে করিয়াছিলাম। খিলাফৎ প্রশ্ন তখনও পূর্ণ স্বরূপ ধারণ করে নাই।

দিল্লী পঁহুছিলে দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ এক নৈতিক প্রশ্ন তুলিলেন। এই সময়ে ইংলণ্ড ও ইটালীর মধ্যে একটা গোপন সন্ধির বিষয় সংবাদ-পত্রে আলোচিত হইতেছিল। সেই প্রসঙ্গে দীনবন্ধু আমাকে বলিলেন—"যদি এই প্রকার গুপ্ত সন্ধি ইংলণ্ড কাহারও সহিত করিয়া থাকে, তবে আপনার এই সভায় সাহায্য করিতে যোগ দেওয়ার কি দরকার?" আমি এই সন্ধি সম্বন্ধে কিছু জানিতাম না। দীনবন্ধুর কথাই আমার পক্ষে যথেষ্ট ছিল। এই কারণে সভায় যোগ দেওয়ার দ্বিধা জানাইয়া আমি লর্ড চেমস্‌ফোর্ডকে পত্র দিলাম। তিনি ঐ বিষয় আলোচনা করার জন্য আমাকে ডাকিলেন। তাঁহার সহিত ও পরে মিঃ মফীর সহিত আমার অনেক আলোচনা হইল। তাহার ফলে আমি সভায় যোগ দিতে স্বীকার করিলাম। ভাইস্‌রয়ের যুক্তি সংক্ষেপে এই ছিল:—"আপনি নিশ্চয়ই মনে করেন না যে, ব্রিটিশ ক্যাবিনেট যাহা কিছু করে, তাহাই ভাইস্‌রয় জানে। ব্রিটিশ গবর্ণমেণ্ট যে ভুল করে না একথা আমি বলি না, কেহই বলিবে না। কিন্তু যদি উহার অস্তিত্ব জগতের পক্ষে কল্যাণকর বলিয়া স্বীকার করেন, এবং উহার চেষ্টায় এই দেশের মোটের উপর হিত হইতেছে, ইহা যদি মানেন, তবে উহার বিপদের সময় যে সাহায্য করাও আপনার ধর্ম্ম তাহা কি স্বীকার করিবেন না? গোপন সন্ধি সম্বন্ধে

আপনিও যাহা কাগজে দেখিয়াছেন, আমিও তাহাই দেখিয়াছি। উহার বেশী ঐ বিষয়ে আমি কিছু জানি না, এ কথা আপনাকে নিশ্চয় করিয়া বলিতেছি। সংবাদপত্রে কত আজগুবি কথা উঠে, তাহা ত আপনি জানেন। সংবাদপত্রে কি একটা নিন্দার কথা উঠিয়াছে, সেই জন্য কি আপনি সাম্রাজ্যকে এমন সময় ত্যাগ করিতে পারেন? যখন যুদ্ধ শেষ হইবে, তখন আপনার নীতি-বিষয়ক যত প্রশ্ন থাকে তাহা উঠাইতে পারেন, এবং আক্রমণ করিতে হইলেও করিতে পারেন।"

এই যুক্তি নূতন নয়। কিন্তু যে সময়ে যে ভাবে ইহা বলা হইয়াছিল তাহা আমার কাছে নূতনের মত লাগিয়াছিল। আমি সভায় যাওয়া স্বীকার করিলাম। খিলাফৎ সম্বন্ধে আমাকে ভাইসরয়ের নিকট পত্র দিতে হইবে—এই প্রকার স্থির হইল।

২৭

রংরুট ভর্তি

সভায় আমি উপস্থিত হইলাম। ভাইসরয়ের খুব ইচ্ছা যে, সিপাহী সংগ্রহের প্রস্তাবের স্বপক্ষে বলি। আমি 'হিন্দী-হিন্দুস্থানী'তে বলার অনুমতি চাহিলাম। ভাইসরয় অনুমতি দিলেন, কিন্তু উহার সহিত ইংরাজীতেও বলার প্রস্তাব করিলেন। আমার কিছু বক্তৃতা করার আবশ্যক ছিল না। আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা মাত্র এই—"আমার দায়িত্বের কথা সম্পূর্ণ স্মরণ করিয়া এবং সেই দায়িত্ব বুঝিয়া এই প্রস্তাব করিতেছি।"

আমি হিন্দুস্থানীতে বলিয়াছি বলিয়া অনেকে ধন্যবাদ দিলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, ভাইসরয়ের সভায় এতকাল মধ্যে এই প্রথম হিন্দুস্থানী ভাষায় বলা হইল। এই ধন্যবাদ ও এই প্রথম হিন্দী ভাষা প্রবেশ করার সংবাদ আমাকে বিঁধিল। আমি লজ্জিত হইলাম। আমার নিজের দেশে, আমার দেশের সম্বন্ধীয় কাজের আলোচনা সভায়, দেশের ভাষার বহিষ্কার, অথবা তাহার অপমান কি দুঃখের বিষয়! এই ব্যাপার আমাদের পতিত অবস্থা স্মরণ করাইয়া দেয়। সভায় যে কথা আমি বলিয়াছিলাম তাহার মূল্য আমার কাছে খুবই বেশী ছিল। এই সভা এবং আমার এই প্রস্তাব সমর্থন আমার পক্ষে ভুলিয়া যাওয়া অসম্ভব ছিল। আমার এক দায়িত্ব ছিল যাহা দিল্লীতেই পূরণ করা আবশ্যক। সে কাজ ভাইসরয়কে পত্র লেখা। আমার কাছে এই কাজ তত সহজ ছিল না। ঐ সভায় যাওয়ায় আমার দ্বিধা ও তাহার কারণ, এবং

ভবিষ্যতের আশা ইত্যাদির কথা—আমার জন্য, সরকারের জন্য ও জনসাধারণের জন্য—সাফ্ করিয়া লওয়া দরকার ছিল।

আমি ভাইসরয়কে যে পত্র দিলাম তাহাতে লোকমান্য তিলক, আলীভাই ইত্যাদি নেতাদিগের অনুপস্থিতির জন্য দুঃখ প্রকাশ করিলাম। জনসাধারণের রাজনৈতিক অধিকার লাভের বিষয়, গভর্ণমেণ্টের নিকট মুসলমানদের, যুদ্ধ হইতে উৎপন্ন দাবীর বিষয় উল্লেখ করিলাম। এই পত্র ছাপাইবার আমি অনুমতি চাই ও ভাইসরয় সন্তুষ্টচিত্তে তাহা দেন।

এই পত্র সিমলায় পঁহুছাইয়া দেওয়া দরকার ছিল; কেননা সভা শেষ হইলেই ভাইসরয় সিমলায় গিয়াছিলেন। ডাকযোগে পত্র দিলে বিলম্ব হইবে। আমার কাছে ঐ পত্রের বিশেষ মূল্য ছিল এবং বিলম্ব না করিয়াই পঁহুছাইয়া দেওয়া আবশ্যক ছিল। কোনও পবিত্র চরিত্র লোকের হাত দিয়া পত্রখানা পাঠাইলে ভাল হয়, এই প্রকার আমার মনে হইতেছিল। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ ও অধ্যক্ষ সুশীল রুদ্র, রেভারেণ্ড আয়ারল্যাণ্ডের নাম প্রস্তাব করিলেন। তিনি বলিলেন যে, ঐ পত্র পড়িয়া যদি উহা শুদ্ধ মনে হয়, তবে তিনি তাহা লইয়া যাইতে পারেন। পত্রখানা গোপনীয় ছিল না, তিনি পড়িয়া দেখিয়া সন্তুষ্ট হইলেন ও লইয়া যাইতে রাজী হইলেন। আমি তাঁহাকে দ্বিতীয় শ্রেণীর রেলভাড়া দিতে চাওয়ায়, তিনি উহা লইতে অস্বীকার করিলেন এবং যাইবার সময় ইণ্টার ক্লাশেই গেলেন। তাঁহার সাদাসিধাভাবে, সরলতায় ও স্পষ্ট ব্যবহারে আমি মুগ্ধ হইলাম। এই পবিত্র ব্যক্তির হাতে প্রেরিত পত্রের ফল আমার বিশ্বাস মত ভালই হইয়াছিল। আমার পথ ইহা দ্বারা সাফ্ হইয়া গেল।

আমার দ্বিতীয় দায়িত্ব ছিল যুদ্ধের সিপাহী সংগ্রহ করা (রংরুট বা

recruit ভর্ত্তি করা)। সিপাহী যদি চাই, তাহার জন্য খেড়াতে না যাইয়া আর আমি কোথায় যাইব? আমার নিজের সাথীদিগকেই যদি প্রথম সিপাহী হইতে নিমন্ত্রণ না করি, তবে কাহাকে করিব? খেড়া পঁহুছিয়াই বল্লভভাই ইত্যাদির সহিত কথাবার্ত্তা বলিলাম। তাঁহাদের কাহারও কাহারও এই কার্য্য পছন্দ হইল না, আবার যাঁহাদের ভাল লাগিল, তাঁহারা সফলতার সম্বন্ধে সন্দেহ প্রকাশ করিলেন। যে শ্রেণীর লোকের নিকট ভর্ত্তি হওয়ার অনুরোধ করিব, তাহাদের সরকারের সহিত মোটেই সদ্ভাব ছিল না। সরকারের কর্ম্মচারীদের অনুষ্ঠিত অত্যাচারের স্মৃতি তাহাদের তখনও পুরানো হয় নাই।

তবুও তাহারা কার্য্যারম্ভ করিতে সম্মত ছিল। কার্য্য আরম্ভ করিতেই আমার চক্ষু খুলিয়া গেল। আমার আশাও কতকটা নরম হইল। সত্যাগ্রহ-লড়াইয়ের সময় আমরা বিনা ভাড়ায় গাড়ী পাইতাম, একজন স্বেচ্ছাসেবক চাহিলে দুইজন পাইতাম। এখন পয়সা দিয়াও গাড়ী দুষ্প্রাপ্য হইল। কিন্তু ইহাতেও আমরা নিরাশ হইলাম না। গাড়ী না লইয়া হাঁটিয়াই ভ্রমণ করা স্থির করিলাম। প্রত্যহ ২০ মাইল করিয়া আমাদের চলিতে হইত। আর গাড়ীই যদি না পাওয়া যায়, তবে খাদ্যই বা কেন পাওয়া যাইবে? খাদ্য চাওয়াও ঠিক হয় না। সেইজন্য প্রত্যেক স্বেচ্ছাসেবক নিজের খাদ্য নিজের ঝুলিতেই লইয়া বাহির হইবে স্থির করিলাম। গরমের দিন বলিয়া বিছানা কিংবা গায়ে দেওয়ার চাদরের আবশ্যক ছিল না।

যে সব গ্রামে যাইতাম সেইস্থানেই সভা করিতাম। লোকে সভায় আসিত, কিন্তু নাম পাওয়া যাইত মাত্র দুই একজনের। "আপনি অহিংসাবাদী হইয়া অস্ত্র লওয়ার কথা কেন বলিতেছেন? সরকার কি হিন্দুস্থানী,

সরকার কি আমাদের ভাল করিতেছে যে, সাহায্য করিতে বলিতেছেন? —এই ধরণের আরও অনেক প্রশ্ন আমি শুনিতে পাইতাম।

এই প্রকার হইলেও ধীরে ধীরে আমাদের কার্য্যের প্রভাব লোকের উপর বাড়িতে লাগিল। নামও বেশ আসিতে লাগিল। প্রথম দল বাহির হইয়া গেলে, দ্বিতীয় দলে লোক-প্রবেশের পথ খোলা হইয়া যাইবে বলিয়া মনে হইল। সংগৃহীত লোকদিগকে কোথায় রাখা হইবে, এই সব সম্বন্ধে কমিশনারের সহিত আলোচনা করিতে যাইতে হইত। দিল্লীতে যেমন সভা হইয়াছিল, কমিশনারেরা সেই প্রণালীতে সভা করিতে লাগিলেন, গুজরাটেও সভা হইতেছিল। সেই সকল সভায় আমার ও আমার সহকর্মীদের যাওয়ার নিমন্ত্রণ হইত এবং আমিও উপস্থিত হইতাম। দিল্লীতে আমার যে স্থান ছিল এখানে তাহাও ছিল না। সেই সকল সভার দাস-মনোভাবের আবেষ্টন আমাকে স্বস্তি দিত না। এখানে দিল্লী অপেক্ষা আমি কিছু বেশী বলিতাম। আমার উক্তির মধ্যে খোশামোদ থাকিত না, বরঞ্চ দুই চারটা কড়া কথাই থাকিত।

'রংরুট্' ভর্ত্তি করার জন্য আবেদন ছাপাইয়া বিতরণ করিতাম। সিপাহী দলে ভর্ত্তি হওয়ার ঐ আবেদন পত্রে একটি এরূপ যুক্তি ছিল যাহাতে কমিশনারদিগের পীড়া বোধ হইত। তাহার সার মর্ম্ম এই প্রকার ছিল—ব্রিটিশ রাজ্যের অনেক অপকীর্ত্তির মধ্যে সমস্ত প্রজাকে নিরস্ত্র করিয়া রাখার আইনকে ভবিষ্যৎ ইতিহাস সর্ব্বাপেক্ষা মন্দ কাজ বলিবে। এই আইন যদি রদ করাইতে হয়, যদি অস্ত্রের শিক্ষা লইতে হয়, তবে এই স্বর্ণ-সুযোগ। রাজ্যের বিপদের সময় যদি মধ্যবিত্ত লোকেরা সাহায্য করে, তবে অবিশ্বাস দূর হইয়া যাইবে, আর যাহার অস্ত্র ধারণ

করার ইচ্ছা, সে অক্লেশে অস্ত্র ধারণ করিতে পারিবে। এই উক্তির সম্পর্কে কমিশনারকে বলিতে হইত যে, তাঁহার ও আমার মধ্যে মতভেদ থাকিলেও তিনি আমার সভায় যোগদান করা পছন্দ করেন। আমার মত, আমি যতটা পারি সুমিষ্ট বাক্যে সমর্থন করিতাম। এই প্রকরণে উপরে যে পত্রের উল্লেখ করা হইয়াছে, তাহার সারমর্ম্ম নীচে দেওয়া হইল—

"যুদ্ধ পরিষদে উপস্থিত হওয়া লইয়া আমার মনে সংশয় ছিল, কিন্তু আপনার সহিত দেখা করার পর তাহা দূর হয়। আপনার প্রতি আমার অসীম সম্মানের ভাবই উহার একমাত্র কারণ। পরিষদে যোগ না দেওয়ার প্রধান হেতু এই ছিল যে, উহাতে লোকমান্য তিলক, মিসেস্ বেসাণ্ট ও আলীভাইদের নিমন্ত্রণ হয় নাই। ইহাদিগকে আমি খুব প্রভাবশালী জন-নায়ক বলিয়া গণ্য করি। আমার বিশ্বাস যে, তাঁহাদিগকে নিমন্ত্রণ না করিয়া সরকার অতিশয় ভুল করিয়াছেন। এবং আমি এখনো বলি যে, তাঁহাদিগকে প্রাদেশিক পরিষদে নিমন্ত্রণ করিয়া সেই ভুল সংশোধন করা যায়। আমার বিনীত নিবেদন এই যে, এইরূপ বিজ্ঞ জন-নায়কদিগকে, তাঁহাদের সহিত মতের যতই অমিল হোক্ না কেন, কোনও সরকার অগ্রাহ্য করিতে পারেন না। এই অবস্থায় আমি কমিটিতে উপস্থিত থাকিতে পারি নাই এবং সভার প্রস্তাব সমর্থন করিয়াই সন্তুষ্ট ছিলাম। সরকার যদি আমার সাহায্য-দানের রীতি স্বীকার করেন, তবে শীঘ্রই আমার সমর্থিত বিষয় কার্য্যে পরিণত করিব—এ প্রকার আশা রাখি।

যে সাম্রাজ্যে আমরা ভবিষ্যতে সম্পূর্ণরূপেই অংশীদার হইতে আশা রাখি, তাহাকে তাহার বিপদের সময় সাহায্য করা আমার ধর্ম্ম বলিয়া

মনে হয়। কিন্তু একথাও আমাকে বলিতে হয় যে, ইহার সহিত আমাদের এ আশাও রহিয়া গিয়াছে যে, এই সাহায্য করার জন্য আমরা আমাদের লক্ষ্যস্থানে অধিকতর শীঘ্র পঁহুছিব। সেই হেতু জনসাধারণের ইহাও মনে করার অধিকার আছে যে, যে শাসন-সংস্কার আপনার বক্তৃতায় শীঘ্রই পাওয়া যাইবে বলিয়াছেন, তাহাতে কংগ্রেস ও মুস্লীম লীগের প্রধান দাবীর সমাবেশ থাকিবে। যদি আমার দ্বারা সম্ভব হইত তবে, আমি সাম্রাজ্যের এই বিপদের দিনে 'হোমরুল' ইত্যাদি কথা উচ্চারণ না করিতে সকল শক্তিমান ভারতবাসীকে সাম্রাজ্যের রক্ষণের জন্য সমস্ত শক্তি নিয়োগ করিতে প্রেরণা দিতাম। ইহা করিয়াই আমরা সাম্রাজ্যের প্রধান ও মাননীয় অংশীদার বলিয়া গণ্য হইতে ও বর্ণের ভেদ ও দেশভেদ তুলিয়া দিতে পারিতাম।

কিন্তু শিক্ষিত সম্প্রদায় এ বিষয়ে অল্পমাত্র সাহায্য করার পথই লইয়াছেন। জনসাধারণের উপর তাঁহাদের কার্য্যের প্রভাব খুবই হইয়াছে। আমি দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিয়াই জনসাধারণের সহিত ঘনিষ্ঠ ভাবে যুক্ত হইয়াছি। আমি আপনাকে জানাইতে ইচ্ছা করি যে, স্বায়ত্তশাসন পাওয়ার ইচ্ছা প্রজা-সাধারণ পর্য্যন্ত পঁহুছিয়াছে। স্বায়ত্তশাসন ভিন্ন লোকে কদাপি সন্তুষ্ট হইবে না। তাহারা বুঝিয়াছে যে, স্বায়ত্তশাসন পাওয়ার জন্য যতই দুঃখভোগ করা যাক্ না কেন, তাহা বেশী নয়। সেই হেতু যদিও সাম্রাজের জন্য যত স্বেচ্ছাসেবক আবশ্যক হয় তাহা দেওয়া আবশ্যক, তথাপি আর্থিক সাহায্য সম্বন্ধে সে কথা বলা যায় না। লোকের আর্থিক অবস্থা দেখিয়া আমি বলিতে পারি যে, ভারতবর্ষ যে আর্থিক সাহায্য এতাবৎ দিয়াছে তাহা তাহার শক্তির অতীত। কিন্তু আমি ইহা জানি যে, সভায় তাহা হইলেও আমাদের

স্থিতির বিশেষত্ব আছে। আমরা কিছু সাম্রাজ্যের সমশ্রেণীর অংশীদার নহি। আমাদের সাহায্য ভবিষ্যতের আশার উপর নির্ভর করিয়া করা হইতেছে। সেই আশা কি, তাহা বিশেষ করিয়া উল্লেখ করা আবশ্যক। আমি এই আশা পূরণের সর্ত্ত করিয়া সাহায্য করিতে চাই না। কিন্তু যদি আমাদের আশা পূর্ণ না হয়, তবে সাম্রাজ্য সম্বন্ধে আজ পর্য্যন্ত যে ধারণা করিয়াছি তাহা ভুল বলিয়া গণ্য হইবে। আপনি ঘরোয়া ঝগড়া ভুলিয়া যাইতে বলিয়াছেন। তাহার মানে যদি এই হয় যে, সরকারী কর্ম্মচারীর জুলুম সহ্য করিতে, তাহাদের দুষ্কার্য্য সহ্য করিতে হইবে, তবে তাহা করা অসম্ভব জানিবেন। সংগঠিত জুলুমের বিরুদ্ধে সমস্ত বল প্রয়োগ করা আমি ধর্ম্ম বলিয়া মানি। সেইজন্য আমি বলি, কর্ম্মচারীদিগকেই বলিয়া দেওয়া দরকার যে, একজনের জীবনকেও তাঁহারা যেন অগ্রাহ্য না করেন এবং এ পর্য্যন্ত যে লোকমতকে তাহারা মান দেন নাই তাহাকেও যেন মান দেন। চম্পারণে শতবর্ষ অবধি অনুষ্ঠিত জুলুমের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া ব্রিটিশের ন্যায়-বিচারের শ্রেষ্ঠত্বই আমি প্রমাণ করিয়াছি। খেড়ার রায়তেরা দেখিয়া লইয়াছে যে, যখন তাহাদের সত্যের জন্য দুঃখ বরণ করার শক্তি হয়, তখন সত্যকার শক্তি—রাজশক্তি নয় লোক-শক্তিই। সেইজন্য যে রাজত্বকে প্রজারা অভিশাপ দিত, আজ সেখানে বিরক্তি কমিয়া আসিয়াছে। যে রাজশক্তি প্রজার সবিনয় আইন-অমান্য সহ্য করিয়া লয়, সে শক্তি অন্ত পর্য্যন্ত লোক-মতের অগ্রাহ্যকারী হইতে পারে না—এই বিশ্বাস তাহাদের হইতেছে। সেইজন্য আমি মনে করি যে, চম্পারণ ও খেড়ায় আমি যে কাজ করিয়াছি তাহা সাম্রাজ্যের এই যুদ্ধের সাহায্যে আমার সেবা। এই ধরণের কার্য্য যদি আমাকে বন্ধ করিতে বলেন, তবে আমার শ্বাস

বন্ধ করিতে বলিতেছেন জানিব। আমি যদি ভারতবর্ষে আত্মবল ও প্রেমবলকে শস্ত্র-বলের বদলে লোকপ্রিয় করিয়া তুলিতে সফলকাম হই, তবে আমি জানি, ভারতবর্ষ সারা জগতের ক্রুদ্ধদৃষ্টির বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়া যুঝিতে পারিবে। সেইজন্য সর্ব্ব সময় এই দুঃখ বহন করার সনাতন নীতি আমার জীবনে সত্য করিয়া তুলিতে আমার আত্মার প্রযত্ন থাকিবে। এই নীতি স্বীকার করার জন্য অপরকেও সর্ব্বদা আহ্বান করিব, এবং যদি অন্য ধরণের কর্ম্ম হাতে লই, তবে তাহারও উদ্দেশ্য হইবে—এই নীতির শ্রেষ্ঠত্ব সিদ্ধ করা।

পরিশেষে, মুসলমান ষ্টেট্সমূহ সম্বন্ধে নিশ্চিত একটা আশ্বাস দেওয়ার জন্য ব্রিটিশ মন্ত্রী-মণ্ডলের নিকট প্রস্তাব করিতে আপনাকে অনুরোধ জানাইতেছি। আপনি জানেন, এ সম্বন্ধে সকল মুসলমানেরই দুশ্চিন্তা আছে। নিজে হিন্দু হইয়া মুসলমানের প্রয়োজন সম্বন্ধে উদাসীন থাকিতে পারি না। তাহাদের দুঃখ আমাদের দুঃখ। মুসলমান-রাজ্যের দাবী স্বীকার করা, তাহাদেরও ধর্ম্মস্থান সম্বন্ধে তাহাদের প্রয়োজনকে মান্য করা এবং ভারতবর্ষের স্বায়ত্ত-শাসন বিষয়ের দাবী স্বীকার করা—এই সমস্তর উপরেই সাম্রাজ্যের কুশল নির্ভর করে। আমার এই পত্র লেখার হেতু এই যে, আমি ইংরাজদিগকে ভালবাসি, এবং যে রাজভক্তি ইংরেজদের আছে সেই রাজভক্তি আমি প্রত্যেক ভারতবাসীর ভিতর জাগ্রত করিতে ইচ্ছা করি।”

২৮

মৃত্যু-শয্যায়

'রংরুট' সংগ্রহ করিতে (যুদ্ধের জন্য সিপাহী ভর্ত্তি) আমার স্বাস্থ্য নষ্ট হইয়া গেল। এই সময় আমার খাদ্য ছিল প্রধানতঃ পেষাই-করা চিনাবাদাম ভাজা, কলা ইত্যাদি ফল ও ২।৩টা লেবুর জল। চীনাবাদাম বেশী খাইলে অসুখ করিত, তাহা জানিয়াও উহাই যথেষ্ট খাইতাম। ইহাতে একটু আমাশয় হইল। আমাকে মাঝে মাঝে আশ্রমে আসিতে হইত। এই আমাশয় আমি গ্রাহ্য করিতাম না। ঔষধ এই সময় বড় খাইতাম না। একবেলা খাওয়া ছাড়িয়া দিলেই ভাল হইয়া যাইব মনে হইত। পরদিন সকালবেলা যদি কিছু না খাইতাম, তবে ব্যথা প্রায় সারিয়া যাইত। আমি জানিতাম, আমার উপবাস বেশীদিন দেওয়া দরকার, আর যদি খাইতেই হয়, তবে ফলের রস ইত্যাদি খাওয়া উচিত।

সেদিন কোনও একটা পর্ব্ব ছিল। দুপুরে আমি খাইব না একথা কস্তুর-বাঈকে বলিয়া দিয়াছিলাম—একথা মনে আছে। কিন্তু তিনি আমাকে লোভে ফেলিলেন এবং আমিও লোভে পড়িয়া গেলাম। এই সময় আমি কোনও পশুরই দুগ্ধ খাইতাম না, সেইজন্য ঘি অথবা ঘোল ইত্যাদিও পরিত্যক্ত হইয়াছিল। সুতরাং ঘি-এর পরিবর্ত্তে তেল দিয়া আমার জন্য তিনি যবের এক প্রকার 'লপ্‌সি' করিতেন। ঐ দ্রব্য ও এক বাটি মুগ আমার জন্য রহিল—বলিয়া গেলেন। আমি স্বাদের বশীভূত হইয়া খাইলাম। খাওয়ার সময় ভাবিলাম যে, কস্তুর-বাঈকে খুসী

করার জন্য অল্প একটু খাইব, তাহাতে স্বাদ লওয়াও হইবে, শরীর রক্ষাও হইবে। শয়তান সুবিধা দেখিয়া ওৎ পাতিয়া বসিয়াছিল। খাইতে বসিয়া একটুমাত্র খাওয়ার বদলে পেট ভরিয়া খাইলাম। স্বাদ পুরাপুরি লওয়া হইল, সঙ্গে সঙ্গে যমরাজকে নিমন্ত্রণ পত্রও পাঠানো হইল। খাওয়ার পর একঘণ্টা না যাইতেই বিষম আমাশয় আরম্ভ হইল।

সেই রাত্রে নড়িয়াদ ফিরিয়া যাইতেই হইবে। সবরমতী ষ্টেশন পর্যন্ত হাঁটিয়া গেলাম, কিন্তু সওয়া মাইল রাস্তা চলিতে বড়ই কষ্ট হইল। আহ্‌মেদাবাদ ষ্টেশনে বল্লভভাই আসিয়া যোগ দিলেন। তিনি আমার যন্ত্রণা হইতেছে দেখিলেন। কিন্তু যন্ত্রণা যে কত অসহ্য তাহা তাঁহাকে কি অন্য সাথীকে জানিতে দিলাম না।

নড়িয়াদ পঁহুছিলাম। এখান হইতে অনাথ আশ্রম আধ মাইলের ভিতর হইলেও মনে হইল যেন দশ মাইল। খুব কষ্টে ঘরে উঠিলাম। যন্ত্রণা বাড়িতেই ছিল, ও ১৫মিনিট পর পর পায়খানার বেগ হইতেছিল। অবশেষে হার মানিলাম, অসহ্য যাতনার কথা জানাইয়া শয্যা লইলাম। আশ্রমে সাধারণ পায়খানা ছিল, তাহার পরিবর্ত্তে কমোড চাহিলাম। কমোড চাহিতে খুব লজ্জা হইল, কিন্তু আমি তখন নিরুপায়। ফুলচন্দ বাপুজী বিদ্যুৎবেগে গিয়া কোথা হইতে কমোড লইয়া আসিলেন। চিন্তাক্লিষ্ট সাথীরা আশে পাশে হইতে আসিয়া আমাকে ঘিরিয়া ফেলিলেন। আমার প্রতি তাঁহাদের প্রেমের সীমা ছিল না। কিন্তু তাঁহারা আমার ব্যথা ভাল করিতে পারিলেন না। আমার জেদেরও অন্ত ছিল না। আমি ডাক্তার ডাকিতে দিব না, ঔষধ খাইব না, ইচ্ছা করিয়া যে পাপ করিয়াছি তাহার ভোগ ভুগিব। সাথীরা নিরুপায় হইয়া শুষ্কমুখে সহ্য করিতে লাগিলেন। খাওয়া ত বন্ধই করিয়াছিলাম।

প্রথম দিন ফলের রসও খাই নাই, খাওয়ার রুচিও আদৌ ছিল না। যে শরীর পাথরের মত আজ পর্য্যন্ত মনে করিতাম, তাহা কাদার মত হইয়া গেল। শক্তি লোপ পাইল। ডাক্তার কানুগা আসিলেন; তিনি ঔষধ খাইতে মিনতি করিলেন; আমি অস্বীকার করিলাম। ইন্‌জেক্‌শন দিতে চাহিলেন, আমি অস্বীকার করিলাম। এই সময় ইন্‌জেক্‌শন্ সম্বন্ধে আমার অজ্ঞতা উপহাস করার যোগ্য ছিল। আমি মনে করিতাম যে, ইন্‌জেকশন মাত্রেই কোন জান্তব রস (serum)। পরে বুঝিয়াছিলাম, উহা নির্দ্দোষ গাছ-গাছড়ায় তৈরী ঔষধ। কিন্তু সময় চলিয়া গেলে এই জ্ঞান হইয়াছিল। পায়খানার বেগ হইতেছিল। অত্যন্ত অবসাদের জন্য প্রলাপের সহিত জ্বর আসিল। মিত্রেরা আরও ভীত হইয়া পড়িলেন। আরো ডাক্তার আনিলেন। কিন্তু যে রোগী ডাক্তারের কথা শুনিবে না, ডাক্তার তাহার কি করিবে?

শেঠ অম্বালাল ও তাঁহার ধর্ম্মপত্নী নড়িয়াদে আসিলেন। সাথীদিগের সহিত পরামর্শ করিয়া তিনি আমাকে অত্যন্ত যত্নের সহিত তাঁহার মির্জ্জাপুর বাংলায় লইয়া গেলেন। এই পীড়িতাবস্থায় যে নিশ্মল নিষ্কাম সেবা আমি পাইয়াছিলাম, তাহার অধিক সেবা কেহই পাইতে পারে না—একথা অবশ্যই বলিতে পারি। অল্প জ্বর রহিয়া গেল। শরীর ক্ষীণ হইয়া চলিল। এই পীড়া দীর্ঘদিন ভোগ করিতে হইবে, হয়ত বা আর শয্যাত্যাগ করা হইবে না, এই প্রকার মনে হইতে লাগিল। শেঠ অম্বালালের বাংলায় প্রেমে পরিবৃত হইয়াও আমার মন অশান্ত হইয়া উঠিল, আশ্রমে আমাকে লইয়া যাওয়ার জন্য আমি তাঁহাকে অনুরোধ করিতে লাগিলাম। আমার অত্যধিক আগ্রহ দেখিয়া তিনি আশ্রমে লইয়া গেলেন।

আশ্রমে যখন পীড়িত আছি, তখন বল্লভভাই সংবাদ আনিলেন যে, জার্ম্মাণীর সম্পূর্ণ হার হইয়াছে এবং আর রংরুট ভর্ত্তি করার কোনও আবশ্যক নাই—এই কথা কমিশনার বলিয়া পাঠাইয়াছেন। ইহাতে লোক ভর্ত্তি করার চিন্তা হইতে মুক্তি পাইলাম ও তাহাতে শান্তি আসিল।

এখন জল চিকিৎসা করিতেছিলাম, তাহাতে যন্ত্রণার কিছু লাঘব হইতেছিল, কিন্তু শরীর গঠন করা শক্ত ছিল। বৈদ্য ও ডাক্তার মিত্রেরা অনেক প্রকার পরামর্শ দিলেন, কিন্তু আমি কোনও ঔষধ খাইতে প্রস্তুত ছিলাম না। দুই তিনজন মিত্র, দুধে বাধা থাকিলে মাংসের সুরুয়া খাইতে বলিলেন, ও ঔষধরূপে মাংসাদি বস্তু যাহা ইচ্ছা খাওয়া যায় আয়ুর্ব্বেদ হইতে প্রমাণ করিয়া দিলেন। কেহ ডিম খাওয়ার উপদেশ দিলেন। কিন্তু তাঁহাদের কাহারও যুক্তি আমি স্বীকার করিতে পারিলাম না। আমার একই মাত্র জবাব ছিল।

খাদ্যাখাদ্যের নির্ণয় আমি কেবল শাস্ত্রের শ্লোকের উপর নির্ভর করিয়া করিতাম না। শাস্ত্রের সহিত সম্পর্কশূন্য হইয়া খাদ্যাখাদ্য-বিচার আমার জীবনের সহিত জড়িত ছিল। যাহাই হোক্ না কেন তাহাই খাইয়া অথবা ব্যবহার করিয়া আমার জীবিত থাকার এতটুকুও লোভ ছিল না। যে ধর্ম্মের প্রয়োগ আমি আমার স্ত্রীর, পুত্রের ও স্নেহাশ্রিতদের সম্বন্ধে করিয়াছি, নিজের বেলায় সে ধর্ম্ম কেমন করিয়া ত্যাগ করিব?

এই দীর্ঘদিনের পীড়ায়, এবং জীবনের এই প্রথম গুরুতর রোগে, আমি আমার ধর্ম্মমত নিরীক্ষণ করিতে ও উহার পরীক্ষা করিতে এক অভূতপূর্ব্ব সুযোগ পাইয়াছিলাম। এক রাত্রে আমি জীবন সম্বন্ধে একেবারে নিরাশ হইয়াছিলাম। আমার মনে হইল, মৃত্যু নিকটে আসিয়াছে। শ্রীমতী অনুসূয়া বেনকে সংবাদ পাঠাইলাম। তিনি

আসিলেন, বল্লভভাই আসিলেন, ডাক্তার কানুগা আসিলেন। ডাক্তার কানুগা নাড়ী দেখিয়া বলিলেন—"মৃত্যুর ত' কোনও চিহ্ন আমি দেখিতেছি না। নাড়ী ভালই আছে, আপনার কেবল দুর্ব্বলতার জন্য মানসিক আতঙ্ক উপস্থিত হইয়াছে।" কিন্তু আমার মন মানিল না। রাত্রি কাটিয়া গেল, সে রাত্রিতে আমি ঘুমাইতে পারি নাই।

প্রাতঃকাল হইল, কিন্তু মৃত্যু আসিল না। তবুও আমি জীবনের কোনও আশা করিতে পারিলাম না। মৃত্যু নিকটে জানিয়া, সাথীদিগের মুখে গীতাপাঠ শুনিয়া যতটুকু সময় আছি তাহা কাটাইতে লাগিলাম। কোন কাজ কর্ম্ম করার শক্তি ছিল না, এমন কি পড়ার শক্তিও ছিল না। কাহারও সহিত কথা বলিতেও ইচ্ছা হইত না। অল্প কথাতেই মাথার ক্লেশ হয়। এজন্য জীবনে কোনও আগ্রহ ছিল না। বাঁচিবার জন্যই বাঁচিতে আমার কখনও ভাল লাগিত না। কোনও কাজ না করিয়া, সাথীদের সেবা লইয়া, যে দেহ ক্রমশঃ ক্ষীণ হইতেছে, তাহাকে দীর্ঘ কাল স্থায়ী করিয়া রাখা বড়ই মর্ম্মন্তুদ বোধ হইত।

এই ভাবে যখন মৃত্যুর জন্য প্রতীক্ষা করিতেছিলাম, তখন ডাক্তার তল্‌ভল্‌কর এক অদ্ভুত মানুষ সঙ্গে লইয়া আসিলেন। তিনি ছিলেন মারাঠী, তাঁহার খ্যাতি কিছু ছিল না। তবে তাঁহার মাথায় আমারই মত গোলমাল আছে, ইহা আমি দেখিয়াই বুঝিয়াছিলাম। তিনি তাঁহার চিকিৎসা-বিদ্যা আমার উপর প্রয়োগ করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি গ্রান্ট মেডিক্যাল কলেজে ডাক্তারী পড়িতেন, কিন্তু ডিগ্রি লওয়ার পূর্ব্বেই কলেজ ছাড়েন। পরে জানিয়াছিলাম যে, তিনি ব্রাহ্ম সমাজের লোক, তাঁহার নাম কেলকর এবং তাঁহার স্বভাব ছিল স্বাধীন। তিনি বরফের চিকিৎসার ভারি প্রশংসা করিতেন। আমার পীড়ার কথা

শুনিয়া তিনি তাঁহার বরফ চিকিৎসা আমার উপর প্রয়োগ করিতে আসিয়াছিলেন। আমরা তাঁহাকে "বরফ ডাক্তার" নাম দিয়াছিলাম। নিজের চিকিৎসা সম্বন্ধে তাঁহার বিশ্বাস ছিল অগাধ। তাঁহার বিশ্বাস যে, খ্যাতনামা ডাক্তার অপেক্ষাও তিনি কতকগুলি বিষয় বিশেষ ভাবে জানিতেন। তাঁহার চিকিৎসার উপর তাঁহার নিজের যে বিশ্বাস তাহা আমাতে সঞ্চারিত করিতে পারেন নাই, ইহা তাঁহার ও আমার উভয়েরই দুঃখের বিষয়। কতকটা দূর পর্য্যন্ত তাঁহার চিকিৎসা-পদ্ধতির উপকারিতা আমি মানিতাম, এবং আমার বিশ্বাস যে, তিনি কতকগুলি সিদ্ধান্ত যথেষ্ট বিচার না করিয়াই পোষণ করিতেছেন। তাঁহার আবিষ্কারের মূল্য যাহাই হোক্, আমি তাঁহাকে আমার শরীরের উপর পরীক্ষা করিতে সম্মতি দিয়াছিলাম। বাহ্য-প্রয়োগই তাঁহার করণীয় ছিল বলিয়া আমার আপত্তি ছিল না। তাঁহার ব্যবস্থাও ছিল বরফ ও জলের ব্যবহার করা। তিনি আমার সমস্ত শরীরে বরফ ঘষিতে লাগিলেন। তিনি যেমন মনে করেন ততটা ফল তাঁহার চিকিৎসায় আমার না হইলেও, আমি প্রতিদিন যে মৃত্যুর পথ চাহিয়া অপেক্ষা করিতে থাকিতাম, তাহার পরিবর্ত্তে এখন জীবনের একটা আশা হইতে লাগিল। কতকটা উৎসাহ আসিল এবং মনের উৎসাহের ফলে শরীরেও উৎসাহ সঞ্চারিত হইল। কিছু বেশী করিয়া খাইতে পারিতাম। ৫।১০ মিনিট করিয়া রোজ বেড়াইতে পারিতাম। তিনি বলিলেন "যদি আপনি কাঁচা ডিম খান, তবে আপনার এখন যে সুস্থতা দেখা দিয়াছে তাহা অনেক বাড়িবে। ডিম দুধেরই মত নির্দ্দোষ পদার্থ, উহা মাংসের মত নয়। প্রত্যেক ডিমেই মুরগী হয় এমন নহে। যে সকল ডিম হইতে মুরগী হইতে পারে না, সেই সকল নির্বীজ ডিম ব্যবহার করা যায়।"

আমি নির্বীজ ডিম খাইতে মোটেই প্রস্তুত ছিলাম না। যাহা হউক, আমার শরীরের কিছু উন্নতি হইল। আশেপাশের কার্য্যে কিছু কিছু করিয়া আমার মন আকৃষ্ট হইতে লাগিল।

২৯

রাউলাট অ্যাক্ট ও আমার ধর্মসঙ্কট

মিত্রেরা বলিলেন মাথেরান্ * গেলে শরীর শীঘ্র সারিয়া উঠিবে। তাঁহাদের কথায় মাথেরান্ গেলাম। কিন্তু সেখানকার জল কোষ্ঠ-কাঠিন্য করে বলিয়া আমার মত রোগীর অসুবিধা হইল। আমাশয় হওয়ায় মলদ্বার নরম হইয়া গিয়াছিল, এবং উহা (fissures) স্থানে স্থানে ফাটিয়া যাওয়ায় মলত্যাগ কালে খুব যন্ত্রণা হইত। এই জন্য কিছু খাইতেই ভয় হইত। এক সপ্তাহের মধ্যেই মাথেরান্ হইতে ফিরিতে হইল। শঙ্করলাল এই সময় আমার স্বাস্থ্য রক্ষার ভার নিজের উপর লইয়াছিল। সে ডাক্তার দালালের পরামর্শ লওয়ার জন্য আগ্রহ করিতে লাগিল। ডাক্তার দালাল আসিলেন। তাঁহার দ্রুত রোগ-নির্ণয় শক্তি দেখিয়া আমি মুগ্ধ হইলাম। তিনি বলিলেন—

"আপনি দুধ না খাইলে আপনার শরীর ভাল করিতে পারিব না। শরীর ভাল করার জন্য আপনার দুধ খাওয়া দরকার ও লৌহ ও সেঁকো (iron and arsenic) দ্বারা প্রস্তুত ঔষধের ইন্‌জেক্‌শন্ করা দরকার। যদি এইরূপ করেন, তবে আপনার শরীর সারাইয়া দেওয়ার গ্যারান্টি আমি দিতে পারি।"

আমি বলিলাম—"ইন্‌জেক্‌শন্ দিন, কিন্তু দুধ ত খাইতে পারিব না।

"দুধের সম্বন্ধে আপনি কি প্রকার প্রতিজ্ঞা করিয়াছেন?"

* বোম্বাইয়ের নিকটে এক স্বাস্থ্যকর স্থান।

"গরু মহিষের উপর 'ফুকা' করা হয় জানিয়া, দুধ খাওয়ার প্রতি আমার মনে ধিক্কার আসিয়াছিল। আর দুধ যে মানুষের খাওয়ার জিনিষ নয় ইহা, আমি বরাবরই মনে করিতাম, সেই জন্যই দুধ ত্যাগ করিয়াছি।"

কস্তুর বাঈ খাটিয়ার পাশে দাঁড়াইয়া ছিলেন। তিনি বলিয়া উঠিলেন—"ছাগলের দুধ খাওয়া যায়।"

ডাক্তার বলিলেন—"ছাগলের দুধ খাইলেও আমার কাজ চলিয়া যাইবে।"

আমি সত্যভ্রষ্ট হইলাম। সত্যাগ্রহের প্রতি মোহ-বশে আমার বাঁচিয়া থাকার জন্য লোভ হইয়াছিল। আমি প্রতিজ্ঞার অক্ষরমাত্র পালন করিয়া আত্মঘাতী হইলাম। দুধ সম্বন্ধে প্রতিজ্ঞা করার সময় যদিও আমার মনে গরু মহিষের দুধের কথাই আসিয়াছিল, তবুও আমার প্রতিজ্ঞা দুধমাত্রই না খাওয়ার বিষয়েই ছিল। সেইজন্য যে পর্য্যন্ত আমি পশুর দুধ মানুষের অখাদ্য বলিয়া মনে করিব, সে পর্য্যন্ত আমার দুধ খাওয়ার অধিকার নাই,—একথা জানিয়াও আমি ছাগলের দুধ খাইতে স্বীকার করিলাম। সত্যাগ্রহ-যুদ্ধ করার জন্য বাঁচিয়া থাকার ইচ্ছায়, সত্যের পূজারী সত্যকেই ম্লান করিয়া ফেলিল।

এই কার্য্যের জন্য আমার অন্তর্দাহ এখনো রহিয়া গিয়াছে। ছাগলের দুধ ত্যাগ করার কথা আমি সর্ব্বদাই চিন্তা করিয়া থাকি, ছাগলের দুধ খাইতে প্রতিদিনই দুঃখ হয়, কিন্তু সেবা করার একটা সূক্ষ্ম মোহ আমাকে পাইয়া বসিয়াছে। আহার সম্বন্ধে পরীক্ষা করা, অহিংসা-পালনের দিক দিয়াই আমি কর্ত্তব্য বলিয়া জানিয়াছি। উহাতেই আমার আনন্দ হয়, উহাই আমার মনের ক্লান্তি দূর করে,

মন সতেজ করে। কিন্তু ছাগলের দুধ খাওয়া, আহার্য্য-পরিবর্ত্তন পরীক্ষা বা অহিংসার দৃষ্টিতে 'আমাকে পীড়া দেয় না, সত্য পালনের দিক হইতে এই অপরাধ আমাকে শূলের ন্যায় বিদ্ধ করে। আমার মধ্যে অহিংসার পরিচয় আমি পাইয়াছি, কিন্তু তাহা অপেক্ষাও সত্যের পরিচয় অধিকতর পাইয়াছি বলিয়া মনে করি। যদি আমি সত্য ত্যাগ করি, তবে অহিংসার প্রহেলিকার আবরণ আমি কখনও মুক্ত করিয়া দেখিতে পারিব না। সত্যের পালন মানে, যে ব্রত গ্রহণ করা হইয়াছে সে ব্রতের দেহ ও আত্মা, উভয়েরই পালন, ব্রতের শব্দার্থ ও ভাবার্থ পালন। আমি ঐ বিষয়ে ব্রতের আত্মাকে, ব্রতের ভাবার্থকে হত্যা করিয়াছি এবং সেই জন্য প্রতিদিন উহা আমাকে বিঁধিতেছে। এ কথা পরিষ্কার জানিলেও এই ব্রত সম্বন্ধে আমার কর্ত্তব্য কি তাহা আমি পরিষ্কার বুঝিতেছি না, অথবা অন্য কথায় বলিতে গেলে ব্রত-পালন করার সাহস আমার নাই। এই ব্রতের পালন-বিষয়ে সংশয়ও যাহা, সাহসের অভাবও তাহাই,—উভয়েই একই বস্তু, কেননা সংশয়ের মূলে শ্রদ্ধার অভাব রহিয়াছে। হে ঈশ্বর, তুমি আমাকে শ্রদ্ধা দাও!

ছাগলের দুধ খাওয়ার কিছুদিন পরে, আমার গুহ্যদ্বারে যেখানে চিরিয়া গিয়াছিল তাহার উপর অস্ত্রোপচার করাতে ভাল হই।

তখনও রোগ-শয্যা ত্যাগ করি নাই, শুইয়াই সংবাদপত্রাদি পড়িতাম, এমন সময় রাউলাট কমিটির রিপোর্ট আমার হাতে আসিল। উহাতে যাহা করিতে বলা হইয়াছে তাহা দেখিয়া আমি চমকিয়া উঠিলাম। ভাই উমর ও শঙ্করলাল আসিয়া তৎক্ষণাৎ উহার বিরুদ্ধে কাজ আরম্ভ করিয়া দেওয়ার অনুমতি চাহিলেন। মাসখানেকের মধ্যেই আমি আহ্মেদাবাদে গেলাম। সেখানে বল্লভভাই প্রায় প্রতিদিনই আমাকে

দেখিতে আসিতেন। তাঁহার নিকট এই কথা তুলিলাম এবং এ সম্বন্ধে কিছু করা চাই—বলিলাম। "কি করা যায়?" এই প্রশ্নের জবাবে আমি বলিলাম, যে,—"অল্প লোকও যদি এই সময় দৃঢ়-প্রতিজ্ঞ হইয়া আসে, আর এদিকে যদি কমিটির মন্তব্য অনুযায়ী আইন পাশ হয়, তবে আমরা সত্যাগ্রহ আরম্ভ করিতে পারি। যদি আমি রোগে শয্যাশায়ী না থাকিতাম তবে আমি একাই ঝাঁপাইয়া পড়িতাম এবং আমার পিছনে অপরে আসিবে এই আশা রাখিতাম। কিন্তু শরীরের এই অবস্থায় আমার কাজে নামার শক্তি আদৌ নাই।"

এই প্রকার কথাবার্ত্তার ফলে আমার সংস্পর্শে আছে এমনি কর্ম্মীদের কয়েকজনকে লইয়া ছোট একটি সভা আহ্বান করা স্থির হয়। রাউলাট যে সকল সাক্ষ্য লইয়াছিলেন, তাহা হইতে ঐ কমিটির গৃহীত মন্তব্য কিছুতেই লওয়া যায় না, একথা আমার স্পষ্ট মনে হইল। ইহাও আমার পরিষ্কার বোধ হইল যে, কোনও আত্মসম্মান-সম্পন্ন প্রজা এই আইন মানিয়া লইতে পারে না।

তারপর সভা হইল। উহাতে জনকুড়ি লোকও নিমন্ত্রণ করা হয় নাই। আমার স্মরণ আছে যাঁহারা আসিয়াছিলেন, তাঁহাদের মধ্যে বল্লভভাইকে বাদ দিলে, শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু, মিঃ হর্ণিম্যান, উমর সোবানী, শ্রীশঙ্করলাল ব্যাঙ্কার, শ্রীমতী অনসূয়া বেন প্রভৃতি ছিলেন।

প্রতিজ্ঞা পত্র গঠন করা হইল এবং যাঁহারা উপস্থিত ছিলেন তাঁহারা সকলেই স্বাক্ষর করিলেন। এই সময় আমার নিজের কাগজ ছিল না। যেমন মাঝে মাঝে সংবাদ পত্রে লিখিতাম এখনো তাহাই করিতে লাগিলাম। শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার খুব আন্দোলন আরম্ভ করিলেন। এই কাজ করিতে গিয়া শঙ্করলালের সংগঠন শক্তির পরিচয় পাইলাম।

প্রচলিত কোনও সংস্থা, সত্যাগ্রহের ন্যায় নূতন অস্ত্র গ্রহণ করিবে এ সম্ভাবনা ছিল না। সেই জন্য সত্যাগ্রহ-সভার স্থাপনা হইল। তাহার সভ্য প্রধানতঃ বোম্বাই হইতে হইল। উহার প্রধান কার্যালয় বোম্বাইতেই করা হইল। প্রতিজ্ঞাপত্রে খুব স্বাক্ষর হইতে লাগিল। খেড়া-সত্যাগ্রহে যেমন বুলেটিন বাহির করা হইয়াছিল এবং স্থানে স্থানে সভা করা হইয়াছিল, এখনও তেমনি করা আরম্ভ হইয়া গেল।

এই সভার আমি সভাপতি ছিলাম। আমি দেখিলাম যে, শিক্ষিত সম্প্রদায় এবং আমার মধ্যে বেশী মিল হইতে পারে না। সভায় গুজরাটী ব্যবহারে আমার আগ্রহ, ও আমার অন্য কতকগুলি বিশেষত্বে তাঁহাদের অসুবিধা হইত। কিন্তু আমাকে একথা স্বীকার করিতে হইবে যে, তাঁহারা উদারতার সহিত আমাকে সহ্য করিয়া লইয়াছিলেন। কিন্তু আমি আরম্ভেই দেখিলাম যে, এই সভা দীর্ঘস্থায়ী হইতে পারে না। ইতিমধ্যেই সত্য ও অহিংসার উপর আমি যে জোর দিতেছিলাম, তাহা কতক লোকের ভাল লাগিতেছিল না। তাহা হইলেও প্রথম দিকটায় এই নূতন কাজ খুব জোর চলিতে লাগিল।

৩০

অদ্ভুত দৃশ্য

রাউলাট কমিটির বিরুদ্ধে যেমন এক দিক দিয়া আন্দোলন বাড়িতে লাগিল, অপর দিক দিয়া সরকারেরও ঐ কমিটির মন্তব্য অনুযায়ী আইন পাশ করার জেদ বাড়িতে লাগিল। রাউলাট বিল প্রচারিত হইল। আমি একবার মাত্র কাউন্সিল-সভায় গিয়াছিলাম; উহা রাউলাট বিলের আলোচনা শোনার জন্য। শাস্ত্রীজী তাঁহার আবেগময়ী বক্তৃতায় সরকারকে সাবধান করিলেন। শাস্ত্রী মহাশয়ের বাক্য-প্রবাহ যখন চলিতেছিল, তখন ভাইসরয় একাগ্র হইয়া তাঁহার দিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়াছিলেন। আমার মনে হইল, এই বক্তৃতা তাঁহার উপর প্রভাব বিস্তার করিবে; শাস্ত্রীজীর বক্তৃতা বড়ই প্রাণস্পর্শী হইয়াছিল।

ঘুমন্ত লোককেই জাগানো যায়, যে জাগিয়া আছে তাহার কানের কাছে ঢোল পিটাইলেও সে শুনিতে পায় না। কাউন্সিল সভায় বিল আলোচনার একটা প্রহসন করা মাত্র আবশ্যক ছিল, সরকার তাহাই করিলেন। সরকারের যাহা করার তাহা পূর্ব্বেই স্থির করিয়া রাখিয়াছিলেন, সেই জন্য শাস্ত্রীর সাবধান-বাণী নিরর্থক ছিল।

এই অবস্থায় আমার ক্ষুদ্র স্বর সরকার কি করিয়া শুনিবেন? আমি ভাইসরয়ের সহিত দেখা করিয়া খুব অনুনয় করিলাম, ব্যক্তিগত পত্র লিখিলাম ও সংবাদপত্রে প্রকাশ্য ভাবে পত্র দিলাম। সত্যাগ্রহ ব্যতীত আমার কাছে দ্বিতীয় অস্ত্র নাই, এ কথা তাঁহাকে জানাইলাম। কিন্তু সমস্তই ব্যর্থ হইল।

তখনও বিল গেজেট করিয়া আইন করা হয় নাই। আমার শরীর দুর্ব্বল থাকিলেও আমি দীর্ঘকাল ভ্রমণ করার ঝুঁকি লইলাম। আমার উচ্চস্বরে বলার শক্তি ছিল না। দাঁড়াইয়া দাঁড়াইয়া বক্তৃতা করিতে পারিতাম না,—আজও সে শক্তি নাই। দাঁড়াইয়া কিছুক্ষণ বলিতেই শরীর কাঁপিতে আরম্ভ হয়, ও বুকে পিঠে খিল ধরিয়া আসে। কিন্তু মাদ্রাজ হইতে যখন নিমন্ত্রণ আসিল, তখন যাওয়াই চাই বলিয়া মনে হইল। দক্ষিণ প্রদেশকে তখন আমার বাড়ী বলিয়া মনে হইত। দক্ষিণ আফ্রিকার সম্বন্ধ বশতঃ, তামিল, তেলেগুদের উপর আমার একটা দাবী আছে বলিয়া আমার মনে হইত। আর সেরূপ মনে করিয়া যে ভুল করিয়াছি একথা আজও বুঝিতে পারি নাই। নিমন্ত্রণ পত্র কস্তুরীরঙ্গ আয়েঙ্গারের স্বাক্ষরে আসিয়াছিল। মাদ্রাজ গিয়া জানিলাম যে, এই নিমন্ত্রণের মূলে আছেন রাজাগোপালাচারী। ইহাই আমার রাজা-গোপালাচারীর সহিত প্রথম পরিচয় বলা যায়। এই সময়েই আমি তাঁহার পরিচয় পাইলাম।

জনসাধারণের কাজ বেশী করার জন্য ও শ্রীকস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গার প্রভৃতির নিমন্ত্রণে তিনি সালেম ছাড়িয়া মাদ্রাজে ওকালতী করিতে আসিয়াছিলেন। আমি একদিন পরে টের পাইলাম যে, তাঁহারই বাড়ীতে অতিথি হইয়াছি। বাংলাখানা কস্তুরী রঙ্গ আয়েঙ্গারের ছিল বলিয়া, আমি জানিতাম—আমি তাঁহারই অতিথি। মহাদেব দেশাই আমার ভুল ধরিয়া দিলেন। রাজাগোপালাচারী দূরে দূরে থাকিতেন, কিন্তু মহাদেব তাঁহাকে ভাল রকম চিনিয়াছিলেন। মহাদেব আমাকে একদিন তাঁহার সম্বন্ধে সচেতন করিয়া দিলেন, বলিলেন—আপনার রাজাগোপালাচারীকে ভাল করিয়া চিনিয়া লওয়া দরকার।

আমি পরিচয় করিলাম। তাঁহার সহিত প্রতিদিন যুদ্ধ দেওয়ার কথা লইয়া আলোচনা হইত। সভা করা ছাড়া আর কি করা যায়, তাহা আমি বুঝিতাম না। রাউলাট বিল যদি আইন করা হয়, তবে তাহার সবিনয় অমান্য কি করিয়া করা যায়? যাহাকে সরকার অবকাশ দিবেন, সেই সে আইন অমান্য করিতে পারিবে। অন্য কোনও আইন অমান্য করা যায় কিনা—কতদূর পর্য্যন্ত তাহার সীমা টানা যায়—এই ধরণের আলোচনা হইত।

শ্রীকুস্তরী রঙ্গ আয়েঙ্গার নেতাদিগকে একটি ছোট সভায় ডাকিলেন। সে সভায় খুব আলোচনা হইল। তাহাতে শ্রীবিজয়রাঘবাচারী খুব উৎসাহের সহিত যোগ দিলেন। তিনি প্রস্তাব করিলেন যে, সত্যাগ্রহ শাস্ত্রের সূক্ষ্মভাবে আলোচনা লিখিয়া ফেলা হউক; এ কাজ আমার সাধ্যাতীত এ কথা আমি বলিলাম।

এই রকম যখন এই বিষয়ে বিশেষ ভাবে আলোচনা চলিতেছিল, তখন সংবাদ আসিল যে, ঐ বিল আইন বলিয়া গেজেটে ঘোষিত হইয়াছে। এই সংবাদের বিষয় ভাবিতে ভাবিতে রাত্রে আমি ঘুমাইলাম। প্রাতঃকালের পূর্ব্বেই ঘুম ভাঙ্গিয়া গেল। অর্দ্ধেক ঘুমের ঘোরে, যেন স্বপ্নের বশে, এই সম্বন্ধে কর্ত্তব্যের ধারণা আমার চিন্তার মধ্যে উদয় হইল। আমি রাজাগোপালাচারীকে ডাকিয়া বলিলাম—

"আমাদের কর্ত্তব্য সম্বন্ধে ধারণা গত রাত্রে স্বপ্নাবস্থায় আমি পাইয়াছি। এই আইনের প্রত্যুত্তর স্বরূপ, আমরা সমস্ত দেশ জুড়িয়া হরতাল করার প্রস্তাব দিব। সত্যাগ্রহ আত্মশুদ্ধির যুদ্ধ, ইহা ধর্ম্ম-যুদ্ধ। ধর্ম্ম-কার্য্য শুদ্ধি দ্বারাই আরম্ভ করা উচিত বোধ হয়। ঐ দিন সকলে উপবাস করিবে ও নিজেদের কাজ কর্ম্ম বন্ধ রাখিবে। মুসলমানদের রোজায়

উপর উপবাস দরকার নাই। এই উপবাস ২৪ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পালন করার অনুরোধ জানানো হইবে। এই কার্য্যে সকল প্রদেশ যোগ দিবে কিনা, তাহা বলিতে পারি না। আমার আশা হয় বোম্বাই, মাদ্রাজ, বিহার ও সিন্ধু প্রদেশ যোগ দিবে। এই কয়টা জায়গাতেও যদি ঠিক মত হরতাল হয়, তাহা হইলেও সন্তোষজনক মনে করা যাইবে।"

এই প্রস্তাব রাজাগোপালাচারীর খুব ভাল লাগিল। অন্যান্য মিত্র-দিগকে জানানো হইল, সকলেরই ভাল লাগিল। একটা ছোট বিজ্ঞাপনের খস্ড়া আমি করিয়া ফেলিলাম। প্রথমে ১৯১৯ সালের ৩০শে মার্চ্চ দিন স্থির করা হইয়াছিল, পরে ৬ই এপ্রিল স্থির হয়। এই হরতালের সংবাদ খুব অল্প দিন পূর্ব্বে লোকে পাইল। কার্য্য শীঘ্র আরম্ভ করার আবশ্যকতা ছিল বলিয়া, তৈরী হওয়ার জন্য দীর্ঘ সময় দেওয়া যায় নাই।

কে জানে কেমন করিয়া সব ঘটিয়া গেল। সারা ভারতবর্ষে সহরে, গ্রামে, হরতাল হইল। ইহা এক আশ্চর্য্য দৃশ্য!

৩১

স্মরণীয় সপ্তাহ—১

দক্ষিণ প্রদেশে কিছুদিন ভ্রমণ করিয়া, মনে পড়ে ৪ঠা এপ্রিল বোম্বাই পঁহুছিলাম। ৬ই তারিখ পালনের দিন বোম্বাই থাকার জন্য আমাকে শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার তার দিয়াছিলেন।

ইহার পূর্ব্বেই দিল্লীতে ৩০শে মার্চ্চ হরতাল হইয়া গিয়াছে। ৺শ্রদ্ধানন্দ স্বামী ও স্বর্গগত হাকিম আজমল খাঁর আদেশই দিল্লীতে সর্ব্বোপরি ছিল। ৬ই এপ্রিল হরতালের তারিখ বদলাইয়া দেওয়া হইয়াছিল, সে সংবাদ দিল্লীতে বিলম্বে পঁহুছে। দিল্লীতে সেদিন যেমন হরতাল হয়, পূর্ব্বে আর কখনো তেমন হয় নাই। হিন্দু ও মুসলমান উভয়েই মিলিয়া যেন এক হইয়া গিয়াছিল। শ্রদ্ধানন্দজী নিমন্ত্রিত হইয়া আসিয়া জুম্মা মসজিদে বক্তৃতা দেন। এ সব সরকারের সহ্য করার শক্তি ছিল না। প্রসেশন, রেল ষ্টেশনে যাওয়ার পথে পুলিশ আটকাইয়া দিল। পুলিশ গুলি চালাইল, অনেক জখম হইল, কেহ কেহ খুনও হইল। দিল্লীতে দমননীতি আরম্ভ হইল। শ্রদ্ধানন্দজী আমাকে দিল্লী আসিতে লিখিলেন। আমি ৬ই তারিখ পার হইলেই দিল্লী যাইব বলিয়া উত্তর দিলাম।

যেমন দিল্লীতে, লাহোরে অমৃতসরেও তেমনি কাণ্ড হইয়াছিল। অমৃতসর হইতে ডাক্তার সত্যপাল ও কীচলু আমাকে টেলিগ্রাফ করিয়া সেখানে যাওয়ার জন্য পীড়াপীড়ি করিলেন। এই দুই ভাইকে আমি তখন পর্য্যন্ত মোটেই জানিতাম না। দিল্লী হইতে তাঁহাদের ওখানে নিশ্চয় যাইব বলিয়া জানাইলাম।

৬ই তারিখ প্রাতঃকালে বোম্বাইয়ে হাজার হাজার লোক চৌপাটিতে সমুদ্র স্নানে গিয়াছিল। সেখান হইতে ঠাকুর দ্বারে যাওয়ার জন্য শোভাযাত্রা হইয়াছিল। ইহাতে স্ত্রীলোক ও বালকেরাও যোগ দিয়াছিল। শোভাযাত্রায় অনেক মুসলমানও যোগ দিয়াছিলেন। কয়েকজন মুসলমান ভাই আমাদিগকে এই শোভাযাত্রা হইতে এক মসজিদে লইয়া গেলেন। সেখানে শ্রীমতী সরোজিনী দেবী ও আমাকে বক্তৃতা করিতে হইল। এই স্থানে শ্রীবিঠ্ঠলদাস জেরাজানী, স্বদেশী ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের প্রতিজ্ঞা লওয়ায় প্রস্তাব করিলেন। তাড়াতাড়ি করিয়া এই ধরণের প্রস্তাব লইতে আমি নিষেধ করি। যতটা লোকে করিয়াছে তাহাতেই সন্তুষ্ট হইতে উপদেশ দেই। প্রতিজ্ঞা যদি লওয়া হয়, তবে আর তাহা ভঙ্গ করিতে নাই। স্বদেশীর অর্থ বুঝিতে পারা চাই, হিন্দু-মুসলমান ঐক্যের দায়িত্ব কতদূর, সে বিষয়ে খেয়াল করা দরকার ইত্যাদি বলি। পরে প্রস্তাব দেই যে, যদি প্রতিজ্ঞা লওয়ার ইচ্ছা হয়, তবে সকলে যেন পরদিন সকালে চৌপাটির ময়দানে উপস্থিত হন।

বোম্বাইয়ে হরতাল সম্পূর্ণ ভাবে পালিত হইল। আইন অমান্য করার জন্য সমস্ত ব্যবস্থা এখানে হইয়াছিল। যাহা লইয়া আইন অমান্য করা যায়, এমন দুই তিনটা বিষয় ছিল। যে আইন তুলিয়া দেওয়ার যোগ্য এবং যাহা সহজেই অমান্য করা যাইতে পারে, এমন সকল আইন বাছিয়া লওয়া স্থির হইয়াছিল। লবণের উপর আইন খুব অসন্তোষ-জনক ছিল। এই লবণ শুল্ক উঠাইয়া দেওয়ার জন্য চেষ্টা চলিতেছিল। সকলেই বিনা লাইসেন্সে নিজ নিজ ঘরে লবণ প্রস্তুত করিয়া আইন অমান্য করিবে, এই প্রকার একটি প্রস্তাব আমি উপস্থিত করিলাম। আর একটা প্রস্তাব ছিল—সরকার যে সকল প্রসিদ্ধ পুস্তক বন্ধ

করিয়া দিয়াছেন সেই সকল পুস্তক ছাপানো ও বিক্রয় করার। আমারই এই ধরণের দুইখানা বহি ছিল—"হিন্দ্ স্বরাজ্য" ও "সর্ব্বোদয়"। এই পুস্তক ছাপাইয়া, বেচিলে সকলে সহজেই আইন অমান্য করিতে পারে। এই পুস্তক ছাপাইয়া উপবাস অন্তে যে বৃহৎ সভা হইল তাহাতে বিক্রয় করার ব্যবস্থা হইয়াছিল।

সন্ধ্যাবেলার অনেক স্বেচ্ছাসেবক এই পুস্তক বিক্রয় করিতে বাহির হইলেন। এক মোটরে আমি বাহির হইলাম, আর এক মোটরে শ্রীমতী সরোজিনী নাইডু বাহির হইলেন। যতগুলি ছাপা হইয়াছিল তাহা সব বিক্রয় হইয়া গেল। বিক্রয় লব্ধ টাকা আইন অমান্যের কাজে ব্যয় হইবে স্থির ছিল। একখানা পুস্তকের মূল্য চারি আনা। কিন্তু আমার হাতে কি সরোজিনী নাইডুর হাতে কদাচিৎ কেহ চার আনা দিতেছিল। অনেকে পকেট উল্টাইয়া যাহা ছিল তাহাই বহির মূল্য বলিয়া দিতেছিল, কতকগুলি দশ টাকার ও পাঁচ টাকার নোটও আসিতে লাগিল। পঞ্চাশ টাকার নোট দিয়াও একখানা বহি কেনা হইয়াছিল বলিয়া মনে আছে। যে কিনিতেছে তাহাকে জেলে যাইতে হইতে পারে একথা বুঝাইয়া দেওয়া হইতেছিল, কিন্তু সে সময়ের জন্য লোকে জেলের ভয় ভুলিয়া গিয়াছিল।

৭ই তারিখে জানা গেল যে, যে বহি বিক্রয় করা হইয়াছে, সে বই-গুলি সরকারের দৃষ্টিতে নিষিদ্ধ পুস্তকের ভিতরে পড়ে না। যাহা বিক্রয় হইতেছিল তাহা দ্বিতীয় মুদ্রণ ছিল, আর সেই জন্যই নাকি উহা নিষিদ্ধ পুস্তক বলিয়া গণ্য নহে। সরকারের তরফ হইতে বলা হইল যে, ঐ বহি ছাপাইয়া, বেচিয়া ও কিনিয়া আইন অমান্য করা হয় নাই। এই সংবাদে লোকে নিরাশ হইল।

ঐ দিন সকালে চৌপাটীর উপর স্বদেশী ব্রত ও হিন্দু-মুসলমান ঐক্য ব্রত লওয়ার জন্য লোক জমায়েৎ হইয়াছিল। বিঠ্ঠলদাস জেরাজানীর এই প্রথম অনুভব হইল যে, যাহা সাদা দেখায় তাহাই দুধ নহে। লোক অল্পই আসিয়াছিল। কয়েকজন বহিন আসিয়াছিলেন আমার মনে আছে। পুরুষের সংখ্যা খুবই কম ছিল। আমি প্রতিজ্ঞার খসড়া আনিয়াছিলাম। উহার অর্থ খুব ভাল করিয়া বুঝাইয়া তাঁহাদিগকে ব্রত গ্রহণ করিতে দিয়াছিলাম। অল্পলোক আসিয়াছিল দেখিয়া আশ্চর্য্য হই নাই এবং আমার দুঃখও হয় নাই। উত্তেজনার কার্য্যে ও ধীরে সুস্থে গঠনাত্মক কার্য্যের মধ্যে পার্থক্য এবং লোকের উত্তেজনার জন্য আগ্রহ এবং গঠনাত্মক কার্য্যের প্রতি বিরাগ, আমি সেই হইতে দেখিয়া আসিতেছি। এই বিষয়ে ভিন্ন এক অধ্যায়ই লিখিতে হইবে।

৭ই রাত্রে দিল্লী ও অমৃতসর যাওয়ার জন্য রওনা হইলাম। ৮ই তারিখ মথুরা পঁহুছিতে, আমাকে গ্রেপ্তার করা হইবে এ সংবাদ কে একজন দিয়া গেল। মথুরার পরের ষ্টেশনে গাড়ী থামিতেই প্রফেসর গিদোয়ানীর সহিত দেখা হইল। আমাকে গ্রেপ্তার করা হইবে সে সংবাদ তিনি বিশ্বস্ত সূত্রে পাইয়াছেন বলিলেন; তিনি আবশ্যক হইলে আমাকে সাহায্য করিতে ইচ্ছা প্রকাশ করিলেন। আমি উপকৃত হইলাম এবং আবশ্যক হইলে সেবা লইতে ভুলিব না জানাইলাম।

পলওয়ল্ ষ্টেশনে পঁহুছিবার পূর্ব্বেই পুলিশ আমার হাতে হুকুম পত্র দিল। "তুমি পাঞ্জাবে প্রবেশ করিলে শান্তি ভঙ্গ হওয়ার ভয় আছে, সেই জন্য পাঞ্জাবের সীমানায় তুমি প্রবেশ করিতে পারিবে না"—হুকুম এই ধরণের ছিল। হুকুম দিয়া পুলিশ আমাকে গাড়ী হইতে নামিয়া যাইতে বলিল। আমি নামিতে অস্বীকার করিয়া কহিলাম—"আমি

অশান্তি বাড়াইতে যাইতেছি না, নিমন্ত্রিত হইয়া অশান্তি কমাইতে যাইতেছি। এই হুকুম মানিতে পারিতেছি না বলিয়া আমি দুঃখ প্রকাশ করিতেছি।”

পলওয়ল্ আসিলাম। মহাদেব আমার সঙ্গে ছিল। তাঁহাকে দিল্লী গিয়া শ্রদ্ধানন্দজীকে সংবাদ দিতে ও লোক শান্ত রাখিতে বলিয়া দিলাম—বলিয়া দিলাম আমি কেন হুকুম অমান্য করিয়া যে সাজা হয় তাহা লওয়ার জন্য প্রস্তুত হইয়াছি। সাজা পাওয়া সত্ত্বেও লোকে যদি শান্ত থাকে, তাহা হইলেই আমাদের জয় হইবে—একথাও বুঝাইতে মহাদেবকে বলিয়া দিলাম।

পলওয়ল্ ষ্টেশনে আমাকে নামাইয়া লইয়া পুলিশের হেপাজতে রাখিল। দিল্লী হইতে একখানা ট্রেণ আসিতেছিল, উহার এক তৃতীয় শ্রেণীর কামরায় আমাকে বসাইল, সঙ্গেই পুলিশের দলও বসিল। মথুরা পঁহুছিতে আমাকে পুলিশ ব্যারাকে লইয়া গেল। আমাকে কি করিবে, কোথায় লইয়া যাইবে, সে কথা কোনও কর্ম্মচারী বলিতে পারিল না। সকাল ৪টায় আমাকে ঘুম হইতে তুলিয়া বোম্বাই-গামী এক মাল-গাড়ীতে লইয়া বসাইল। দুপুর বেলায় মধুপুরে নামাইল। সেইখানে বোম্বাইয়ের মেল-ট্রেণে লাহোর হইতে ইনস্পেক্টর বোরিং আসিলেন। তিনি আসিয়া আমার ভার লইলেন। এইবার আমাকে প্রথম শ্রেণীতে চড়ানো হইল। সাহেব সঙ্গে বসিলেন। এ পর্য্যন্ত আমি সাধারণ কয়েদী ছিলাম, এখন “ভদ্রলোক কয়েদী” হইলাম। সাহেব, সার মাইকেল ও’ডায়ারের প্রশংসা আরম্ভ করিয়া দিলেন। আমার বিরুদ্ধে তাঁহার কোনও অভিযোগ ছিল না, কিন্তু আমার পাঞ্জাবে যাওয়াতে অশান্তির খুব ভয় আছে ইত্যাদি বলিয়া আমাকে ফিরিয়া যাইতে ও

পাঞ্জাবে প্রবেশ না করিতে অনুনয় করিতে লাগিলেন। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আমি হুকুম মানিতে পারিব না এবং আমি স্বেচ্ছায় ফিরিয়া যাইব না। তখন নিরুপায় হইয়া তিনি আইন-অনুযায়ী কাজ করিবেন বলিলেন। আমি জিজ্ঞাসা করিলাম—"কিন্তু আমাকে লইয়া কি করিতে চাও, বলিতে পার?" তিনি বলিলেন—"সে আমি জানি না, আমার অন্য আদেশ পাওয়া চাই, এখন ত আপনাকে বোম্বাই লইয়া যাইতেছি।"

সুরাটে আসিলে অন্য এক কর্ম্মচারী আমার ভার লইলেন। রাস্তায় আমাকে বলিলেন—"আপনি খালাস হইয়াছেন। আপনার জন্য 'মরীন লাইন্সে' ট্রেণ থামাইব, সেখানে নামিলে ভাল হয়, কোলাবা ষ্টেশনে খুব ভীড় হওয়ার সম্ভব আছে।" আমি সম্মত আছি বলিলাম। তিনি সন্তুষ্ট হইলেন ও আমাকে ধন্যবাদ দিলেন। আমি "মরীন লাইন্সে" নামিলাম। একজন বন্ধুর গাড়ী সেই সময় সেখান দিয়া যাইতেছিল, তিনি সেই গাড়ীতে আমাকে তুলিয়া লইয়া রেবাশঙ্কর ঝাভেরীর বাড়ীতে রাখিয়া গেলেন। তিনি বলিলেন যে, আমার গ্রেপ্তারের সংবাদে লোকে ক্রুদ্ধ হইয়াছে এবং পাগলের মত হইয়াছে। পায়ধুনীর নিকট গোলমাল হওয়ার ভয় আছে। সেখানে ম্যাজিষ্ট্রেট ও পুলিশ গিয়া পহুছিয়াছে।

আমি ঘরে ঢুকিতেই উমর সোবানী ও অনুসূয়া বেন মোটরে আসিলেন। তাঁহারা আমাকে পায়ধুনী যাইতে অনুরোধ করিলেন ও বলিলেন -"লোক সব অধীর ও উত্তেজিত হইয়াছে, আমাদের কেহ তাহাদিগকে শান্ত করিতে পারিবে না, আপনাকে দেখিলে তবে শান্ত হইবে।"

আমি মোটরে উঠিলাম। রাস্তায় যাইতে খুব ভীড় দেখিলাম। লোকে আমাকে দেখিয়া আনন্দে পাগল হইয়া গেল। তখনি এক শোভাযাত্রা গঠিত হইল। "বন্দেমাতরম্" "আল্লা-হো-আকবর" ধ্বনিতে আকাশ ফাটাইতে লাগিল। পায়ুনাতে ঘোড়-সওয়ার দেখিলাম। উপর হইতে ইষ্টক বৃষ্টি হইতেছিল। আমি হাতজোড় করিয়া লোক-দিগকে শান্ত হইতে বলিতেছিলাম। এই ইষ্টক-বৃষ্টি হইতে বাঁচিয়া যাইতে পারিব মনে হইল না। 'আব্দুর রহমান' গলি হইতে 'ক্রফোর্ড মারকেটে' যাইবার পথে শোভাযাত্রা আটকাইবার জন্য ঘোড়-সওয়ারের দল সাম্‌নে দাঁড়াইয়া গেল। শোভাযাত্রা ফোর্টের দিকে যাইতে তাহারা বাধা দিতেছিল। কিন্তু কেহ বাধা মানিতেছিল না। লোক পুলিশ-লাইন ভেদ করিয়া অগ্রসর হইয়া গেল। এই ভীড়ে আমার আওয়াজ কাহারও শোনা সম্ভবপর ছিল না। এই অবস্থায় ঘোড়-সওয়ারের দলের কর্ত্তা, লোকের দল ভাঙ্গিয়া দিতে হুকুম দিল। তখন সওয়ারের দল বর্শা উঁচাইয়া একদম ঘোড়া ছুটাইয়া দিল। উহাদের বর্শা আমাদের গায়ে লাগিয়া যাওয়ার ভয় ছিল। কিন্তু বর্শা গায় লাগিল না, গা ছুঁইয়া বর্শা লইয়া সওয়ারেরা তীর বেগে ছুটিয়া গেল। লোকের ভীড় ভাঙ্গিতে আরম্ভ হইল—দৌড়াদৌড়ি আরম্ভ হইল। কেহ পদ-দলিত হইল, কেহ পলাইল। ঘোড়-সওয়ারদের যাওয়ার কোনও স্থান ছিল না। লোকের আশেপাশে ছড়াইয়া পড়ারও কোন পথ ছিল না। তাহারা পিছনে ফিরিবে কি, সেখানেও হাজারো লোক ঠাসাঠাসি ভর্ত্তি! সে এক ভয়ঙ্কর দৃশ্য! ঘোড়-সওয়ার ও জনতা উন্মত্তের মত একত্র মিশিয়া গিয়াছিল। সওয়ারেরা কিছু দেখিতে বা কোথাও যাইতে পারিতেছিল না। তাহারা অন্ধের ন্যায় মানুষের ভিতর দিয়া ঘোড়া ছুটাইয়া রাস্তা

কাটিতেছিল। এই হাজার হাজার লোকের ভিড় কাটিয়া না যাওয়া পর্য্যন্ত তাহারা কিছুই যে দেখিতে পাইতেছে না, তাহা আমি দেখিলাম।

এই রকম করিয়া জনতা ছত্রভঙ্গ করা হইয়াছিল, এমনি করিয়া তাহাদের পথ আটকানো হইয়াছিল। আমার মোটর আগে যাইতে দিয়াছিল। আমি কমিশনারের আফিসের সাম্‌নে মোটর রাখিলাম এবং তাঁহার নিকট পুলিশের ব্যবহারের সম্বন্ধে নালিশ করার জন্ম নামিলাম।

৩২
স্মরণীয় সপ্তাহ—২

কমিশনার গ্রিফিথ সাহেবের আফিসে গেলাম। সিঁড়ির আশেপাশে যেখানে দেখা যায় সেইখানেই হাতিয়ার-বন্ধ সৈন্য খাড়া রহিয়াছে, যেন যুদ্ধের জন্য সজ্জিত হইয়া আছে। বারান্দাতে চাঞ্চল্য দেখা যাইতেছিল। আমি সংবাদ দিয়া আফিসের ভিতরে গিয়া দেখিলাম, সেখানে কমিশনারের নিকট মিঃ বোরিং বসিয়া আছেন।

আমি যে দৃশ্য দেখিয়া আসিয়াছি কমিশনারের নিকট তাহা বর্ণনা করিলাম। তিনি সংক্ষেপে জবাব দিলেন,—"আমি শোভাযাত্রা ফোর্টের দিকে যাইতে দিতে চাই নাই। সেখানে গেলে হাঙ্গামা না হইয়া যাইত না। আমি দেখিলাম লোকে অনুরোধ মানিতেছে না, তখন সওয়ার না পাঠাইয়া উপায় ছিল না।"

আমি বলিলাম—"কিন্তু তাহার ফল কি হইবে তাহা ত আপনি জানিয়াছেন। লোকের ঘোড়ার পায়ের নীচে দলিত হওয়া ছাড়া অন্য পথ ছিল না। ঘোড় সওয়ারের দল পাঠানোর দরকারই ছিল না, আমি ত এইরূপ মনে করি।"

"আপনি সে খবর রাখেন না। আপনার শিক্ষার ফল লোকের উপর কি হয় তাহা আপনার অপেক্ষা আমরা অনেক বেশী জানি। আমি প্রথম হইতে কঠিন উপায় না লইলে পরে অনেক বেশী লোকসান হইত। আমি আপনাকে বলিয়া দিতেছি, লোকে আপনার কথা মানিবে না। আইন-অমান্য করার কথা তাহারা চট্ করিয়া বুঝে,

শান্তির কথা বুঝা তাহাদের শক্তির বাহিরে। আপনার মনোভাব ভাল, কিন্তু লোকে আপনার ভাব বুঝিবে না। তাহারা নিজের স্বভাবেরই অনুসরণ করিবে।"—এই কথা সাহেব বলিলেন।

আমি উত্তর দিলাম—"আপনার ও আমার মধ্যে ভেদ এইখানে। লোকে স্বভাবতঃ লড়াই করার দিকে নয়, বরঞ্চ শান্তি প্রিয়।" তখন যুক্তি-তর্ক আরম্ভ হইল।

অবশেষে সাহেব বলিলেন—"ধরুন আপনি বুঝিলেন যে আপনার শিক্ষা লোকে বুঝে নাই, তখন আপনি কি করিবেন।"

আমি জবাব দিলাম—"যদি আমি তাহাই বুঝি,তবে এই সত্যাগ্রহ-লড়াইয়ে ক্ষান্ত দিব।"

"মুলতুবী রাখিবেন কি! আপনি ত মিঃ বোরিংএর নিকট বলিয়াছেন যে, আপনি মুক্তি পাওয়া মাত্রই পাঞ্জাবে ফিরিয়া যাইতে চান।"

"আমার ত ইচ্ছা ছিল যে, পরের ট্রেণেই পাঞ্জাবে ফিরিয়া যাইব। কিন্তু এখন ত আর যাওয়ার কথা বলা চলে না।"

"আপনি ধৈর্য্য ধরিয়া যদি থাকেন তবে অনেক খবর পাইবেন। আহ্‌মেদাবাদে কি চলিতেছে তাহা জানেন কি? অমৃতসরে কি হইয়াছে? লোকে একেবারে পাগলের মত হইয়া গিয়াছে। আমি পুরা খবর পাই নাই। কতক জায়গায় তারও কাটিয়া দিয়াছে। আমি আপনাকে বলিতেছি যে, এই সমস্ত হাঙ্গামার দায়িত্ব আপনারই ঘাড়ে রহিয়াছে।"

"আমার দায়িত্ব যেখানে আছে, সেখানে আমি তাহা অবশ্যই লইব। আহ্‌মেদাবাদে লোকে যদি কিছু গোলমাল করিয়া থাকে, তবে আমি আশ্চর্য্যান্বিত ও দুঃখিত হইব। অমৃতসরের কথা কিছু জানি না,

সেখানে আমাকে কেহ জানেও না। তবে আমি এটুকু জানি যে, পাঞ্জাবের সরকার যদি আমাকে সেখানে প্রবেশ করিতে না আটকাইতেন, তবে আমি শান্তি রাখার জন্য বড় অংশ গ্রহণ করিতে পারিতাম। আমাকে যাইতে না দিয়াই ত সরকার লোককে উত্তেজিত করিয়াছেন।"

এইভাবে আমাদের কথা হইতে লাগিল। আমাদের মত মিলিবে এরূপ সম্ভাবনা ছিল না। চৌপাটীতে সভা করিব ও লোককে শান্তি রাখিবার জন্য অনুরোধ করিব, এই কথা বলিয়া আমি বাহির হইয়া পড়িলাম।

চৌপাটীতে সভা করা হইল। আমি লোকদিগকে শান্তি ও সত্যাগ্রহের মর্য্যাদা সম্বন্ধে বুঝাইয়া বলিলাম,—"সত্যাগ্রহ সত্যের খেলা। যদি লোকে শান্তি না রাখে, তবে আমাদ্বারা সত্যাগ্রহের যুদ্ধ চালানো কখনও সম্ভব হইবে না।"

আহ্‌মেদাবাদ হইতে শ্রীমতী অনসূয়া বেন সংবাদ পাঠাইয়াছিলেন যে, সেখানে হাঙ্গামা হইয়া গিয়াছে। কেহ গুজব তুলিয়াছিল যে, তাঁহাকে গ্রেপ্তার করা হইয়াছে। তাহাতে মজুরেরা পাগল হইয়া যায় ও হাঙ্গামা করে, একজন সার্জ্জেণ্ট খুন পর্য্যন্ত হইয়া গিয়াছে।

আমি আহ্‌মেদাবাদে গেলাম। সেখানে খবর পাইলাম যে, নড়িয়াদের নিকটে রেলের লাইন তুলিয়া ফেলার চেষ্টা হইয়াছিল। বিরামগ্রামে এক সরকারী কর্ম্মচারী খুন হইয়াছে, এবং আহ্‌মেদাবাদে 'মার্শাল ল' জারি হইয়াছে। সকলে সন্ত্রস্ত হইয়া আছে। লোকে যেমন করিয়াছিল তাহার ফল তেমনি সুদ সমেত আদায় হইতেছে।

কমিশনার মিঃ প্র্যাটের নিকট আমাকে লইয়া যাওয়ার জন্য ষ্টেশনে লোক উপস্থিত ছিল। আমি তাঁহার নিকট গেলাম। তিনি খুবই

ক্রুদ্ধ হইয়াছিলেন। আমি শান্ত হইয়া তাঁহার কথার জবাব দিলাম। যে খুন হইয়া গিয়াছে তাহার জন্য আমার দুঃখ প্রকাশ করিলাম। 'মার্শাল ল'র অনাবশ্যকতার কথা বলিলাম এবং শান্তি স্থাপিত করার জন্য যে উপায় করা আবশ্যক, তাহাই করিতে আমি প্রস্তুত আছি, এ কথা জানাইলাম। আমি সাধারণ সভা ডাকিবার অনুমতি চাই। সেই সভা আশ্রমের মাঠে করার জন্য ইচ্ছা প্রকাশ করি। তাঁহার ইহা মনঃপূত হইল। আমার স্মরণ আছে যে, এই সভা ১৩ই তারিখ রবিবার দিন করা হইয়াছিল। 'মার্শাল ল' সেইদিন কি তার পরদিন রদ্ হয়। সেই সভায় আমি লোকের নিজের দোষ দেখাইয়া দেওয়ার চেষ্টা করি। আমি প্রায়শ্চিত্ত স্বরূপ তিন দিনের উপবাস লই এবং লোককে একদিনের উপবাস লওয়ার জন্য পরামর্শ দিই। যাহারা খুন ইত্যাদির সহিত জড়িত আছে, তাহাদিগকে অপরাধ স্বীকার করিতে বলি।

আমার ধর্ম্ম আমি স্পষ্ট দেখিতে পাইলাম। যে সকল মজুরের সঙ্গে আমি এতদিন কাটাইয়াছি, যাহাদিগকে আমি সেবা করিয়াছি এবং যাহাদের নিকট আমি ভাল ব্যবহার আশা করিতাম, তাহারা এই হাঙ্গামায় অংশ লইয়াছে বলিয়া আমার দুঃসহ দুঃখ হইল। আমি নিজেকেই ইহাদের দোষের অংশীদার বলিয়া মনে করি।

একদিকে যেমন লোককে নিজের অপরাধ স্বীকার করিতে বলিয়াছিলাম, অপরদিকে তেমনি সরকারকেও দোষ মাফ্ করিতে উপদেশ দিয়াছিলাম। আমার কথা দুইএর মধ্যে কেহই শোনে নাই। না লোকে দোষ স্বীকার করিল, না সরকার মাফ্ করিলেন।

রমন ভাই ইত্যাদি আমার নিকট আসিলেন ও সত্যাগ্রহ মুলতুবী রাখার জন্য অনুরোধ করিলেন। আমি অনুরোধের অপেক্ষা রাখি নাই।

যে পর্য্যন্ত শান্তি রক্ষা করিতে লোকে না শিখিতেছে, সে পর্য্যন্ত সত্যাগ্রহ মুলতুবী রাখার সঙ্কল্প আমি পূর্ব্বেই করিয়া ফেলিয়াছিলাম। ইহাতে তাঁহারা খুসী হইলেন।

কোনও কোনও মিত্র অসন্তুষ্ট হইলেন। তাঁহারা বলিলেন যে, যদি আমি, সকলে শান্ত থাকিবে এ প্রকার আশা রাখি ও তাহাই যদি সত্যাগ্রহের সর্ত্ত হয়, তবে ব্যাপক ভাবে সত্যাগ্রহ কখনও চালানো যাইবে না। আমি আমার মতভেদ জানাইলাম। যে সব লোকের মধ্যে কার্য্য করিতে হইবে, যাহাদের দ্বারা সত্যাগ্রহ করার আশা করা হয়, তাহারা যদি শান্তি না রাখে, তবে অবশ্যই সত্যাগ্রহ চালানো যাইবে না। সত্যাগ্রহের নেতাদের মধ্যে নির্দ্দিষ্ট ও পরিমিত শান্তি রাখিবার ক্ষমতা থাকা চাই, ইহাও আমার অন্যতম যুক্তি। এই মত আজও আমার অটুট রহিয়াছে।

৩৩

পর্ব্বত প্রমাণ ভুল

আহ্‌মেদাবাদের সভার পরই আমি নড়িয়াদ যাই। "পর্ব্বত প্রমাণ ভুল" (Himalayan miscalculation) বাক্যটা যে প্রসিদ্ধ হইয়াছে, তাহা আমি প্রথমে নড়িয়াদেই ব্যবহার করি। আহ্‌মেদাবাদেই আমি আমার ভুল জানিতে পারিয়াছিলাম। কিন্তু নড়িয়াদে আসিয়া সেখানকার অবস্থা দেখিয়া, খেড়া জেলায় অনেক লোক গ্রেপ্তার হইয়াছে শুনিয়া, যে সভায় আমি সংঘটিত ব্যাপারের উপর বক্তৃতা করিতেছিলাম, সেইখানে আমার হঠাৎ মনে হইল যে, খেড়া জেলায় এবং এই প্রকার অন্যান্য স্থানে লোককে আইন অমান্য করিতে আহ্বান করিয়া আমি তাড়াতাড়ি কাজ করায় ভুল করিয়া ফেলিয়াছি। এই ভুল আমার নিকট পর্ব্বত প্রমাণ মনে হয়।

এই কথা স্বীকার করাতে অনেকে আমাকে পরিহাস করেন। তাহা হইলেও, ভুল স্বীকার করার জন্য আমার কখনো অনুতাপ হয় নাই। আমার সর্ব্বদাই মনে হয় যে, যদি অপরের চালুনীর মত ছিদ্রকে ছুঁচের ছিদ্রের মত মনে করি, আর নিজের সরিষা প্রমাণ দোষকে পর্ব্বত প্রমাণ মনে করিতে শিক্ষা করি, তাহা হইলেই পরের দোষ ও নিজের দোষের ঠিক পরিমাণ জানিতে পারিব। আমি ইহাও বলি যে, এই সাধারণ নিয়ম, যে ব্যক্তি সত্যাগ্রহী হইতে ইচ্ছা করে তাহার খুব সূক্ষ্ম-ভাবে পালন করা সঙ্গত।

এইবার এই পর্ব্বত প্রমাণ ভুলটা কি তাহা দেখুন। সবিনয়

আইন-অমান্য তাহার দ্বারাই হইতে পারে, যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় ও বিনয়ের সহিত আইনকে মান্য দিয়া থাকে। অনেক সময়েই আমরা নিয়ম লঙ্ঘন করিলেও, সাজা পাওয়ার ভয়েই আইন পালন করিয়া থাকি। যে সকল আইনে নীতি অনীতির প্রশ্ন নাই, সে সকল আইন সম্বন্ধেই আইনের ভয়ে আইন মানার কথা বিশেষ ভাবে খাটে। চুরি করার বিরুদ্ধে আইন থাকুক আর নাই থাকুক, কোনও ভাল মানুষ চট্ করিয়া চুরি করিতে পারে না। কিন্তু সেই ব্যক্তিই রাত্রিকালে বাইসাইকেলে আলো দিয়া চলার নিয়ম ভঙ্গ করিয়া কোনও ক্ষোভ অনুভব করিবে না। আর এই ধরণের নিয়ম পালন করার জন্য যদি কেহ বলে, তাহা হইলেও তাহা পালন করিতে ভাল মানুষেরাও চট্ করিয়া প্রস্তুত হয় না। কিন্তু যখন নিয়ম আইন বলিয়া পাশ হইয়া যায়, এবং উহা পালন না করিলে দণ্ড পাওয়ার ভয় থাকে, তখন দণ্ড পাওয়ার অসুবিধা হইতে বাঁচার জন্য রাত্রে বাইসাইকেলে বাতি জ্বালাইয়াই সকলে চলে। এই শেষোক্ত প্রকারের নিয়ম পালন করাকে স্বেচ্ছায় নিয়ম পালন করা বলে না।

সত্যাগ্রহী, যখন সমাজের নিয়ম মান্য করে তখন সে জানিয়া, বুঝিয়া, স্বেচ্ছাপূর্ব্বক ও নিয়ম মান্য করা ধর্ম্ম জ্ঞান করিয়াই, নিয়ম মান্য করিয়া থাকে। এই ভাবে যে ব্যক্তি সমাজের নিয়ম জ্ঞান-পূর্ব্বক পালন করে, তাহারই সামাজিক নিয়মের নীতি অনীতি ভেদ বুঝিবার শক্তি আসে এবং নির্দ্দিষ্ট সীমার মধ্যে কোনও বিশেষ নিয়ম ভঙ্গ করার অধিকার জন্মে। এই প্রকার নিয়ম ভঙ্গ করার অধিকার প্রাপ্ত হওয়ার পূর্ব্বেই লোককে সবিনয় আইন ভঙ্গ করার

জন্ম আহ্বান করিয়া, পর্ব্বত প্রমাণ ভুল করিয়াছিলাম বলিয়া মনে হইয়াছিল। খেড়া জেলাতে প্রবেশ করিতেই, খেড়ার সত্যাগ্রহ যুদ্ধের স্মৃতিসমূহ হইতে আমার মনে আসিল যে, আমি কেমন করিয়া এই স্পষ্ট জিনিষটাও দেখিতে ভুল করিলাম! আমার এই বোধ হইল যে, সবিনয় আইন-অমান্য করার পূর্ব্বে উহার গভীর রহস্য সম্বন্ধে লোকের জ্ঞান হওয়া আবশ্যক। যাহারা প্রত্যহ আইনকে মনে মনে ভঙ্গ করে, যাহারা লুকাইয়া অনেক সময়েই আইন অমান্য করে, তাহারা হঠাৎ সবিনয় আইন-ভঙ্গের মর্ম্ম কি বুঝিবে, কেমন করিয়া তাহার মর্য্যাদা রক্ষা করিবে?

কিন্তু এই আদর্শ অবস্থায় হাজার হাজার বা লাখ লাখ লোক যে পঁহুছিতে পারিবে না, তাহা ত সহজেই বুঝা যায়। কিন্তু যদি এই অবস্থাই হয়, তাহা হইলে লোককে সবিনয় আইন ভঙ্গ করিতে বলার পূর্ব্বে, জনসাধারণকে বুঝাইয়া দিতে পারে, তাহাদের উপর দৃষ্টি রাখিতে পারে, এমন শুদ্ধ চরিত্র স্বেচ্ছাসেবকের দল গঠন করা প্রয়োজন এবং এই দলের সবিনয় আইন-অমান্য ও তাহার মর্য্যাদা সম্বন্ধে স্পষ্ট জ্ঞান থাকা আবশ্যক।

এই প্রকার চিন্তা করিতে করিতে বোম্বাই পঁহুছিলাম ও সত্যাগ্রহ সভার ভিতর দিয়া সত্যাগ্রহী-স্বেচ্ছাসেবক দল গঠন করিলাম; তাহাদের ভিতর দিয়া লোকের মধ্যে সবিনয় আইন-অমান্য কি তাহা বুঝাইবার জন্য শিক্ষা দিতে লাগিলাম এবং এই সকল কথা বুঝাইয়া বুলেটিন প্রচার করিতে লাগিলাম।

এই কার্য্য ভাল চলিলেও আমি দেখিলাম যে, উহাতে লোককে আকৃষ্ট করা যাইতেছে না। স্বয়ং-সেবকও যথেষ্ট পরিমাণে জুটিতেছিল

না। যাহারা এই দলে ভর্ত্তি হইতেছিল, তাহারাও সকলে নিয়মিত শিক্ষা লইতেছিল, ইহা বলা যায় না। তাহাদের সংখ্যাও দিনদিন বৃদ্ধি হওয়ার পরিবর্ত্তে কমিতে লাগিল। আমি বুঝিতে পারিলাম যে, সত্যাগ্রহের প্রসার, যাহা আশা করিয়াছিলাম তাহা অপেক্ষা ধীরে ধীরেই হইবে।

৩৪

"নবজীবন ও ইয়ং ইণ্ডিয়া"

যত ধীরেই হোক, শান্তি স্থাপনার কাজ যেমন একদিক হইতে হইতেছিল, অপর দিক হইতে সরকার তেমনি পুরাদস্তুর দমননীতি চালাইতেছিলেন। পাঞ্জাবে এই দমননীতি পূর্ণ মূর্ত্তিতে দেখা দিল। সেখানে 'মার্শাল-ল' প্রবর্ত্তিত হইয়া যথেচ্ছাচার চলিতে লাগিল। নেতাদিগকে গ্রেপ্তার করা হইল। বিশেষ আদালত বসানো হইল, সেগুলিকে আদালত বলা যায় না। উহা কোনও একজন কর্ত্তার হুকুম চালাইবার যন্ত্র মাত্র। সাক্ষী ও প্রমাণ ব্যতীতই ঐ আদালত হইতে দণ্ড বিধান হইতে লাগিল। মিলিটারী সৈন্যেরা নির্দ্দোষ লোকদিগকে কেঁচোর মত পেটের উপর ভর দিয়া শুইয়া চলিতে বাধ্য করিল। তখন জালিয়ানওয়ালাবাগের ভীষণ হত্যাকাণ্ড এদেশের ও বিদেশের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। কিন্তু আমার নিকট ঐ সকল পরবর্ত্তী অত্যাচারের বীভৎসতা ও নিষ্ঠুরতার তুলনায় জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ডও তুচ্ছ বোধ হইল।

যেমন করিয়াই হোক, পাঞ্জাব যাওয়ার জন্য আমার উপর চাপ পড়িল। আমি ভাইসরয়কে পত্র দিলাম, তার করিলাম, কিন্তু প্রবেশের অনুমতি পাওয়া গেল না। অনুমতি না লইয়া যদি যাই, তবে প্রবেশ করিতে পারিব না, আইন-অমান্য করার সন্তোষ লাভ করা হইবে মাত্র। এই ধর্ম্ম-সঙ্কটে আমার কি করা উচিত, এই বিষয় প্রশ্ন আমার নিকট উপস্থিত হইল। আমি যদি হুকুম অমান্য করিয়া পাঞ্জাবে প্রবেশ করি তাহা হইলেও তাহা সবিনয় আইন-

অমান্য পর্য্যায়-ভুক্ত হয় না বলিয়া বোধ হইল। যে শান্তি-পূর্ণ অবস্থা আইন-অমান্যের জন্য ইচ্ছা করি তাহা তখন বর্ত্তমান ছিল না। পাঞ্জাবের নাদীরশাহী কাণ্ড লোকের অশান্ত হওয়ার প্রবৃত্তি বাড়াইয়াছিল। এই সময় আমার আইন-অমান্য করা, আগুনে ঘি ঢালা হইবে বলিয়া আমার বোধ হইল, এবং আমি পাঞ্জাবে প্রবেশ করার প্রস্তাব গ্রহণ করিতে পারিলাম না। এইরূপ নির্ণয় করা আমার নিকট তিক্ত ঔষধ পান করার ন্যায় হইয়াছিল। রোজ আমার নিকট অত্যাচারের সংবাদ আসে, আর রোজই আমাকে রুদ্ধ রোষে উহা বসিয়া বসিয়া শুনিতে হয়।

মিঃ হর্নিম্যান 'ক্রনিক্‌ল্' পত্রকে এক প্রচণ্ড শক্তিতে পরিণত করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট নিদ্রিত প্রজার ঘর হইতে চোরের মত এই হর্নিম্যান সাহেবকে উঠাইয়া লইয়া গেলেন। এই চুরির ভিতর যে বীভৎসতা ছিল তাহার দুর্গন্ধ এখনো আমার নাকে লাগিয়া রহিয়াছে। আমি জানি যে, মিঃ হর্নিম্যান মার-কাট করা কখনো পছন্দ করিতেন না। আমি সত্যাগ্রহ সমিতির অনুমতি না লইয়াই পাঞ্জাবে সেবার আইন-অমান্য করিয়া প্রবেশ করিয়াছিলাম, তাহা তাঁহার মনঃপূত হয় নাই। আইন-অমান্য করা মুলতুবী রাখাতে তাঁহার সম্পূর্ণ সম্মতি ছিল। মুলতুবী রাখার সঙ্কল্প আমি প্রকাশ করার পূর্ব্বেই মুলতুবী রাখার পরামর্শ দিয়া তিনি আমাকে পত্র লিখিয়াছিলেন। "বোম্বাই ও আহমেদাবাদের মধ্যের ব্যবধানের জন্যই তাঁহার পরামর্শ আমার সঙ্কল্প প্রকাশের পরে আমার হস্তগত হয়। তাঁহাকে দেশ হইতে বহিষ্কার করিয়া দেওয়াতে আমার যেমন আশ্চর্য্য বোধ হইল, তেমনি দুঃখ বোধ হইল।

এই অবস্থায় 'ক্রনিক্লের' ব্যবস্থাপকেরা উহা চালাইবার ভার আমার উপর দিলেন। মিঃ ব্রেলভী ত ছিলেনই, সেই জন্য আমার বিশেষ কিছু করার আবশ্যক ছিল না। তাহা হইলেও আমার স্বভাব-বশতঃ এই দায়িত্ব আমার নিকট অতিরিক্ত হইয়া পড়িত। কিন্তু বেশীদিন আমাকে দায়িত্ব লইতে হয় নাই, সরকারের কৃপায় 'ক্রনিক্ল্' কাগজ বন্ধ হইয়া গেল।

উমর সোবানী ও শঙ্করলাল ব্যাঙ্কার 'ক্রনিক্লের' ব্যবস্থাপক ছিলেন। 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' কাগজও তাঁহাদেরই হাতে ছিল। ইঁহারা দুই জনেই আমাকে 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'খানা দেখিতে বলিলেন। 'ক্রনিক্লের' কাজ 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' দ্বারা করাইবার জন্য উহা সপ্তাহে পূর্ব্বের মত একবার বাহির না করিয়া দুইবার বাহির করার প্রস্তাব করিলেন। আমার তাহা পছন্দ হইল। সত্যাগ্রহের রহস্য বুঝাইতে আমার ইচ্ছা হইত। পাঞ্জাব সম্বন্ধে আর কিছু না হোক্, আমি উপযুক্ত সমালোচনা ত করিতে পারিব! আমি যাহা লিখি তাহার পশ্চাতে যে সত্যাগ্রহের শক্তি রহিয়াছে ইহাও গবর্ণমেণ্টের জানা ছিল। এই হেতু আমি এই মিত্রদের প্রস্তাবে সম্মত হইলাম।

কিন্তু ইংরাজী ভাষার সাহায্যে জন-সাধারণের মধ্যে কেমন করিয়া সত্যাগ্রহের শিক্ষা দেওয়া যায়! গুজরাটই আমার কার্য্যের মুখ্যক্ষেত্র; এই সময় ভাই ইন্দুলাল যাজ্ঞিক ঐ দলে ছিলেন। তাঁহার হাতে 'নবজীবন' মাসিক পত্রখানা ছিল। তাহার খরচাও উক্ত বন্ধুরা যোগাইতেন। এই পত্রখানা ভাই ইন্দুলাল ও উক্ত মিত্রগণ আমাকে দিলেন। ভাই ইন্দুলাল উহাতে কাজ করিতেও স্বীকার করিলেন। এই মাসিককে সাপ্তাহিক করা হইল।

"নবজীবন ও ইয়ং ইণ্ডিয়া"

ইতি মধ্যে 'ক্রণিকল্' পুনরুজ্জীবিত হয়। সেইজন্য 'ইয়ং ইণ্ডিয়া'কে আবার সাপ্তাহিক করা হইল এবং আমার প্রস্তাব অনুযায়ী উহা আহ্-মেদাবাদে আনা হইল। দুইখানা কাগজ দুই জায়গা হইতে চালনা করার খরচাও বেশী হয়, আমার অসুবিধাও বেশী হয়। 'নবজীবন' আহ্মেদাবাদ হইতেই বাহির হইত। আমি 'ইণ্ডিয়ান ওপিনিয়ন' হইতেই এই অভিজ্ঞতা পাইয়াছি যে, এই রকম সংবাদ-পত্রের জন্য নিজস্ব ছাপাখানা চাই। ইহা ভিন্ন তখন ছাপাখানা সম্বন্ধীয় আইন এমন ছিল্ যে, আমার লেখা ব্যবসাদার ছাপাখানাওয়ালাদের ছাপিতে সঙ্কোচ হওয়ার কথা। ইহাই নিজেদের ছাপাখানা বসাইবার প্রধান হেতু। ইহা আহ্মেদাবাদেই সহজে হইতে পারিত, এইজন্য 'ইয়ং ইণ্ডিয়া' আহ্মেদাবাদে আনা হইল।

এই সংবাদপত্রের যোগে আমি সত্যাগ্রহের শিক্ষা যথাশক্তি দিতে লাগিলাম। উভয় কাগজ সংখ্যায় অনেক ছাপা হইত এবং বাড়িতে বাড়িতে এক সময় ৪০ হাজারের কাছাকাছি পঁহুছিয়াছিল। 'নবজীবনের' গ্রাহক হঠাৎ বাড়িয়া যায়, আর 'ইয়ং ইণ্ডিয়ার' গ্রাহক ধীরে ধীরে বাড়িতে থাকে। আমার জেলে যাওয়ার পর গ্রাহক সংখ্যা কমিতে থাকে। এখন আট হাজারের নীচে নামিয়া গিয়াছে।

এই সংবাদপত্রে বিজ্ঞাপন না লওয়ার ইচ্ছা আমার প্রথম হইতেই ছিল। আমার বিশ্বাস, ইহাতেও কোন ক্ষতি হয় নাই। পত্রের স্বাধীনতা রাখা বিষয়ে এই প্রথা খুব সাহায্য করিয়াছে।

আমি এই সংবাদপত্র হইতে আমার শান্তি লাভ করিয়াছিলাম। যদিও আমি তখনই আইন-অমান্য আরম্ভ করিতে পারি নাই, তথাপি ইচ্ছামত আমার মত প্রচার করিতে পারিতাম—যাহারা সাহায্যের

জন্য আমার দিকে তাকাইত, তাহাদিগকে আশ্বাস দিতে পারিতাম। আমার মনে হয়, প্রজার সেই পরীক্ষার দিনে এই দুইখানা কাগজ উপযুক্ত সেবা দিতে পারিয়াছে এবং 'মার্শাল-ল'র অত্যাচারকে লাঘব করিতে সাহায্য করিয়াছে।

৩৫

পাঞ্জাবে

পাঞ্জাবে যাহা ঘটিয়াছিল, তাহার জন্য সার মাইকেল ও-ডায়ার আমাকে দোষী সাব্যস্ত করিয়াছিলেন। কোনও কোনও যুবকও, 'মার্শাল-ল'র জন্য আমাকেই দায়ী করিতে দ্বিধা করে নাই। কেহ বা ক্রুদ্ধ হইয়া এ কথাও বলিয়াছেন যে, যদি আমি আইন-অমান্য বন্ধ না করিতাম, তাহা হইলে কখনো জালিয়ানওয়ালাবাগের হত্যাকাণ্ড হইত না, 'মার্শাল-ল' হইত না। দুই একজন এমন ভয়ও দেখাইয়াছেন যে, পাঞ্জাবে গেলে আমাকে মারিয়া ফেলিতেও দ্বিধা করিবে না।

কিন্তু আমার কাছে আমার কার্য্য এতই ঠিক বলিয়া মনে হইয়াছিল যে, বুদ্ধিমান ব্যক্তির উহা ভুল বুঝার সম্ভাবনাই নাই। পাঞ্জাবে যাওয়ার জন্য আমি অধীর হইয়া পড়িয়াছিলাম। পাঞ্জাবে আমি ইতিপূর্ব্বে কখনো যাই নাই। যদি কোনও রকমে যাইতে পারি, তবে পাঞ্জাবে যাওয়ার আমার তীব্র ইচ্ছা ছিল। আমাকে যাঁহারা নিমন্ত্রণ করিয়াছিলেন—ডাঃ সত্যপাল, ডাঃ কীচলু, পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরী—ইঁহাদিগকে দেখিতে ইচ্ছা হইত। তাঁহারা জেলে ছিলেন। কিন্তু আমার সম্পূর্ণ বিশ্বাস ছিল যে, সরকার তাঁহাদিগকে দীর্ঘ দিন রাখিতে পারিবেন না। বোম্বাইয়ে যখনই যাইতাম, তখন অনেক পাঞ্জাবী আমার সহিত দেখা করিতেন। আমি তাঁহাদিগকে উৎসাহিত করিতাম, তাঁহারাও আমার উৎসাহ বাক্যে সন্তুষ্ট হইয়া যাইতেন। আমার আত্মবিশ্বাস এই সময় গভীর ছিল।

কিন্তু আমার যাওয়ার বিলম্বই হইতেছিল। 'এখনো নয়'—এই কথা ভাইসরয় প্রতিবারই আমার অনুরোধের উত্তরে জবাব দিতেন।

ইতিমধ্যে হাণ্টার কমিটি আসিল। তাঁহারা মার্শাল-লর আমলে সরকারী কর্ম্মচারীদের কতকগুলি কাণ্ড সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিতে আসিয়াছিলেন। দীনবন্ধু এণ্ড্রুজ তখন সেইখানে উপস্থিত হইলেন। তাঁহার পত্রে হৃদয়-বিদারক বর্ণনা থাকিত। সংবাদপত্রে যাহা প্রকাশিত হইয়াছে মার্শাল-লর জুলুম তদপেক্ষা বেশী হইয়াছিল—ইহাই তাঁহার পত্রের সুর। অন্যদিক হইতে মালব্যজীর তার আসিয়াছিল যে, আমার পাঞ্জাব যাওয়া চাই। এই অবস্থায় আমি পুনরায় ভাইসরয়কে তার করিলাম। জবাব আসিল অমুক তারিখে আপনি যাইতে পারিবেন। সে তারিখের কথা আজ স্মরণ নাই, তবে উহা ১৭ই অক্টোবর হওয়া সম্ভব।

আমি লাহোর পঁহুছিয়া যে দৃশ্য দেখিলাম তাহা কদাপি ভুলিবার নয়। অনেক দিন পরে যদি প্রিয়জন ঘরে ফিরে, তাহাকে দেখার জন্য যেমন বন্ধুরা আসে, তেমনি করিয়া আমাকে দেখিতে লোক সহর ছাড়িয়া আসিয়া ষ্টেশন ভরিয়া ফেলিয়াছিল। আমাকে দেখিয়া তাহারা আনন্দে পাগলের মত হইয়া গিয়াছিল।

পণ্ডিত রামভজ দত্ত চৌধুরীর বাংলোতে আমাকে লইয়া যাওয়া হইল। শ্রীমতী সরলাদেবী চৌধুরাণীকে আমি পূর্ব্বেই জানিতাম। তাঁহার উপর আমাকে দেখাশুনার ভার পড়িল। 'ভার' কথাটা আমি ইচ্ছাপূর্ব্বকই ব্যবহার করিতেছি, কেননা যে মুহূর্ত্তে আমি গেলাম, সেই মুহূর্ত্তেই গৃহস্বামীর গৃহ ধর্ম্মশালায় পরিণত হইল।

পাঞ্জাবে গিয়া আমি দেখিলাম যে, সেখানকার অনেক নেতা জেলে

যাওয়াতে প্রধান নেতাদিগের স্থান পণ্ডিত মদনমোহন মালব্য, পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও স্বর্গগত স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী গ্রহণ করিয়াছেন। মালব্যজী ও শ্রদ্ধানন্দজীর সহিত আমার পূর্ব্বেই ভালরূপ ঘনিষ্ঠতা হইয়া গিয়াছিল, পণ্ডিত মতিলালজীর সহিত লাহোরেই ঘনিষ্ঠ সম্পর্কে আসিলাম। এই সমস্ত নেতা এবং অন্য নেতা, যাঁহারা জেলে যাওয়ার সম্মান পান নাই, আমাকে শীঘ্রই আপনার জন করিয়া লইলেন। আমারও কাহাকেও অপরিচিত বলিয়া মনে হইল না।

হাণ্টার কমিটির নিকট সাক্ষ্য না দেওয়া, আমরা সকলে একমত হইয়া স্থির করিলাম। ইহার কারণ তখন ভালরকমেই আলোচিত হইয়াছিল, সেইজন্য সে বিষয়ে এখন আর আলোচনা করিব না। সেই সকল কারণ যুক্তি-যুক্ত ছিল এবং কমিটিকে বয়কট্ করা ঠিকই হইয়াছিল, একথা আজও আমি বলি।

হাণ্টার-কমিটিকে যদি বয়কট করা হইল, তবে আমাদের দিক হইতে এবং কংগ্রেসের দিক হইতে একটা অনুসন্ধান কমিটি হওয়া দরকার বলিয়া স্থির করা হইল। পণ্ডিত মালব্যজী, এই কমিটিতে পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু, ৺চিত্তরঞ্জন দাস, শ্রীযুক্ত আব্বাস তৈয়বজী, শ্রীযুক্ত জয়াকর ও আমাকে লইলেন। আমরা ভিন্ন ভিন্ন স্থানে অনুসন্ধান করার জন্য ছড়াইয়া পড়িলাম। এই কমিটির ব্যবস্থার ভার স্বাভাবিক ভাবে আমারই উপর পড়িল এবং বেশীর ভাগ গ্রামের মধ্যে অনুসন্ধান আমাকেই করিতে হইয়াছিল বলিয়া, আমি পাঞ্জাবের গ্রাম দেখিবার অমূল্য সুযোগ পাইলাম।

এই অনুসন্ধানের সময় পাঞ্জাবের নারীগণের সহিত আমার এমন সম্বন্ধ হইল, যেন আমরা কত যুগের পরিচিত। যেখানে যাই সেখানেই তাহারা আমার সহিত ভিড় করিয়া দেখা করেন ও নিজের হাতে কাটা

সুতার স্তূপ উপহার দেন। আমি এই অনুসন্ধানকালে অনায়াসেই দেখিলাম যে, পাঞ্জাব খাদির এক মহান্ ক্ষেত্র হইতে পারে।

লোকের উপর অনুষ্ঠিত অত্যাচারের অনুসন্ধান কার্য্যে যতই আমরা গভীরভাবে প্রবেশ করিতে লাগিলাম, ততই সরকারী-অরাজকতা, কর্ম্মচারীদের নৃশংসতা ও অভাবনীয় স্বৈরাচারের কথা শুনিয়া দুঃখিত হইলাম। পাঞ্জাব, যেখানে সরকারের সব চেয়ে বেশী সিপাহী সংগ্রহ হয়, সেই পাঞ্জাবের লোক কেমন করিয়া এমন অত্যাচার সহ্য করিল, ইহা তখন আমার কাছে আশ্চর্য্য মনে হইত, আজও আশ্চর্য্য মনে হয়।

এই কমিটির রিপোর্টের খসড়া তৈয়ারী করার কাজ আমার উপর পড়িয়াছিল। পাঞ্জাবে কি নির্য্যাতন হইয়াছিল তাহা যাঁহাদের জানার ইচ্ছা, তাঁহারা এই রিপোর্ট পড়িবেন। এই রিপোর্ট সম্বন্ধে এইটুকু বলিতে পারি যে, ইহাতে ইচ্ছাকৃত অতিশয়োক্তি একটিও নাই। যে সকল অবস্থা দেখানো হইয়াছে তাহার সম্বন্ধে সাক্ষ্য আছে। এই রিপোর্টে যত সাক্ষ্য দেওয়া হইয়াছে, তাহা অপেক্ষা অনেক অধিক সাক্ষ্য কমিটির নিকট ছিল। যে সম্বন্ধে অনুমাত্র সন্দেহ হইতে পারে, তেমন একটি বিষয়ও এই রিপোর্টে দেওয়া হয় নাই। কেবল সত্য সম্মুখে রাখিয়া, সত্যের উপর প্রতিষ্ঠিত করিয়া লিখিত এই রিপোর্ট হইতে পাঠক দেখিতে পাইবেন যে, ব্রিটিশ-শাসন নিজের সত্তাকে বজায় রাখার জন্য কতদূর পর্য্যন্ত যাইতে পারে, কি অমানুষিক কার্য্য করিতে পারে! যতদূর আমি জানি, এই রিপোর্টের একটা কথাও আজ পর্য্যন্ত কেহ মিথ্যা বলিতে পারেন নাই।

৩৬

খিলাফতের বদলে গো-রক্ষা

এখন কিছু সময়ের জন্য পাঞ্জাবের হত্যাকাণ্ডের বিষয় রাখিয়া অন্যকথা বলিব।

পাঞ্জাবের ডায়ারী অত্যাচারের তদন্ত যখন কংগ্রেসের দিক হইতে হইতেছিল, সেই সময় আমার নিকটে এক সভায় যোগ দেওয়ার জন্য নিমন্ত্রণ আসিল, ঐ নিমন্ত্রণ-পত্রে স্বর্গীয় হাকিম সাহেব ও ভাই আসফ আলীর নাম ছিল। শ্রদ্ধানন্দজী উপস্থিত থাকিবেন, ইহাও উল্লেখ করা হইয়াছিল। আমার মনে হয় তিনি সহকারী সভাপতি ছিলেন। এই নিমন্ত্রণের বিষয় ছিল, দিল্লীতে খিলাফৎ সম্বন্ধে তৎকালে অবস্থার আলোচনা করা এবং হিন্দু ও মুসলমানেরা আগামী শান্তি উৎসবে (Peace celebrat on) যোগ দিবেন কিনা, তাহা নির্দ্ধারণ করা। আমার স্মরণ হয়, এই সভা নভেম্বর মাসে হইয়াছিল।

এই নিমন্ত্রণ-পত্রে উল্লেখ ছিল যে, ইহাতে খিলাফৎ বিষয়ে আলোচনা হইবে, এবং কেবল তাহাই নহে, গো-রক্ষার বিষয়েও আলোচনা হইবে। কেননা গোরক্ষার ব্যবস্থা করার ইহাই উপযুক্ত অবসর।

এই নিমন্ত্রণ পত্রের উত্তরে আমি হাজির হইতে চেষ্টা করিব জানাইলাম এবং ইহাও জানাইলাম যে, খিলাফৎ ও গো-রক্ষা একত্র উল্লেখ করিয়া, একটার বদলে আর একটা দেনা পাওনার যুক্তি না করিয়া ঐ ঐ বিষয়ে তাহাদের নিজ নিজ দোষগুণের উপর বিচার করা উচিত। সভায় উপস্থিত হইয়াছিলাম। সভায় উপযুক্ত সংখ্যক লোক

উপস্থিত ছিল, যদিও পরবর্ত্তীকালে হাজার হাজার লোক মিলিয়া যে সব সভা করিয়াছে ইহা তত বড় ছিল না। এই সভায় শ্রদ্ধানন্দজী উপস্থিত ছিলেন। তাঁহার সহিত উল্লিখিত বিষয়ে আমি আলোচনা করিয়া লইয়াছিলাম। তাঁহার নিকট আমার যুক্তি মনঃপূত হইল এবং তাহা সভায় উপস্থিত করিতে আমার উপরই ভার দিলেন। হাকিম সাহেবের সহিত কথা বলিয়া লইয়াছিলাম। আমার যুক্তি এই ছিল যে, উভয় প্রশ্নই নিজ নিজ গুণদোষের উপর বিচার করা দরকার। যদি খিলাফৎ প্রশ্নে প্রমাণ হয় যে, সরকারের দিক হইতে অন্যায় হইয়াছে, তাহা হইলে হিন্দুর মুসলমানের সাথে যোগ দেওয়া দরকার, এবং তাহার সহিত গো-রক্ষা জড়ানো উচিত নয়। হিন্দুরা যদি ইহার উপর কোনও সর্ত্ত করে, তবে তাহা শোভা পায় না। মুসলমানেরা খিলাফতে সাহায্য পাইয়াছে বলিয়া গো-বধ বন্ধ করিলে তাহাও শোভা পাইবে না। প্রতি-বেশী এবং একই দেশবাসী বলিয়া এবং হিন্দুর মনোভাবকে সম্মান করার জন্য মুসলমানেরা স্বাধীনভাবে যদি গো-বধ বন্ধ করে, তবে তাহাই শোভা পায়। ইহা তাহাদের অবশ্য-কর্ত্তব্য এবং ইহা ভিন্ন প্রশ্ন। যদি ইহা অবশ্য করণীয় হয় এবং তাহারা অবশ্য-করণীয় বলিয়া বুঝে, তবে হিন্দুরা খিলাফতের সাহায্য করুক বা না-ই করুক, তবু গো বধ বন্ধ করিতে হয়। এই উভয় প্রশ্নকে স্বতন্ত্রভাবে বিচার করা সঙ্গত। সেইজন্য যদি সভাতে কেবল খিলাফতের প্রশ্নই আলোচিত হয় তাহাই ভাল—এই প্রকার আমি আমার যুক্তি জানাইলাম। সভায় উহা পছন্দ হইল। গো-রক্ষার প্রশ্ন সভায় আলোচনা হইল না। তবে মৌলানা আবদুল বারি সাহেব বলিলেন যে, খিলাফতে হিন্দুদের সাহায্য পাওয়া যাক্ আর না যাক্, এক দেশের লোক বলিয়া হিন্দুদের মনের দিকে

চাহিয়া মুসলমানদের গো-বধ বন্ধ করা উচিত। এক সময় এমনও মনে হইয়াছিল যে, মুসলমানেরা সত্যই গো-বধ বন্ধ করিবে।

কাহারও কাহারও মতে পাঞ্জাবের কথাও খিলাফতের সহিত যুক্ত করা উচিত। এই বিষয়ে আমার বিরোধ জানাইলাম। পাঞ্জাবের বিষয় স্থানীয়, পাঞ্জাবের দুঃখের কারণকে আমাদের "শান্তি উৎসবের" ব্যাপারে ("Peace celebrations,") যোগ দেওয়া না দেওয়ার সহিত যুক্ত না করিয়া থাকা যায় না, এইপ্রকার যুক্তি অবিবেচনার কাজ। ইহা সকলেই অনুমোদন করিয়াছিলেন।

এই সভায় মৌলানা হজরৎ মোহানী ছিলেন। তাঁহার সহিত পরিচয় আমার পূর্ব্বেই হইয়াছিল, কিন্তু তিনি যে কি রকম লড়াইয়ে তাহা এই স্থানেই দেখিলাম। এইখানে আমাদের মধ্যে যে মতভেদ হইল, তাহা অনেক বিষয়ে শেষ পর্য্যন্ত রহিয়াছে।

অনেক নির্দ্ধারণের ভিতর ইহাও একটা নির্দ্ধারণ ছিল যে, হিন্দু-মুসলমান সকলেই স্বদেশী ব্রত পালন করিবেন। এই নির্দ্ধারণের অর্থ বিদেশী বস্ত্র বহিষ্কার করা। খাদি তখনো তাহার যথাযোগ্য স্থান গ্রহণ করে নাই। হজরৎ মোহানী এই নির্দ্ধারণ সহ্য করিতে পারিলেন না। তাঁহার বক্তব্য ছিল যে, যদি ইংরাজ সরকার খিলাফৎ সম্বন্ধে ন্যায় আচরণ না করে, তবে সরকারকে শত্রু বলিয়া গণ্য করিয়া ব্রিটিশ মাল মাত্রই বয়কট করা দরকার। তিনি এই প্রকার প্রস্তাব উত্থাপন করিলেন।

ব্রিটিশ মাল মাত্রই বয়কট করার অপারগতা ও অযোগ্যতা সম্বন্ধে আমার যে সকল যুক্তি আজ সকলের পরিচিত, আমি সেই সকল যুক্তিই প্রয়োগ করিলাম। আমার অহিংসা-বৃত্তির যুক্তিও আমি প্রদর্শন

করিলাম।' আমি দেখিতে পাইলাম যে, সভার উপর আমার যুক্তির গভীর প্রভাব হইয়াছে। হজরৎ মোহানীর যুক্তি শুনিয়া লোকে এত উল্লাস জ্ঞাপন করিয়াছিল যে, আমার মনে হইয়াছিল, আমার এই ক্ষীণ স্বর কেহ শুনিবে না। তাহা হইলেও আমার কর্তব্য হইতে চ্যুত বা বিচলিত হইব না স্থির করিয়া উত্তর দিতে উঠিলাম। লোকে আমার কথা খুব মনোযোগের সহিত শুনিল। প্লাটফরমের উপরের লোকের নিকট হইতে আমি পূরা সমর্থন পাইলাম। আমাকে সমর্থন করিয়া এক জনের পর এক জন বলিতে লাগিলেন। নেতারা দেখিতে পাইলেন যে, ব্রিটিশ-মাল মাত্রই বয়কট করার নির্দ্ধারণ দ্বারা কোনও কাজ হওয়ার সম্ভাবনা নাই, পরন্তু প্রচুর উপহাসের পাত্র হইতে হইবে। সারা সভায় এমন একজনও ছিলেন না, যাঁহার সহিত কোনও না কোনও ব্রিটিশ দ্রব্য ছিল না। সভায় উপস্থিত ব্যক্তিরাই যাহা করিতে অসমর্থ, সেই কার্য্যের জন্য সভায় প্রস্তাব পাশ করায় লাভ অপেক্ষা হানি বেশী—একথা অনেকে বুঝিলেন।

"আপনাদের এই বৃটিশ বস্ত্র বয়কটের প্রস্তাবে আমার সন্তোষ হয় না। কতদিনে আমরা আমাদের সকল বস্ত্র দেশেই করিতে পারিব, কবে তারপর বিদেশী বস্ত্রের বহিষ্কার সম্পূর্ণ হইবে? এখনি বৃটিশ জাতির উপর গিয়া ধাক্কা লাগে এমন একটা কিছু করা আমাদের দরকার। আপনার বস্ত্র বহিষ্কার থাকে থাকুক, কিন্তু উহা অপেক্ষা শীঘ্র কার্য্যকরী কিছু আপনাকে দেখাইয়া দিতে হইবে।"—এই ধরণের কথা মৌলানা তাঁহার বক্তৃতায় বলিয়াছিলেন। এই বক্তৃতা আমি যখন শুনিতেছিলাম, তখন বিদেশী বস্ত্র বহিষ্কার ছাড়াও নূতন একটা কিছু দেখাইয়া দেওয়ার আবশ্যকতা আমি বুঝিতে পারিতেছিলাম। বিদেশী

বস্ত্রের বহিষ্কার শীঘ্র হইতে পারে না, ইহা সেই সময়ই আমার কাছে স্পষ্ট হইল। যদি খাদি দ্বারাই সম্পূর্ণ বস্ত্র বহিষ্কার করার ইচ্ছা করা যায়, তবে সে শক্তি আমাদের মধ্যে আছে, ইহা আমি পাঞ্জাবে দেখিতে পাইয়াছিলাম। কিন্তু এখন পর্যান্তও তাহা জানিলাম না। কেবল মিল যে বস্ত্র দিতে পারিবে না তাহা আমার জানা ছিল। মৌলানা সাহেব যখন বক্তৃতা শেষ করিলেন, তখন আমি জবাব দিতে প্রস্তুত হইতেছিলাম।

উর্দ্দু ও হিন্দী শব্দের সম্পদ আমার যথেষ্ট ছিল না। খাস মুসলমানদের মজলিসে যুক্তিপূর্ণ বক্তৃতা করার এই আমার প্রথম অভিজ্ঞতা। কলিকাতার মুশ্লিম লীগে আমি বলিয়াছিলাম, কিন্তু সে অল্প সময়ের জন্য এবং তাহাও আবার ভাব-প্রবণ বাক্যে হৃদয়স্পর্শ করার জন্য। এখানে আমার বিরুদ্ধ মত-পোষণকারীদিগকেই বুঝাইতে হইবে। আমি ভাষার অজ্ঞতা জনিত লজ্জা ত্যাগ করিলাম। এই হিন্দুস্থানী মুসলমানদের সভায় মার্জ্জিত উর্দু ভাষায় বক্তৃতা করিতে আমার সামর্থ্য নাই, আমার যাহা বক্তব্য তাহা ভাঙ্গা ভাঙ্গা হিন্দীতে আমাকে বুঝাইতে হইবে। এই কাজ আমি করিতে পারিয়াছিলাম। 'হিন্দী-উর্দ্দু' যে রাষ্ট্রভাষা হওয়ার যোগ্য এই সভাই তাহার সাক্ষী ছিল। যদি আমি ইংরাজী ভাষায় বক্তৃতা করিতাম, তবে আমার কাজ চলিত না। মৌলানা সাহেব আমার কথায় প্রতিবাদ করার আবশ্যক বোধ করিতেন না। এবং যদিও প্রতিবাদ করিতেন, তবে ইংরাজী ভাষায় আমি উহার উত্তর দিয়া প্রত্যাশিত ফল পাইতে পারিতাম না।

আমার ভাব প্রকাশের উপযুক্ত উর্দ্দু কি গুজরাটী একটি শব্দ হাতের কাছে না পাইয়া আমি লজ্জা বোধ করিলাম। আমার "নন-কো-

অপারেশন” এই ইংরাজী শব্দ মনে আসিল। মৌলানা যখন বক্তৃতা দিতেছিলেন, তখনই আমার মনে হইল যে, যে-ব্যক্তি সকল বিষয়ে সরকারের সাহায্য করিতেছে, তাহার পক্ষে বিরোধিতা করার কথা অন্তঃসার শূন্য। তলোয়ার লইয়া বিরোধ যেখানে করা যায় না, সেখানে তাহার সহিত কাজে যোগ না দেওয়াতে যে বিরোধ, তাহাই সত্য বিরুদ্ধতা বলিয়া আমার মনে হইল। আমি ‘নন-কো-অপারেশন’ শব্দের প্রথম প্রয়োগ এই সভায় করিলাম। আমার বক্তৃতায় এই ‘নন-কো-অপারেশনের’ সমর্থনের জন্য যুক্তি দিই। এই সময় ‘নন-কো-অপারেশন’ শব্দের বিস্তার কতদূর তাহা আমি জানিতাম না। সেইজন্য ইহার ভিতর পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে প্রবেশ করিলাম না। আমি যাহা বলিয়াছিলাম তাহা এই ধরণের বলিয়া স্মরণ আছে :—

“মুসলমান ভাইয়েরা এক মহৎ নির্দ্ধারণ গ্রহণ করিয়াছেন। ঈশ্বর না করুন, যদি সরকার শান্তির সর্ত্তের বিরুদ্ধতা করেন, তবে মুসলমানেরা সরকারকে সকল সহায়তা হইতে বঞ্চিত করিবেন। আমার বিশ্বাস এই কার্য্য করিতে প্রজার অধিকার আছে। সরকারের দেওয়া খেতাব রাখিতে, বা সরকারী চাকুরী করিতে আমরা বাধ্য নই। যেখানে সরকারের দ্বারা খিলাফতের ন্যায় মহান্ ব্যাপারের ধর্ম্মসঙ্গত পরিণতির ক্ষতি হয়, সেখানে আমরাই বা সরকারকে কেন সাহায্য করিব? সেই হেতু খিলাফতের বিষয়ে যদি বিশ্বাসঘাতকতা হয়, তবে সরকারের সাহায্য না করাই আমাদের কর্ত্তব্য।”

ইহার পরেও কয়েক মাস পর্য্যন্ত এই non-co-operation, অসহযোগ শব্দটি প্রসিদ্ধি লাভ করিতে পারে নাই। কারণ উহা কয়েক মাসের জন্য এই সভার কার্য্য-বিবরণের অন্তরালেই চাপা পড়িয়াছিল।

একমাস পর অমৃতসরে কংগ্রেস বসে। সেখানে আমি সহযোগের সমর্থন করি, কারণ এখনও আমার আশা ছিল যে, হিন্দু-মুসলমানের সরকারের সহিত অসহযোগ করার আবশ্যকতা হইবে না।

৩৭

অমৃতসরের কংগ্রেস

'মার্শাল-ল'র আমলে যে শত শত নির্দ্দোষ লোককে তথা কথিত আদালতে নাম মাত্র সাক্ষী লইয়া অল্প বা অধিক দিনের জন্য জেলে দেওয়া হইয়াছিল ; তাহাদিগকে সরকার ধরিয়া রাখিতে পারিতেছিলেন না। এই সুস্পষ্ট অন্যায়ের বিরুদ্ধে চারিদিকে এত চীৎকার হইতেছিল যে, সরকারের আর বেশী দিন জেলে রাথার শক্তি ছিল না। এইজন্য কংগ্রেস বসার পূর্ব্বেই অনেকে মুক্তি পাইয়াছিলেন। লালা হরকিষণ-লাল প্রভৃতি সকল নেতা মুক্ত হইয়াছিলেন। কংগ্রেস যথন চলিতেছিল তথন আলিভাইয়েরা খালাস হইয়া আসিলেন। ইহাতে লোকের আনন্দের সীমা রহিল না। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু নিজের ওকালতী ব্যবসা ফেলিয়া পাঞ্জাবেই ঘর করিয়াছিলেন। তিনিই কংগ্রেসের সভাপতি হইয়াছিলেন। স্বামী শ্রদ্ধানন্দজী অভ্যর্থনা-সমিতির সভাপতি হইয়াছিলেন।

আজ পর্য্যন্ত আমি কংগ্রেসে হিন্দী ভাষায় ছোট-খাটো বক্তৃতা করিতাম। উহাতে হিন্দীভাষা ব্যবহার করার দৃষ্টান্ত দেখানো হইত। আর ঐ সব বক্তৃতায় প্রবাসী ভারতীয় সম্বন্ধে কি করণীয় তাহা জানাইতাম। অমৃতসরেও এবার আমাকে ইহা অপেক্ষা বেশী কিছু করিতে হইবে, তাহা আমি ভাবি নাই। কিন্তু যেমন পূর্ব্বেও হইয়াছে, তেমনি এবারেও অপ্রত্যাশিত ভাবে আমার উপর দায়িত্ব আসিয়া পড়িল।

নূতন রিফর্ম সম্বন্ধে সম্রাটের ঘোষণা তখন প্রকাশ হইয়াছে। উহা আমার নিকট সম্পূর্ণ সন্তোষজনক ছিল না। অন্য সকলের নিকট ত আদৌ সন্তোষজনক ছিল না। তবে সম্রাটের ঘোষিত শাসন-সংস্কার, (রিফর্ম) উহার দোষ সত্ত্বেও স্বীকার করিয়া লওয়া যাইতে পারে, আমি তখন এইরূপ মনে করিতাম। সম্রাটের ঘোষণায় আমি লর্ড সিংহের হাত আছে দেখিতে পাইলাম। তাঁহার ভাষায় আমার চোখে আশার কিরণ দেখা দিয়েছিল। কিন্তু অভিজ্ঞ লোকমান্য, চিত্তরঞ্জন দাস প্রভৃতি যোদ্ধাগণ মাথা নাড়িলেন। ভারতভূষণ মালব্যজী মধ্যস্থ ছিলেন।

আমাকে মালব্যজী তাঁহার কামরায় রাখিয়াছিলেন। কাশীতে বিশ্ববিদ্যালয়ের ভিত্তি স্থাপনের সময় আমি তাঁহার সাদাসিধা চলনের পরিচয় পাইয়াছিলাম। এবার ত তাঁহার কামরাতেই ছিলাম এবং তাঁহার দিনচর্য্যা দেখিয়া আমি আনন্দিত ও আশ্চর্য্য হইলাম। তাঁহার কামরা গরীবের ধর্ম্মশালা ছিল। এত লোকের ভিড় থাকিত যে, চলাফেরার পথ পর্য্যন্ত থাকিত না। সেখানে না ছিল কোন নিজস্ব সময়, না ছিল একটু সময়ের জন্য নিরিবিলি। যে কেহ হোক্, যে কোনও সময় আসিবে ও যত ইচ্ছা তাঁহার সময় লইবে। এই ঘরের এক কোণে ছিল আমার দরবার অর্থাৎ আমার খাটিয়া। যাহা হোক্ আমি মালবাজীর থাকার ধরণ বর্ণনায় অধ্যায় দিতে চাই না, এখন বক্তব্য বিষয়ে আসিতেছি।

এই অবস্থায় মালব্যজীর সহিত রোজ কথা প্রসঙ্গ চলিত। তিনি আমাকে সমস্ত পার্টির কথা বড় ভাইয়ের মত করিয়া বুঝাইয়া দিতেন। আমি ঐ শাসন-সংস্কার সম্বন্ধীয় প্রস্তাবের আলোচনায় যোগ দেওয়া

ধর্ম্ম মনে করিলাম। পাঞ্জাবের কংগ্রেস-রিপোর্টে আমার হাত ছিল। পাঞ্জাব সম্বন্ধে সরকারের নিকট হইতে কাজ আদায় করিতে হইবে, খিলাফৎ সম্বন্ধে ত হইবেই। আমি মনে করিতাম মণ্টেগু ভারতবর্ষকে দাগা দিবেন না। কয়েদীদিগকে যে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, আলী-ভাইদিগকে যে ছাড়িয়া দেওয়া হইয়াছে, উহা আমি শুভ-চিহ্ন মনে করিতাম। আমার বিশ্বাস হইয়াছিল যে, নির্দ্ধারিত শাসন-সংস্কার গ্রহণ করা চাই। চিত্তরঞ্জন দাসের দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে. সংস্কারকে অসন্তোষজনক ও অসম্পূর্ণ গণ্য করিয়া উহা অগ্রাহ্য করিয়া ফেলিয়া দেওয়া উচিত। লোকমান্য কতকটা উদাসীন ছিলেন। কিন্তু দেশবন্ধু যদি কোনও প্রস্তাব আনেন, তবে সেইদিকেই নিজের সমর্থন দিবেন স্থির করিয়াছিলেন।

এই প্রকার অভিজ্ঞ,পরীক্ষিত এবং সর্ব্বমান্য জন-নায়কদের সহিত মত-ভেদ হওয়ায় আমার অসহ্যবোধ হইতেছিল। অন্যদিক হইতেও বিবেকের বাণী আমার কাছে স্পষ্ট ছিল। আমি কংগ্রেসের বৈঠক হইতে পলাইবার চেষ্টা করিলাম। পণ্ডিত মতিলাল নেহেরু ও মালব্যজীর নিকট প্রস্তাব করিলাম যে, আমাকে অনুপস্থিত হইতে দিলে ভাল ফল হইবে,আমিও বিশিষ্ট নেতাদের সহিত মতভেদ প্রদর্শন করা হইতে বাঁচিয়া যাইব।

আমার এই প্রস্তাব, এই দুই প্রবীণ নেতারই পছন্দ হইল না। লালা হরকিষণলালের কানে এই কথা গেলে তিনি বলিলেন— "ইহা কদাপি হইতে পারে না, ইহাতে পাঞ্জাবীদিগকে বড়ই আঘাত করা হইবে।" লোকমান্যের সহিত, দেশবন্ধুর সহিত আলোচনা করিলাম। মিঃ জিন্নার সহিত দেখা করিলাম ; কোনও রাস্তা বাহির হইল না। আমার মনোবেদনা আমি মালব্যজীর নিকট প্রকাশ করিলাম।

তাঁহাকে বলিলাম—"মীমাংসা হওয়ার কোনও সম্ভাবনা দেখিতেছি না; যদি আমাকে আমার প্রস্তাব উপস্থিত করিতে হয় তবে পরিণামে ভোট লইতেই হইবে। কিন্তু এখানে ভোট লওয়ার কোনও ব্যবস্থাই দেখিতেছি না। এখন পর্য্যন্ত যে ব্যবস্থা আছে, তাহাতে সভার মধ্যে হাত উঠাইয়াই ভোট লওয়া হয়। দর্শক ও সভ্যের মধ্যে হাত তোলার বেলায় কোন ভেদই করা হয় না। এই বিশাল সভা মধ্যে ডিভিসন করার ব্যবস্থা হওয়ার কোনও উপায় নাই। সুতরাং আমার প্রস্তাবের উপর যদি ভোট লইতে হয় তবে তাহারও ব্যবস্থা নাই।"

লালা হরকিষণলাল এই ব্যবস্থা করিয়া দেওয়ার ভার লইলেন। তিনি বলিলেন—"ভোট লওয়ার দিন দর্শকদিগকে প্রবেশ করিতে দেওয়া হইবে না। কেবল সভ্যরাই আসিবেন। তাঁহাদের ভোট গণনা করিয়া দেওয়া, সে আমার কাজ। কিন্তু আপনার কংগ্রেস হইতে অনুপস্থিত হওয়া চলিবে না।"

অবশেষে আমি হার মানিলাম, স্থির হইল আমার প্রস্তাব উত্থাপন করিতেই হইবে। বস্তুতঃ অত্যন্ত সঙ্কোচের সহিতই প্রস্তাব উপস্থিত করিতে আমি স্বীকার করিলাম। মিঃ জিন্না ও মালব্যজী উহার সমর্থন করিলেন। উহার উপর বক্তৃতা হইল। আমি দেখিতে পাইতেছিলাম যে, আমাদের মতভেদে যদিও কিছুই কটুতা ছিল না, বক্তৃতার ভিতর যুক্তি ব্যতীত আর কিছুই ছিল না, তবু সভা মতভেদ মাত্রও সহ্য করিতে পারিতেছিলেন না। নেতাদের মধ্যে মতভেদে তাঁহাদের দুঃখ হইতেছিল। তাঁহারা সভায় ঐক্যমত চাহিতেছিলেন।

যখন এদিকে বক্তৃতা চলিতেছিল, অপরদিকে মঞ্চের উপর ভেদ মিটাইবার প্রযত্ন হইতেছিল। একে অন্যকে চিঠি দিতেছিল।

মালব্যজী ত যেমন করিয়াই হোক মিটাইবার জন্য খাটিতেছিলেন। এই সময় জয়রামদাস আমার হাতে তাঁহার প্রস্তাব দিলেন এবং অতি মধুর বাক্যে ভোট দেওয়ার সঙ্কট হইতে সভ্যদিগকে বাঁচাইতে আমাকে মিনতি করিলেন। তাঁহার প্রস্তাব আমার পছন্দ হইল। মালব্যজীর দৃষ্টি চতুর্দ্দিকে একটু আশার আলোকই খুঁজিতেছিল। আমি বলিলাম —"এই প্রস্তাব উভয়েরই পছন্দ হইবে মনে হয়।" লোকমান্যকে আমি উহা দেখাইলাম। তিনি বলিলেন—"দাসের পছন্দ হয় ত আমার আপত্তি নাই।" দেশবন্ধু দেখিলেন, তিনি বিপিনচন্দ্র পালের দিকে তাকাইলেন। মালব্যজীর আশা হইল। তিনি কাগজখানা টানিয়া লইলেন এবং দেশবন্ধুর মুখ হইতে 'হাঁ' শব্দ পুরা বাহির না হইতেই বলিয়া উঠিলেন—"সজ্জনগণ, আপনারা শুনিয়া সন্তুষ্ট হইবেন যে, মিটমাট হইয়া গিয়াছে।" আর দেখিবেন কি? হাততালির শব্দে মণ্ডপ ফাটিয়া যাইতে লাগিল। লোকের মুখ গম্ভীর হইয়া গিয়াছিল, এখন আনন্দে উজ্জ্বল হইয়া উঠিল।

কি সে নির্দ্ধারণ ছিল তাহা উল্লেখেরও এখানে প্রয়োজন নাই। আমার সত্যের পরীক্ষা কি প্রকার হইয়াছিল, তাহার পরিচয় দিবার জন্যই এখানে উহার উল্লেখ। এই মিটমাট দ্বারা আমার দায়িত্ব বাড়িল।

৩৮

মহাসভায় প্রবেশ

কংগ্রেসে আমাকে যোগ দিতে হইয়াছিল, ইহাকেই আমি মহাসভায় প্রবেশ করা বলি না। ইহার পূর্ব্বেও আমি কংগ্রেসে গিয়াছি, সে কেবল আমার আনুগত্যের চিহ্ন স্বরূপ। ক্ষুদ্রাদপি ক্ষুদ্র সিপাহীর কাজ ব্যতীত আমার সেখানে আর কোনও কাজের কথা আমার মনে আসিত না, করিতে ইচ্ছাও হইত না।

আমার অমৃতসরের অভিজ্ঞতা আমাকে দেখাইয়াছে যে, কংগ্রেসে আমার একটি শক্তির ব্যবহার কাজে লাগিতে পারে। পাঞ্জাব সমিতির কার্য্যে লোকমান্য, মালব্যজী, মতিলালজী, দেশবন্ধু প্রভৃতি নেতারা সন্তুষ্ট হইয়াছিলেন—ইহা আমি দেখিতে পাইয়াছিলাম। সেই হেতু তাঁহারা আমাকে তাঁহাদের বৈঠকের আলোচনায় ডাকিলেন। ইহাতে আমি দেখিয়াছিলাম যে, বিষয় নির্ব্বাচনী সভার অনেক কর্ম্ম এই বৈঠকেই হইয়া যায়। এই আলোচনা সভায়, নেতারা যাঁহাদের উপর বিশেষ বিশ্বাস রাখেন, তাঁহাদিগকেই ডাকা হইত, আর সেইজন্যই আবার অনাবশ্যক লোকও মাঝে মাঝে ঢুকিয়া পড়িত।

আগামী বর্ষের জন্য যাহা করার ছিল তাহার মধ্যে আমার কাজ সম্পর্কে দুইটি বিষয়ে আমি রস অনুভব করিতেছিলাম, ঐ কার্য্যে আমার কুশলতাও ছিল। ইহাদের একটা হইতেছে—জালিয়ানওয়ালা-বাগের হত্যাকাণ্ডের স্মারক। খুব উৎসাহের মধ্যে কংগ্রেসে প্রস্তাব পাশ হয়। এই জন্য প্রায় পাঁচ লক্ষ টাকা তুলিতে হইবে। উহার ট্রাষ্টির মধ্যে

আমার নামও ছিল। দেশে জন-সাধারণের কার্য্যের জন্য ভিক্ষা তুলিবার শক্তি যাঁহাদের আছে তাঁহাদের মধ্যে মালব্যজীর প্রথম স্থান ছিল—এখনো আছে। আমি জানিতাম ঐ কার্য্যে আমিও তাঁর খুব পিছনে পড়িব না। আমি দক্ষিণ আফ্রিকায় আমার এই শক্তির পরিচয় পাইয়াছি। রাজা মহারাজার নিকট হইতে যাদু করিয়া লাখ লাখ টাকা আনার শক্তি আমার ছিল না এবং আজও নাই। এবিষয়ে মালব্যজীর সহিত প্রতিযোগিতা করার আমার কোন সম্ভাবনা নাই। জালিয়ানওয়ালাবাগের জন্য টাকা রাজা-মহারাজার নিকট হইতে পাওয়া যাইবে না—ইহা আমি জানিতাম। সেই জন্য স্মারকের রক্ষকদিগের মধ্যে আমার নাম দেওয়াতেই আমি বুঝিয়াছিলাম যে, ঐ টাকা তোলার প্রধান ভার আমার উপরে পড়িবে। কাজেও তাহাই হয়। বোম্বাইয়ের সহরবাসিগণ এই স্মারকের জন্য প্রাণ খুলিয়া টাকা দিয়াছেন। আজ ঐ জন্য সাধারণের হাতে যত টাকা থাকা দরকার তাহা আছে। কিন্তু এই হিন্দু, মুসলমান ও শিখের রক্ত যেখানে মিশ্রিত হইয়া রহিয়াছে, সেখানকার জমির উপর কি রকমের স্মারক হইবে, অর্থাৎ চাঁদার টাকার কি ব্যবহার হইবে—ইহা এক বিষম প্রশ্ন হইয়া পড়িয়াছে। কেননা এই তিন সম্প্রদায়, অথবা প্রকৃতপক্ষে দুই সম্প্রদায়ের মধ্যে এখন বন্ধুত্বের পরিবর্ত্তে শত্রুতা দেখা দিয়াছে বলিয়া বোধ হইতেছে।

আমার আর এক শক্তি ছিল খসড়া প্রস্তুত করা, যাহা কংগ্রেসের ব্যবহারে লাগিতে পারে। লম্বা ধরণের কথা কেমন করিয়া অবিনয়-রহিত ভাষায়, কম শব্দ প্রয়োগ দ্বারা করা যাইতে পারে, তাহা আমি জানিতাম এবং নেতারাও তাহা বুঝিয়াছিলেন। কংগ্রেসের যে নিয়মাবলী তখন ছিল তাহা গোখলের দান। তিনি কতকগুলি নিয়মের

খসড়া করিয়াছিলেন, তাহারই উপর কংগ্রেসের কার্য্য চলিত। এই নিয়ম তিনি কেমন করিয়া প্রণয়ন করিয়াছিলেন, সে মধুর ইতিহাস আমি তাঁহার নিজ মুখ হইতেই শুনিয়াছি। কিন্তু এখনকার কাজ ঐ কয়টা নিয়মে কুলায় না, ইহা সকলেই বুঝিয়াছিলেন। সেই জন্ম নিয়মাবলী গঠনের আলোচনাও কয়েক বৎসর হইতে চলিতেছিল। এমন ব্যবস্থা ছিল না যে, সারা বৎসর ধরিয়া কেহ কার্য্য চালায়, অথবা ভবিষ্যতের সম্বন্ধে কেহ বিচার করে। কংগ্রেসের তিন জন সেক্রেটারী ছিলেন, কিন্তু সত্যকার কার্য্য নির্ব্বাহকারী সেক্রেটারী একজনই হইতেন। একজন মন্ত্রী আফিস চালাইবেন, না ভবিষ্যতের কার্য্য-পদ্ধতি স্থির করিবেন, না পূর্ব্বের কংগ্রেস যে সকল দায়িত্ব লইয়াছে, চলতি বৎসরে তাহা পূরণ করিবেন? এই প্রশ্ন এইবার সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করে। কংগ্রেসের সময় ত হাজার হাজার লোকের ভিড় হয়; তখন জনসাধারণের জন্য যাহা করণীয় সে সকল কার্য্য করায় সুবিধা হয় না। প্রতিনিধির সংখ্যার শেষ নাই। যে কোনও প্রদেশ হইতে যত ইচ্ছা আসিতে পারেন। সেই জন্য কোনও একটা ব্যবস্থা হওয়ার আবশ্যকতা সকলে জানাইলেন। নিয়মাবলীর খসড়া তৈরী করার ভার আমি লইলাম, কিন্তু এক সর্ত্ত ছিল। জনসাধারণের উপর দুইজন নেতার প্রভাব আছে, আমি দেখিয়াছিলাম। তাঁহাদের কাছে, আমাকে সাহায্য করার জন্য তাঁহাদের দুই জনের প্রতিনিধি আমি চাই। তাঁহারা নিশ্চিন্ত হইয়া বসিয়া নিজেরা এই খসড়া করার কাজ করিতে পারিবেন না, তাহা আমি জানিতাম। সেইজন্য লোকমান্যের নিকট ও দেশবন্ধুর নিকট তাঁহাদের বিশ্বাসভাজন দুই জনের নাম চাহিলাম; ইহা ব্যতীত নিয়ম-গঠনকারী সমিতিতে আর কাহারও থাকার আবশ্যক নাই—এই প্রস্তাব করিলাম।

এই প্রস্তাব গৃহীত হইল। লোকমান্য শ্রীযুত কেলকারের ও দেশবন্ধু শ্রীযুত আই, বি, সেনের নাম দিলেন। এই নিয়ম-গঠন সমিতি মোটেই না বসিলেও আমাদের কাজ একমতে হইয়াছিল। পত্র-ব্যবহার দ্বারা আমাদের কার্য্য চালাইতাম। এই নিয়ম-গঠন বিষয়ে আমার মনে অভিমান আছে। আমি একথা বলি যে, যদি এই নিয়ম অনুসরণ করিয়া কাজ আদায় করা যায়, তবে উহা দ্বারাই আমাদের স্বরাজ-লাভ-কার্য্য সিদ্ধ হয়—ইহা সত্য। এই দায়িত্ব লওয়ার দ্বারাই আমি কংগ্রেসে সত্য সত্য প্রবেশ লাভ করিলাম বলিয়া মনে করি।

৩৯

খাদির জন্ম

১৯০৮ সালের পূর্ব্ব পর্য্যন্ত আমি চরখা কি তাঁত দেখিয়াছি বলিয়া আমার স্মরণ হয় না। তাহা হইলেও "হিন্দ্ স্বরাজ্য" পুস্তকে ভারতবর্ষে চরখার সাহায্যে দারিদ্র্য দূর করা যায়, ইহা আমি বলিয়াছি। অথবা যে রাস্তায় দেশের ক্ষুধা মিটিবে সেই রাস্তায় স্বরাজ আসিবে—ইহা সকলেই বুঝিতে পারে, বলা যায়। ১৯১৫ সালে যখন দক্ষিণ আফ্রিকা হইতে ফিরিয়া আসিলাম তখনো আমার চরখার দর্শন হয় নাই। আশ্রম খুলিয়া তাঁত বসাইলাম। তাঁত বসাইতে আমার খুব মুস্কিল হইয়াছিল। আমরা সকলেই অনভিজ্ঞ ছিলাম। সেইজন্য তাঁত বসাইয়াও তাঁত চালানো গেল না। আমরা সকলেই কলম চালাইতে বা ব্যবসা চালাইতে জানিতাম, কেহই কারিগর ছিলাম না। সেইজন্য তাঁত বসাইয়াও বয়ন কার্য্য শিক্ষা করার আবশ্যক ছিল। কথিয়াওয়াড় ও পলানপুর হইতে তাঁতের এক মাষ্টার আসিল। সে নিজের সমস্ত কারিগরী শিখাইত না। কিন্তু মগনলাল গান্ধী যে কাজ হাতে লইয়াছেন তাহা ছাড়িয়া দেওয়ার পাত্র নহেন। তাঁহার কারিগরের হাতই ছিল। তিনি বয়ন-কৌশল পুরা শিখিয়া লইলেন। একে একে আশ্রমে নূতন তাঁতি তৈরী হইতে লাগিল।

আমাদের নিজেদের কাপড় তৈরী করিয়াই পরা দরকার, সেইজন্য মিলের কাপড় পরা এখন বন্ধ করিলাম। আশ্রমবাসীরা হাতের তাঁতে দেশী মিলের সুতার কাপড় পরিবে—স্থির হইল। ইহা করিয়ে

গিয়া আমাদের অনেক শিক্ষা হইল। ভারতবর্ষের তাঁতিদের জীবনযাত্রা, তাহাদের উপার্জ্জন, তাহাদের সূতা পাইতে যে সব অসুবিধা হয়, কেমন করিয়া তাহারা প্রতারিত হয় এবং দিনে দিনে তাহারা কেমন করিয়া ডুবিতেছে—সে সব জানিতে পারা গেল। আমরা শীঘ্র যে নিজেদের সমস্ত কাপড় নিজেরা বুনাইয়া লইতে পারিব, এমন সম্ভাবনা ছিল না। সেইজন্য বাহিরের তাঁতিদের নিকট হইতে আমাদের আবশ্যক কাপড় বুনাইয়া লওয়া হইত। দেশী মিলের সূতার কাপড় তাঁতির নিকট পাওয়া যাইত না। তাঁতিরা সমস্ত কাপড়ই বিলাতী সূতায় প্রস্তুত করিত। আমাদের মিলে সূক্ষ্ম সূতা হয় না। আজও সূক্ষ্ম সূতা দেশী মিলে খুব কমই হয়—খুব সূক্ষ্ম সূতা ত আদৌ হয় না। যাহারা দেশী সূতার কাপড় বুনাইয়া দিতে সম্মত,এমন তাঁতি বহু কষ্টে মিলিল। এই সব তাঁতি যত দেশী সূতার কাপড় করিবে, সে সমস্তই আশ্রমকে লইতে হইবে এরূপ কথা হইল। এই প্রকারে আমাদের জন্য তৈরী কাপড় আমরা পরিতাম ও মিত্রদের মধ্যে তাহার প্রচার করিতাম। এমনি করিয়া বলিতে গেলে, আমরা সূতাকাটা মিলের বয়ন-এজেণ্ট হইয়া পড়িলাম। মিলের সহিত পরিচয়ে আসিয়া তাহাদের কার্য্য-ব্যবস্থা ও তাহাদের অসুবিধার জ্ঞান হইতে লাগিল। মিলের-কর্ত্তারা, হাত-তাঁতের ইচ্ছা করিয়া সাহায্য করিতেন না, অনিচ্ছাসত্ত্বেই করিতেন।

এই সব দেখিয়া আমরা হাতে সূতা কাটার জন্য অধীর হইলাম। যতদিন হাতে সূতা না কাটিতেছি, ততদিন আমাদের পরাধীনতা যাইবে না—আমরা ইহা দেখিলাম। মিলের এজেণ্টগিরি করিয়া আমরা দেশ-সেবা করিতেছি—বলা যায় না।

'কিন্তু না মিলে চরখা, না মিলে চরখা শিখানোর কোনও লোক!

নলী ভরার চরখা আমাদের নিকট ছিল। কিন্তু তাহাতেই যে সূতা কাটা যায় এ জ্ঞানও ছিল না। একদিন কালিদাস ঝাভেরী এক রমণীর সন্ধান পাইলেন, যে সূতা কাটিতে জানে। নূতন কাজ শিখিতে ওস্তাদ এক আশ্রমবাসীকে পাঠানো হইল, কিন্তু সে শিখিয়া আসিতে পারিল না।

সময় চলিয়া যাইতে লাগিল, আমি অধীর হইতে লাগিলাম। খবর পাওয়া যাইতে পারে, এমন কোনও লোকের সহিত আশ্রমে দেখা হইলেই জিজ্ঞাসা করিতাম। কিন্তু সূতাকাটার কাজ স্ত্রীলোকেরাই করিত। সেই জন্য কেহ যদি কোথাও সূতা কাটিতে জানে, সে খবর স্ত্রীলোকের নিকটেই পাওয়ার কথা।

গুজরাটী ভাইয়েরা আমাকে ভরুচ শিক্ষা-পরিষদে ১৯১৭ সালে টানিয়া লইয়া গিয়াছিলেন। সেখানে সাহসী ভগ্নী গঙ্গা বাঈয়ের সাথে দেখা হইল। তিনি বিশেষ শিক্ষিতা ছিলেন না; কিন্তু শিক্ষিতা মহিলাদের ভিতর যে সাহস বা বোধশক্তি সাধারণতঃ দেখা যায়, তাঁহার মধ্যে তদপেক্ষা অধিক ছিল। তিনি তাঁহার জীবন যাত্রায় অস্পৃশ্যতার মূল কাটিয়া ফেলিয়াছিলেন। তিনি বেপরোয়া ভাবে অন্ত্যজদের সহিত মিশিতেন ও তাহাদের সেবা করিতেন। তাঁহার অর্থ ছিল, কিন্তু আবশ্যক সামান্যই ছিল। শরীর সুদৃঢ় ছিল, তিনি সর্ব্বত্র একাই যাইতেন, কোনই সঙ্কোচ করিতেন না। তিনি ঘোড়ায় চড়িতেও পটু ছিলেন। এই মহিলার সহিত গোধরার পরিষদে বিশেষ পরিচয় করিলাম। আমার দুঃখের কথা তাঁহার কাছে বলিলাম। দময়ন্তী যেমন নলের জন্য খোঁজ করিয়াছিলেন, ইনি চরখা তেমনি ভাবে খুঁজিয়া বেড়াইবেন বলিয়া প্রতিজ্ঞা করিয়া আমার ভার লাঘব করিলেন।

৪০

পাইলাম

গুজরাটে ভাল রকম ঘোরার পর অবশেষে বরোদারাজ্যের বিজাপুরে চরখা পাওয়া গেল। অনেকগুলি পরিবারে চরখা ছিল, তাহারা উহা মাচায় উঠাইয়া রাখিয়াছিল। যদি তাহাদের সূতা কেহ লয় ও পাঁজ ঠিকমত যোগায়, তবে কাটিতে রাজি আছে—গঙ্গা বেন এই খবর দিলেন। আমার অপার আনন্দ হইল। পাঁজ যোগাইবার কাজ কঠিন বোধ হইল। স্বর্গগত ভাই উমর সোবানীর সহিত কথা বলায় তিনি নিজের মিল হইতে পাঁজ পাঠাইবেন বলিলেন। পাঁজ পাইয়া আমি গঙ্গা বেনকে পাঠাইলাম। সূতা এত দ্রুত তৈরী হইয়া আসিতে লাগিল যে, আমরা কি করিব বুঝিতে পারিলাম না।

ভাই উমর সোবানীর উদারতার শেষ ছিল না, কিন্তু আমাদের ত তাঁহার দিকে তাকানো দরকার। পাঁজ লইতে আমার সঙ্কোচ বোধ হইতে লাগিল। আর মিলের পাঁজ লইয়া সূতা কাটাও আমার নিকট দূষণীয় মনে হইল। যদি মিলের পাঁজ চলে, তবে মিলের সূতায় দোষ কি? পূর্ব্বেকার লোকেরা কি মিলের পাঁজ ব্যবহার করিতেন? তাঁহারা কেমন করিয়া পাঁজ তৈরী করিতেন? ধুনকর দ্বারা পাঁজ প্রস্তুত করিতে আমি গঙ্গা বেনকে বলিলাম; তিনি তাহারও ভার লইলেন। ধুনকরের খোঁজ মিলিল। তাহাকে মাসিক ৩৫৲ টাকা হিসাবে অত্যধিক বেতনে রাখা হইল। ধোনা তুলা হইতে পাঁজ করা বালকদিগকে শেখানো হইল। আমি তুলা

ভিক্ষা চাহিলাম। ভাই যশোবন্ত প্রসাদ তুলার গাঁট যোগাইবার ভার লইলেন। গঙ্গা বেন কাজ খুব বাড়াইলেন। তাঁতি বসাইলেন ও চরখার সুতা বুনাইতে লাগিলেন। বিজাপুরের খাদি প্রসিদ্ধ হইল।

অন্যদিক দিয়া আবার আশ্রমে চরখা অবাধে প্রবেশ করিল। মগনলাল গান্ধীর নিজের শিল্প-জ্ঞান প্রয়োগ করিয়া চরখার সংস্কার সাধন করিলেন এবং চরখা ও টেকো আশ্রমেই তৈরী করিতে লাগিলেন। আশ্রমের প্রথম তৈরী খাদিখানা সতের আনা গজ পড়িল। আমি এই মোটা খাদি সতের আনায় গজ কিনিতে বন্ধুদিগকে বলিলাম। তাঁহারা ঐ দাম আনন্দের সহিত দিলেন।

বোম্বাইয়ে আমি শয্যাগত হইয়া পড়িয়াছিলাম, তবুও ওখানে চরখা সন্ধান করার শক্তি আমার ছিল। সেখানে দুইজন কাটুনী ভগ্নীর খোঁজ পাইলাম। তাহাদিগকে ২৮ তোলার এক সের সূতার জন্য একটাকা দিলাম। আমি খাদি-শাস্ত্রে তখন অন্ধের ন্যায় ছিলাম। হাতে সূতা পাইলেই হইল, কাটুনী দেখিতে পাইলেই হইল—এই রকম ভাব ছিল। গঙ্গা বেন যে দাম দিতেন তাহার সহিত তুলনা করিয়া দেখিলাম যে, আমি ঠকিতেছি। স্ত্রীলোকেরা কম মূল্য লইতে স্বীকার না করায় তাহাদিগকে ছাড়িয়া দিতে হইল। কিন্তু তাহাদের দ্বারাও কাজ হইল। শ্রীমতী অবন্তিকা বাঈ, রমীবাঈ কামদার, শ্রীযুক্ত শঙ্করলাল ব্যাঙ্কারের মাতাঠাকুরাণী ও শ্রীমতী বসুমতী বেন সূতা কাটিতে শিখিলেন। আমার চোখের সামনে চরখা গুঞ্জন করিতে লাগিল। আর ঐ শব্দেই যে আমার রোগ শীঘ্রই সারিয়া উঠিল—সে কথা বলিলে অত্যুক্তি করা হইবে না। অবশ্য উহার প্রভাব মানসিক ছিল। কিন্তু লোককে আরোগ্য করিতে মনের ক্ষমতাও কি কম?

চরখা আমিও কাটিতে চেষ্টা করিলাম। কিন্তু তখন উহাতে বেশী দূর অগ্রসর হইতে পারি নাই।

এখানে বোম্বাইয়ে আবার হাতের পাঁজ কোথায় পাইব; শ্রীযুক্ত রেবাশঙ্কর ভাইয়ের বাংলার নিকট দিয়া তাঁতের বাঁই বাঁই আওয়াজ করিতে করিতে একজন ধুনুরী রোজ যাইত। তাহাকে ডাকিলাম। সে গদি তয়ার করার জন্য তুলা ধুনিত। সে পাঁজ তৈরী করিয়া দিতে স্বীকার করিল। দাম বেশী চাহিল, আমি তাহাই দিলাম। এই প্রকারে তৈরী সূতা আমি বৈষ্ণবদিগের পবিত্র "একাদশী ব্রতে" ব্যবহার করার জন্য মূল্য লইয়া বিক্রয় করিলাম। ভাই শিবজী বোম্বাইয়ে চরখার ক্লাশ খুলিলেন। এই সকল পরীক্ষায় অনেক টাকা খরচ হইল, কিন্তু শ্রদ্ধাবান দেশ-ভক্তেরা এই অর্থ জোগাইলেন ও আমি খরচ করিতে লাগিলাম। আমার বিশ্বাস এই যে, ঐ অর্থব্যয় বৃথা হয় নাই, উহা হইতে অনেক শিক্ষা পাওয়া গেল। চরখার সীমা কোথায় তাহারও পরিমাপ পাওয়া গেল।

এখন আমি কেবল খাদি পরার জন্য অধীর হইলাম। আমার ধুতি দেশী মিলের কাপড়ের হইত। বিজাপুরে ও আশ্রমে যে মোটা খাদি উৎপন্ন হইত তাহা মাত্র ৩০ ইঞ্চি বহরের। আমি গঙ্গা বেনকে সাবধান করিয়া দিলাম যে, যদি একমাসের মধ্যে ৪৫ ইঞ্চি ধুতি না তৈরী করিয়া দিতে পারেন, তবে আমি ঐ কম বহরের খাদিই পরিব। ভগ্নী ইহাতে বিপদে পড়িলেন, তাঁহার বড় খারাপ বোধ হইল। কিন্তু তিনি হার মানিলেন না। এক মাসের মধ্যেই তিনি পঞ্চাশ ইঞ্চি বহরের ধুতি পাঠাইলেন ও ছোট কাপড় পরার অসুবিধা হইতে বাঁচাইলেন।

এই সময়ে ভাই লক্ষ্মীদাস, লাঠী নামক স্থান হইতে অন্ত্যজ ভাই রামজী ও তাহার স্ত্রী গঙ্গা বেনকে আশ্রমে লইয়া আসিলেন ও তাহাঁদের দ্বারা বড় বহরের খাদি প্রস্তুত করাইতে লাগিলেন। খাদি প্রচারে এই দম্পতীর ভাগ যেমন তেমন নয়, একথা বলা যায়। তাহারা গুজরাটে ও গুজরাটের বাহিরে তাঁতে সূতা বোনাইবার কৌশল অপরকে শিখাইয়াছিল। এই নিরক্ষর অথচ কলা-কুশল বহিন যখন তাহার তাঁত চালাইতে থাকে, তখন তাহাতে এত মগ্ন হইয়া যায় যে, এদিক সেদিক দেখিতে, কি কাহারও সহিত কথা বলার তাহার খেয়াল থাকে না।

৪১

কথোপকথন

এই সময় 'স্বদেশী' নামে পরিচিত এই খাদি আন্দোলনে, মিল-মালিকেরা আমার বিস্তর সমালোচনা করিতেছিলেন। ভাই উমর সোবানী মিল-মালিক হইয়াও তাঁহার অভিজ্ঞতা দ্বারা আমাকে সাহায্য করিতেন এবং তিনি অপরের মন্তব্যের সংবাদ আমাকে দিতেন। ইঁহাদের একজনের যুক্তির প্রভাব তাঁহার উপরেও হইয়াছিল। আমাকে তাঁহার নিকট লইয়া যাওয়ার জন্য তিনি অনুরোধ জানান। আমি সে নিমন্ত্রণ গ্রহণ করি ও দেখা করিতে যাই।

"আপনাদের স্বদেশী আন্দোলন পূর্ব্বেও একবার হইয়াছিল—তাহা জানেন ত ?"

আমি বলিলাম—"হাঁ, জী।"

"আপনি জানেন যে, বঙ্গ-ভঙ্গের সময় স্বদেশী আন্দোলনে খুব জোর ধরিয়াছিল, আর তাহাতে আমাদের মিলগুলি খুব লাভ করিয়া লইয়াছিল, কাপড়ের দাম বাড়াইয়া দিয়াছিল। যাহা করা যায় না এমন কতকগুলি কাজও করা হইয়াছিল।"

"আমি একথা শুনিয়াছি, শুনিয়া দুঃখ পাইয়াছি।"

"আপনার দুঃখ আমি বুঝিতে পারি। কিন্তু দুঃখিত হওয়ার কোনও কারণ ছিল না। আমরা কিছু পরোপকারের জন্য ব্যবসা করি না। আমাদের লাভ চাই, শেয়ার-হোল্ডারদিগকেও জবাব দিতে হয়। 'বস্তুর মূল্য তাহার চাহিদার উপর নির্ভর করে ; এই নিয়মের বিরুদ্ধে কে

দাঁড়াইতে পারে? বাংলার একথা জানা উচিত ছিল যে, তাহার আন্দোলনের জন্য মিলের কাপড়ের দাম বাড়িবে।"

"বেচারা বাঙ্গালী আমারই মত বিশ্বাস-পরায়ণ। তাহারা আমারই মত ধরিয়া লইয়াছিল যে, মিল-মালিকেরা এত বড় স্বার্থপর নয় যে, তাহারা দেশের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করিবে, স্বদেশীর নামে বিদেশী কাপড় বেঁচিবে।"

"আপনি যে এইরূপ মনে করেন তাহা আমি জানি এবং জানি বলিয়াই আপনাকে সাবধান করার জন্য এখানে আসার কষ্ট দিয়াছি, যাহাতে আপনি ভোলা বাঙ্গালীর মতই ভুল না করেন।" এই বলিয়া শেঠ নিজেদের তৈরী কাপড় আনার জন্য ইসারা করিলেন। এই কাপড় ঘুঁথা, (ঝুট্) অর্থাৎ পরিত্যক্ত তুলার ছাঁট হইতে তৈরী হইয়াছিল। উহা দেখাইয়া তিনি বলিলেন,—"দেখুন, এই মাল আমরা নূতন তৈরী করিতে আরম্ভ করিয়াছি। উহা ভাল বিক্রয় হইতেছে। ইহা ঝুট্ হইতে তৈরী বলিয়া খুব সস্তা হয়। এই মাল আমরা দূরবর্ত্তী উত্তর প্রদেশ পর্য্যন্ত বিক্রয়ের জন্য পঁহুছিয়া দিতেছি। আমাদের এজেণ্ট চারিদিকে ছড়াইয়া রহিয়াছে, তাহা হইলেই বুঝিতে পারিবেন যে, আপনার মত লোকের আমাদের মিলের এজেণ্ট হওয়ার আবশ্যক নাই। পরন্তু সত্য এই যে, যেখানে আপনাদের আওয়াজ পঁহুছে না, সেখানেও আমাদের এজেণ্ট রহিয়াছে, আমাদের মাল পঁহুছিতেছে। আপনার ইহাও দেখা উচিত যে, ভারতবর্ষের যত মাল দরকার তাহা আমরা তৈরী করিয়া উঠিতে পারি না। সেইজন্য স্বদেশীর প্রশ্ন প্রধানতঃ অধিক উৎপাদন করা লইয়া। যখন আমরা যথেষ্ট পরিমাণে কাপড় তৈরী করিতে পারিব ও কাপড় ভাল করিতে পারিব, সেই মুহূর্ত্তেই বিদেশী

কাপড় আসা বন্ধ হইবে। সেইজন্য আমার পরামর্শ এই যে, আপনারা যে রীতিতে আন্দোলন চালাইতেছেন সে ভাবে আন্দোলন চালাইবেন না। নূতন মিল যাহাতে বসে সে দিকে মন দিন। আপনাদের স্বদেশী কাপড়ের কাট্‌তির জন্য আন্দোলনের আবশ্যক নাই; স্বদেশী কাপড় উৎপন্ন করা আবশ্যক।"

আমি বলিলাম—"তাহা হইলে আমি যদি সেই কাজই করিতে থাকি, তবে আপনি আশীর্ব্বাদ করিবেন ত?"

"সে কেমন? আপনি মিল খুলিবার চেষ্টা করিলে অবশ্যই ধন্যবাদ-ভাজন হইবেন।"

"সে কাজ ত আমি করিতেছি না, আমি চরখা চালাইবার জন্য লাগিয়া পড়িয়াছি।"

"সে কি জিনিষ?"

আমি চরখার কথা বুঝাইলাম ও বলিলাম—"আপনার কথা আমি স্বীকার করি। আমার মিলের এজেন্ট হওয়া উচিত নয়। তাহাতে লাভের পরিবর্ত্তে লোকসানই হইবে। আমাদের দরকার উৎপন্ন করা ও যাহা উৎপন্ন হয় তাহা বিক্রয়ের জন্য লাগিয়া পড়া। এখন আমি কি করিয়া চরখার সূতায় কাপড় উৎপন্ন হয় সেই চেষ্টাই করিতেছি। আমি স্বদেশী বলিতে এই কাজই বুঝি, কেননা এই পথেই ভারতবর্ষের ক্ষুধা মিটিবে; অর্দ্ধেক সময় বসিয়া থাকে এমন দুঃখী স্ত্রীলোকেরা কাজ পাইবে। তাহাদিগকে দিয়া সূতা কাটাইয়া ও খাদি বুনাইয়া লোককে পরাইতেই আমার চেষ্টা—আমার এই আন্দোলন। চরখা কাটা যে কত সহজ তাহা আমি জানিতাম না। এখন কেবলমাত্র উহা আরম্ভ হইয়াছে। কিন্তু উহাতে আমার পরিপূর্ণ

বিশ্বাস আছে ; আর যাহাই হোক্, উহাতে লোকসান ত নাই। এই আন্দোলন হইতে যতটা কাপড় ভারতবর্ষে উৎপন্ন হয় ততটাই লাভ। এক্ষণে এই চেষ্টায় যে দোষ নাই, একথা ত আপনি বলিবেন?"

"যদি এই ভাবে আপনি আন্দোলন চালাইতে থাকেন, তবে তাহাতে আমার বলার কিছু নাই। এ যুগে চরখা চলিবে কিনা সে অন্য কথা। আমি আপনার সফলতা কামনা করি।"

৪২

অসহযোগের প্রবাহ

খাদির প্রগতি অতঃপর কেমন হইল সে কথা আর বলিব না। কেমন করিয়া খাদি লোক-সমক্ষে আসিল তাহা জানাইবার পর, তাহার ইতিহাস দেওয়ার ক্ষেত্র ইহা নহে। সে বিষয় বলিতে গেলে উহারই একটি পুস্তক হইয়া যায়। সত্যের অনুসন্ধান করিতে গিয়া একের পর এক বস্তু কেমন করিয়া আমার নিকটে অনায়াসে আসিয়াছে, আত্মকথা তাহাই জানাইবার জন্য লেখা।

এক্ষণে অসহযোগ সম্বন্ধে কিছু বলার সময় আসিয়াছে—বলা যায়। খিলাফতের জন্য আলীভাইয়েরা জোর আন্দোলন চালাইতেছিলেন। স্বর্গগত আব্দুল বারী ইত্যাদি উলেমাদের সহিত এই বিষয়ে অনেক আলোচনা হইয়াছিল। মুসলমানেরা শান্তি ও অহিংসা কতদূর পালন করিতে পারে, সে বিষয়েও আলোচনা হইয়াছিল। অবশেষে স্থির হয় যে, নির্দ্দিষ্ট দিন পর্যান্ত যৌক্তিক বলিয়া উহা পালন করিতে বাধা নাই। আর, একবার অহিংসার প্রতিজ্ঞা লইলে উহা পালন করিতে তাহারা বাধ্য। অবশেষে অসহযোগের নির্দ্ধারণ খিলাফৎ পরিষদে দেওয়া হইল। সেখানে অনেক আলোচনার পর উহা পাস হইল। আমার স্মরণ আছে যে, এলাহাবাদে এই জন্য একবার সারা রাত ধরিয়া সভা চলিয়াছিল। হাকিম সাহেবের শান্তিময় অসহযোগের প্রয়োগ-সাফল্য সম্বন্ধে সন্দেহ ছিল। তারপর তাঁহার সন্দেহ দূর হওয়ায় তিনিও উহাতে যোগ দিলেন। তিনি যে সাহায্য করিয়াছিলেন তাহা অমূল্য।

তারপর গুজরাটে পরিষদ বসে। সেখানে আমি অসহযোগের নির্দ্ধারণ উপস্থিত করি। সেখানে বিরোধকারীদের প্রথম যুক্তি এই ছিল যে, যে পর্য্যন্ত কংগ্রেস এই নির্দ্ধারণ না লইতেছেন, তৎপূর্ব্বে প্রাদেশিক পরিষদ উহা গ্রহণ করিতে পারে না। আমি বলিলাম যে, পরিষদ কংগ্রেসের নির্দ্ধারণের বিরুদ্ধে কিছু করিতে পারে না। কিন্তু অগ্রসর হইয়া যাওয়ার অধিকার নিম্নতন সংস্থার আছে। কেবল তাহাই নহে, যদি শক্তি থাকে, তবে তাহা করাই উহার ধর্ম্ম। ঐ প্রকার করিলে প্রধান সংস্থার গৌরব বাড়ে। এই প্রস্তাবের দোষগুণের উপর ভাল ও মিষ্ট আলোচনা হয়, ভোট লওয়া হয় এবং অনেক বেশী ভোটে অসহযোগের প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রস্তাব গ্রহণ করাইতে আব্বাস তৈয়বজীর ও বল্লভভাইয়েরই অধিক কৃতিত্ব ছিল। আব্বাস সাহেব সভাপতি ছিলেন এবং তাঁহার অসহযোগের দিকেই অনুকূল ভাব ছিল।

সভা-সমিতিতে এই প্রস্তাব গ্রহণ করার পর, ১৯২০ সালের সেপ্টেম্বর মাসে কলিকাতার বিশেষ অধিবেশনে, এই প্রস্তাব উপস্থিত করা স্থির করিলাম। ইহার জন্য বেশ ভালরকম প্রস্তুত হওয়া গিয়াছিল। লালা-লাজপত রায় সভাপতি নির্ব্বাচিত হইয়াছিলেন। বোম্বাই হইতে খিলাফৎ-স্পেশাল ও কংগ্রেস-স্পেশাল ট্রেন ছাড়িয়াছিল। কলিকাতায় খুব বেশী প্রতিনিধি ও দর্শক আসিয়াছিলেন।

মৌলানা সৌকত আলীর অনুরোধে আমি অসহযোগের মুসাবিদা রেলে আসিতে তৈরী করি। আজ পর্য্যন্ত আমার মুসাবিদায় "শান্তিময়" শব্দ বেশী থাকিত না। আমার বক্তৃতায় আমি এই শব্দটি ব্যবহার করিতাম। কেবলমাত্র মুসলমানদের সভায় "শান্তিময়" এই শব্দ

দ্বারা আমার ভাব বুঝাইয়া প্রকাশ করা সম্ভব হইবে না বলিয়া মনে হইল। সেইজন্য মৌলানা আবুল কালাম আজাদের নিকট আমি অন্য কোনও শব্দ চাহিলাম। তিনি 'বা-অমন' শব্দটি দিলেন এবং অসহযোগের বদলে "তর্কে মওয়ালাৎ" শব্দ দিলেন।

এই প্রকারে যখন গুজরাটী, হিন্দী ও উর্দু ভাষায় অসহযোগের প্রতিশব্দে আমার মাথা ভরিয়া উঠিতেছিল, সেই সময় কংগ্রেসের জন্য অসহযোগ প্রস্তাব গঠন করার ভার উপরোক্ত রূপে আমার উপর পড়িল। তাহাতে "শান্তিময়" শব্দ প্রয়োগ করিতে ভুলিয়া গেলাম। আমি প্রস্তাবের খসড়া করিয়া ট্রেনেই মৌলানা সৌকত আলীকে দিয়াছিলাম। রাত্রে আমার মনে হইল যে, "শান্তিময়" এই প্রধান শব্দটিই বাদ পড়িয়া গিয়াছে। আমি মহাদেবকে ছুটিয়া যাইতে বলিলাম ও শান্তিময় শব্দটা যেন ছাপার সময় থাকে, সে কথা বলিয়া দিলাম। আমার মনে হয়, এই সংশোধন করার পূর্ব্বেই প্রস্তাব ছাপা হইয়া গিয়াছিল। সেই সন্ধ্যাতেই বিষয়-নির্ব্বাচন সমিতি বসার কথা। খসড়ার ছাপানো কাগজগুলিতে তখন আমি এই সংশোধন করিয়া লইতে বলি। আমি পরে দেখিয়াছিলাম যে, আমি ঐ মুসাবিদা লইয়া প্রস্তুত না থাকিলে বড় মুস্কিল হইত।

আমার অবস্থা বড়ই শোচনীয় হইয়াছিল। কে যে আমার প্রস্তাব সমর্থন করিবে, আর কে বিরোধিতা করিবে তাহা বুঝিতে পারিতেছিলাম না। লালাজী কোন্ দিকের অনুকূল, তাহা আমি কিছু জানিতাম না। আমি অভিজ্ঞ যোদ্ধাদের ঘনসন্নিবেশ কলিকাতায় দেখিতে পাইলাম। বিদুষী বেসাণ্ট, পণ্ডিত মালব্যজী, বিজয় রাঘবাচারী, পণ্ডিত মতিলাল, দেশবন্ধু প্রভৃতি তাঁহাদের মধ্যে ছিলেন।

আমার প্রস্তাব ছিল, খিলাফৎ ও পাঞ্জাবের অন্যায়ের বিষয়ে ও অসহযোগের সম্বন্ধে। শ্রীযুত বিজয়রাঘবাচারী ইহাতে রস পাইলেন না। তিনি বলিলেন—"যদি অসহযোগই করিতে হয়, তবে বিশেষ নির্দ্দিষ্ট একটা অন্যায়ের জন্য কেন করা হইবে? স্বরাজের অভাব সর্ব্বাপেক্ষা বড় অন্যায়, তবে তাহারই জন্য অসহযোগ করা যাক্।" মতিলালজীও এই মতেই মত দিলেন।

আমি তখনই এই প্রস্তাব স্বীকার করিলাম এবং স্বরাজের দাবী প্রস্তাবের ভিতর দিলাম। বিস্তৃত, গম্ভীর ও তুমুল বিতর্কের পর অসহযোগ-প্রস্তাব গৃহীত হইল।

মতিলালজী ইহাতে সর্ব্বপ্রথম নামিয়া পড়িলেন। আমার সহিত তাঁহার মধুর আলোচনা এখনো মনে আছে। কিছু শব্দের পরিবর্ত্তন তিনি করিতে বলেন এবং তাহা মানিয়া লই। দেশবন্ধুকে তিনি ইহাতে নামাইবার ভার লইলেন। দেশবন্ধুর হৃদয় অসহযোগের দিকে ছিল, কিন্তু তাঁহার বুদ্ধি তাঁহাকে বলিত যে, অসহযোগ লোকে গ্রহণ করিবে না। দেশবন্ধু ও লালাজী নাগপুরে পুরাপুরি অসহযোগের ভিতর আসিয়া পড়িলেন। কংগ্রেসের এই বিশেষ অধিবেশনে ৺লোকমান্যের অনুপস্থিতি বড়ই দুঃখদায়ক হইয়াছিল। আমার আজও বিশ্বাস যে, তিনি জীবিত থাকিলে কলিকাতায় অসহযোগ প্রস্তাবকে আশীর্ব্বাদ করিতেন। আর তাহা না করিয়া তিনি যদি বিরোধ করিতেন তাহাও ভাল লাগিত, আমি তাহা হইতে শিক্ষা লইতে পারিতাম। তাঁহার সহিত আমার মতভেদ প্রায় সব সময়েই হইত, কিন্তু তাহা সম্পূর্ণই মধুর ছিল। আমাদের মধ্যে যে প্রীতির সম্পর্ক রহিয়াছে, তাহা তিনি সর্ব্বদাই আমাকে বুঝিতে দিতেন। আজ লিখিবার সময় তাঁহার

অবসানের চিত্র আমার সম্মুখে উপস্থিত হয়, আমার সাথী পটবর্দ্ধন মধ্যরাত্রে তাঁহার অবসানের সংবাদ আমাকে টেলিফোন করেন। তখন আমি সাথীদিগের নিকট বলিয়া উঠিয়াছিলাম—"আমার সর্ব্বশ্রেষ্ঠ অবলম্বন ভাঙ্গিয়া পড়িল।" এই সময় অসহযোগের আন্দোলন পুরাদমে চলিতেছিল। আমি তাঁহার নিকট হইতে উৎসাহ ও প্রেরণা পাওয়ার আশা করিতেছিলাম। অবশেষে অসহযোগ যে মূর্ত্তি গ্রহণ করিয়াছিল, তাহা তিনি কি ভাবে গ্রহণ করিতেন, তাহা দৈব জানে। আমি কেবল এইটুকু জানি যে, প্রজার আন্দোলনের ইতিহাসের এই বিষম সঙ্কট-সময়ে তাঁহার অভাব সকলকেই শূলের ন্যায় বিদ্ধ করিয়াছিল।

৪৩

নাগপুরে

কংগ্রেসের বিশেষ অধিবেশনে গৃহীত অসহযোগ-প্রস্তাব নাগপুরের বার্ষিক অধিবেশনে সমর্থিত হওয়ার কথা। কলিকাতার মত, নাগপুরেও অসংখ্য লোক একত্র হইয়াছিল। এখানেও প্রতিনিধির সংখ্যা নির্দ্দিষ্ট ছিল না।* আমার স্মরণ আছে যে, চৌদ্দ হাজার প্রতিনিধি উপস্থিত হইয়াছিলেন। লালাজীর অনুরোধে বিদ্যালয়-সম্বন্ধে একটা ছোট পরিবর্ত্তন আমি স্বীকার করিয়া লই।

এই অধিবেশনেই কংগ্রেসের নিয়মাবলী গ্রহণ করার কথা। আমি এই নিয়মাবলী গ্রহণের প্রস্তাব বিশেষ অধিবেশনে উপস্থিত করিয়াছিলাম। সেখানে উহার ভালরকম আলোচনা হইয়াছিল। এই অধিবেশনে শ্রীযুত বিজয় রাঘবাচারী সভাপতি ছিলেন। বিষয় নির্ব্বাচনী সভা, নিয়মাবলীতে একটা বড় পরিবর্ত্তন করিয়াছিলেন। আমি প্রতিনিধি সংখ্যা ১৫০০ রাখিয়াছিলাম; বিষয়-নির্ব্বাচনী সভা তাহার পরিবর্ত্তে ৬০০০ করেন। আমার মতে এই পরিবর্ত্তন করা বিচার-বিহীন কার্য্য হইয়াছিল। এত বৎসরের অভিজ্ঞতায় আমার এই বিশ্বাসই দৃঢ় হইয়াছে। অধিক প্রতিনিধি হইলে বেশী ভাল কাজ হয়, অথবা প্রজাতন্ত্র অধিক পরিমাণে সত্য হয়, এই প্রকার কল্পনা আমি নিতান্তই ভ্রমপূর্ণ বলিয়া মনে করি। যদি ১৫০০ প্রতিনিধি উদারচিত্ত, প্রজা-স্বত্ব-রক্ষাকারী ও বিশ্বস্ত লোক হন, তবে ছয় হাজার দায়িত্বহীন প্রতিনিধি অপেক্ষা প্রজার স্বত্ব তাঁহাদের দ্বারাই অধিকতর ভাবে রক্ষিত হইতে পারে। প্রজাতন্ত্র সত্য করিয়া

তুলিতে হইলে, প্রজার স্বাধীন মনোভাব, আত্মসম্মান ও ঐক্যভাব এবং সর্ব্বাপেক্ষা যোগ্য প্রতিনিধি নির্ব্বাচনের আগ্রহ উপস্থিত হওয়া চাই। কিন্তু সংখ্যায় মুগ্ধ বিষয়-নির্ব্বাচনী সভা ছয় হাজার অপেক্ষাও অধিক প্রতিনিধির আবশ্যকতা দেখিতেছিলেন। ছয় হাজার প্রতিনিধি গ্রহণে স্বীকৃত হওয়াই ত এক মিটমাট করা হইয়াছে বলা যায়।

কংগ্রেসে স্বরাজের লক্ষ্য সম্বন্ধে খুব আলোচনা হইয়াছিল। নিয়মাবলীতে ছিল, স্বরাজ্যই লক্ষ্য—তাহা সাম্রাজ্যের ভিতরে অথবা বাহিরে—যেরূপই হোক্। সাম্রাজ্যে থাকিয়াই স্বরাজ চাই—এ পক্ষও কংগ্রেসে ছিল, এবং সেই পক্ষের সমর্থন মালব্যজী ও মিঃ জিন্না করিয়াছিলেন। কিন্তু তাঁহারা যথেষ্ট ভোট পান নাই। শান্তির সহিত ও সত্য রূপ সাধন দ্বারা স্বরাজ প্রাপ্তব্য—ইহাও নিয়মাবলীতে ছিল। এই সর্ত্তেরও বিরোধ হইয়াছিল। মহাসভা তাহা অস্বীকার করেন এবং ভাল করিয়া আলোচনার পর সমস্ত নিয়মাবলী গৃহীত হয়। আমি বলিতে পারি যে, যদি লোকে বিশ্বস্ততার সহিত, বুদ্ধিপূর্ব্বক এই নিয়মাবলী কার্য্যতঃ প্রয়োগ করে, তবে তাহাতে প্রজাসাধারণের খুব শিক্ষা হয় এবং তাহার ঠিকমত প্রয়োগই স্বরাজ প্রাপ্তি। কিন্তু এ বিষয় এখানে আর আলোচনা করিব না।

এই সভাতে হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য বিষয়ে ও অন্ত্যজদের সম্পর্কে নির্দ্ধারণ গৃহীত হয়। অস্পৃশ্যতা দূর করার ভার হিন্দু সভ্যরা লইয়াছেন, আর খাদির ভিতর দিয়া ভারতবর্ষের অস্থিচর্ম্মসার লোকের মধ্যে কংগ্রেস নিজেকেই খুঁজিয়া পাইয়াছেন। খিলাফৎ-প্রশ্নের ভিতর সরকারের সহিত অসহযোগের ও হিন্দু-মুসলমান-ঐক্য সাধনের মহান্ প্রয়াস কংগ্রেস করিয়াছিলেন।

৪৪
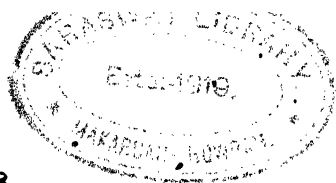
পূর্ণাহুতি

এখন এই অধ্যায়গুলি সমাপ্ত করার সময় আসিয়াছে। ইহার পর হইতে আমার জীবন সাধারণের নিকট এতই প্রকাশিত যে, লোকে জানে না এমন বড় কিছুই নাই। আর ১৯২১ সাল হইতে আমি কংগ্রেসের নেতাদের সহিত এত ওতপ্রোত ভাবে যুক্ত যে, কোনও একটি বিষয় বলিতে গেলে, তাহার মধ্যে নেতাদিগকে টানিয়া না আনিলে বর্ণনাতে যথার্থতা দেওয়া যাইবে না। এই সম্পর্ক এখনো বলবৎ রহিয়াছে। যদিও শ্রদ্ধানন্দজী, দেশবন্ধু, লালাজী, হাকিম সাহেব আমাদের মধ্যে নাই, তথাপি সৌভাগ্যবশতঃ অন্য অনেক নেতা এখনো জীবিত রহিয়াছেন। কংগ্রেসের ভিতর যে মহা পরিবর্ত্তন বর্ণিত হইয়াছে, তৎপরবর্ত্তী ইতিহাস এখনো তৈরী হইতেছে। আমার প্রধান পরীক্ষা মহাসভার ভিতর দিয়াই হইতেছে। সেইজন্য সে সকল সত্যের প্রয়োগ বর্ণনা করিতে, নেতাদিগকে সম্বন্ধের মধ্যে আনিয়া ফেলা অনিবার্য্য। আমি অন্ততঃ বিনয়ের খাতিরেও এখন তাঁহাদিগকে ইহার মধ্যে আনিতে পারি না। পরিশেষে ইহাও বক্তব্য যে, বর্ত্তমান প্রয়োগ-সম্বন্ধে আমার নির্ণয় নিশ্চয়াত্মক এখনো বলা যায় না। সেই হেতু এই সকল প্রকরণ লেখা বন্ধ করাই কর্ত্তব্য বোধ হইতেছে। আমার কলম আর অগ্রসর হইতে চায় না—একথাও বলা যায়।

পাঠকদিগের নিকট বিদায় লইতে আমার দুঃখ হইতেছে। আমার পরীক্ষা সমূহের, আমার নিকট খুবই মূল্য আছে। আমি সে সকল

ঠিকমত বর্ণনা করিতে পারিয়াছি কিনা জানি না। যথাযথভাবে বর্ণনা করিতে চেষ্টার ত্রুটি করি নাই। সত্যকে আমি যেমন জানিয়াছি, যে পথে জানিয়াছি, তাহাই দেখাইতে আমি সর্ব্বদা চেষ্টা করিয়াছি এবং পাঠকদিগকে সেই বর্ণনা দিয়া চিত্তে শান্তিলাভ করিয়াছি। কেননা, আমি আশা করি যে, ইহাতে পাঠকদের সত্যের ও অহিংসার প্রতি আস্থা বর্দ্ধিত হইবে।

সত্য ভিন্ন কোনও পরমেশ্বর আছেন, ইহা আমি অনুভব করি নাই। সত্যময় হওয়ার জন্য অহিংসা একটি অবলম্বন, ইহা যদি এই প্রকরণগুলির পাতায় পাতায় না দেখাইতে পারিয়া থাকি, তবে এই প্রযত্ন ব্যর্থ হইয়াছে বলিয়া মনে করিব। চেষ্টা ব্যর্থ হোক্, কিন্তু মূলমন্ত্র ত ব্যর্থ নয়। আমার অহিংসার ভিতর ত্রুটি আছে, উহা অসম্পূর্ণ। সহস্র সহস্র সূর্য্য একত্র করিলেও যে সত্যরূপী সূর্য্যের তেজের পরিমাণ পাওয়া যায় না আমার সত্যের দৃষ্টি সেই সূর্য্যের একটি কিরণের একটু কণামাত্র। এই সত্য-সূর্য্যের পূর্ণ দর্শন, পূর্ণ অহিংসা ভিন্ন হয় না, এতাবৎ কালের পরীক্ষার পর একথা বলিতে পারি।

এই ব্যাপক সত্যনারায়ণের প্রত্যক্ষ দর্শনের জন্য জীব মাত্রের প্রতি আত্মবৎ প্রেম সম্পন্ন হওয়ার পরম আবশ্যকতা আছে। যাহারা উহা পাইতে ইচ্ছা করে, জীবনের কোনও ক্ষেত্রের বাহিরেই তাহারা বসিয়া থাকিতে পারে না। সেই হেতু আমার সত্যের পূজা আমাকে রাজনীতি ক্ষেত্রে টানিয়া লইয়া গিয়াছে। ধর্ম্মের সহিত রাজনীতির সম্বন্ধ নাই, এই প্রকার যিনি বলেন, তিনি ধর্ম্ম কি তাহা জানেন না—একথা বলিতে আমার সঙ্কোচ হয় না। ইহা বলাতে অবিনয়ও করা হয় না।

আত্মশুদ্ধি ব্যতীত জীব মাত্রের সহিত ঐক্য-বোধ হয় না।

আত্মশুদ্ধি ব্যতীত অহিংসা ধর্ম্মের পালন সর্ব্বথা অসম্ভব। অশুদ্ধাত্মা পরমাত্মা দর্শন করিতে অসমর্থ, এই হেতু জীবন যাত্রার প্রত্যেক ক্ষেত্রেই শুদ্ধির আবশ্যকতা আছে। এই শুদ্ধি সাধনার দ্বারা প্রাপ্তব্য।

কিন্তু আত্মশুদ্ধির পথ অত্যন্ত দুর্গম। নিষ্কলঙ্ক শুদ্ধি ও পবিত্রতা লাভ করিতে হইলে, চিন্তায়, বাক্যে এবং কাজে সম্পূর্ণরূপে আসক্তি-শূন্য হইতে হইবে; প্রেম বা বিদ্বেষ, অনুরাগ বা বিরাগ—এইসব পরস্পর বিরোধী চিত্ত-বৃত্তির উর্দ্ধে উঠিতে হইবে। আমি জানি যে, এজন্য নিরন্তর চেষ্টা করা সত্ত্বেও আমি এই ত্রিবিধ পবিত্রতা লাভ করিতে সক্ষম হই নাই। এইজন্যই জগতের স্তুতি-গীতি আমাকে স্পর্দ্ধিত করিতে পারে না। বস্তুতঃ এই সব স্তুতি-গীতি আমাকে আঘাতই করে। চঞ্চল রিপুকে জয় করা, অস্ত্র বলে পৃথিবীকে জয় করা অপেক্ষাও ঢের বেশী দুঃসাধ্য বলিয়া আমার মনে হয়। ভারতবর্ষে প্রত্যাগমনের পর হইতে আমার ভিতরে সুপ্ত ও গুপ্ত প্রবৃত্তিগুলির প্রভাব আমি প্রতিমুহূর্ত্তেই অনুভব করিতেছি। ইহাদের অভিজ্ঞতা আমার দীনতাকে প্রকট করিতেছে, কিন্তু তথাপি আমি পরাভূত হই নাই। বরং এই সব প্রয়োগ, এই সব অভিজ্ঞতা আমাকে রক্ষাই করিয়াছে, এবং উহারা আমাকে গভীর আনন্দও দান করিয়াছে। আমি ইহাও জানি যে, আমার সম্মুখে এখনও এরূপ পথ আছে যাহা অতি দুর্গম এবং যাহা আমাকে অতিক্রম করিতে হইবে। আমার নিজেকে একেবারে রিক্ত করিয়া দিতে হইবে। মানুষ যে পর্য্যন্ত প্রাণী-জগতের ভিতর আপনাকে সর্ব্বাপেক্ষা দীন করিয়া তুলিতে না পারে, সে পর্য্যন্ত তাহার মুক্তি নাই। এই দীনতার শেষ সীমা হইতেছে অহিংসা।

পাঠকদের কাছে বিদায় লওয়ার পূর্ব্বে, অন্ততঃ কিছুকালের জন্য

বিদায় লওয়ার পূর্ব্বে, সত্যের ভগবানের কাছে আমার জন্ত তাঁহাদিগকেও আমি এই প্রার্থনাই করিতে বলি—তিনি যেন আমাকে মনে, বাক্যে এবং কাজে অহিংস হইবার শক্তি দান করেন।

সমাপ্ত

নির্ঘণ্টপত্র

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

প

নির্ঘণ্ট

নির্ঘণ্ট

স

হ

নির্ঘণ্ট

প্রতিষ্ঠান-গান্ধী-সাহিত্য

প্রকাশক—খাদিপ্রতিষ্ঠান, ১৫, কলেজস্কোয়ার, কলিকাতা।

১। **গান্ধীজীর আত্মকথা**—গান্ধীজীর পবিত্র জীবন-কাহিনী। মূল গুজরাটী হইতে সতীশবাবুর অনুবাদ। ইহার ভাষা বালকেও বুঝিতে পারে। দুইখণ্ডে সম্পূর্ণ। ইহার ইংরাজী অনুবাদ দুইখণ্ডের মূল্য সাড়ে দশ টাকা। বাংলা অনুবাদ প্রতি খণ্ড ৪০০ শত পৃষ্ঠা করিয়া। প্রতিখণ্ডের মূল্য ৸০ আনা।

২। **দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ**—দক্ষিণ আফ্রিকার নাম থাকিলেও জিনিষটা ভারতের সহিত নাড়ীর সূত্রে যুক্ত। দক্ষিণ আফ্রিকাতে গান্ধীজী সত্যাগ্রহ অস্ত্র আবিষ্কার করেন. ও সেখানকার ভারতবাসীর রাজনৈতিক অধিকার লাভের জন্য প্রয়োগ করেন। ইহা সত্যাগ্রহের মূল সূত্র কি ও সত্যাগ্রহীকে কি ভাবে আচরণ করিতে হয় তাহার বিস্তৃত ইতিহাস। বস্তুতঃ ইহাই সত্যাগ্রহ সম্বন্ধে শাস্ত্রীয় পুস্তক। ভারতবর্ষের বর্ত্তমান সত্যাগ্রহ এই পুস্তকের নির্দ্দেশ অনুযায়ী চলিতেছে। ইহা গান্ধীজীর লেখা ও সতীশ বাবুর অনুবাদ। প্রায় ৫০০ পৃষ্ঠায় সম্পূর্ণ। মূল্য ১৲ টাকা।

৩। **হিন্দ্ স্বরাজ্য**—দক্ষিণ আফ্রিকায় সত্যাগ্রহ যখন চলিতেছিল, সেই সময় ভারতবর্ষে কি ভাবে সত্যাগ্রহ চলা উচিত তাহা গান্ধীজী লিখেন। এ গ্রন্থখানা ১৯০৮ সালে লেখা। ইহাতে ঋষির দিব্য-দৃষ্টি দেখিবেন। সত্যাগ্রহীর কথা অব্যর্থ। গান্ধীজী পবিত্র-চিত্ত সত্যাগ্রহী। তিনি যাহা ১৯০৮ সালে বলিয়াছিলেন, তাহা আজ নিজেই সম্পাদন করিতেছেন। ২২ বৎসর পূর্ব্বেও সেই চরখার কথা, ওকালতী ত্যাগ. সেই খেতাব ত্যাগ ও লবণ করের কথা তিনি বলিয়াছিলেন। এই পুস্তকের ভবিষ্যৎবাণী অক্ষরে অক্ষরে সত্য হইতেছে—এখনো হইবে :—গান্ধীজীর লেখা, সতীশবাবুর অনুবাদ। ডবল ক্রাউন. ১৬ পেজি ১১৪ পৃষ্ঠা—মূল্য ।৵০ আনা।

৪। **চম্পারণ সত্যাগ্রহ**—ভারতবর্ষে প্রথম প্রজা-সত্যাগ্রহের ইতিহাস। গান্ধীজী যে সত্য দক্ষিণ আফ্রিকায় আবিষ্কার করিয়াছিলেন, তাহার প্রথম প্রয়োগ ও সাফল্যের বর্ণনা। বাবু রাজেন্দ্রপ্রসাদের হিন্দী 'চম্পারণমে মহাত্মাজী' অবলম্বনে সতীশবাবুর লেখা। (যন্ত্রস্থ)

৫। **শ্রীমদ্ভগবদ্গীতার—গান্ধী-ভাষ্য**—সতীশবাবুর সঙ্কলন।—প্রথমভাগে সতীশ বাবুর লেখা গীতা প্রবেশিকা, শেষভাগে গান্ধীজীর অনাসক্তি যোগ। মূল, অন্বয়, শব্দার্থ, গান্ধীজীর মূল গুজরাটী ব্যাখ্যা ও ভাষ্যের অনুবাদ। প্রতি অধ্যায়ের শেষে সঙ্কলনকারের দেওয়া ভাবার্থ। ডবল ফুলস্ক্যাপ ১৬ পেজি, ৫৬৪ পৃষ্ঠা—মূল্য ৸৹ আনা। এই গীতা পড়িলে গান্ধীজীকে ও তাঁহার প্রেরণার মূল ধর্ম্ম কি তাহা জানিতে পারিবেন।

৬। **য়েরোড়া জেলের অভিজ্ঞতা**—গান্ধীজীর জেল-জীবনের—১৯২১-২৩ এই দুই বৎসরের অমূল্য ইতিহাস। ইহাতে সত্যাগ্রহীর আচরণ কি হওয়া উচিত ও গবর্ণমেন্টের সহিত জেলে বাসকালে কি প্রকার আচরণ করিতে হইবে তাহার নির্দ্দেশ রহিয়াছে। গান্ধীজী ও সরকার উভয়কেই জানিতে হইলে এই বইখানা পড়া দরকার। গান্ধীজীর লেখা সতীশবাবুর অনুবাদ। মূল্য ॥৹ আনা

৭। **জীবন-ব্রত**—যে সকল ব্রত গান্ধীজী পালন করিতে চেষ্টা করেন, যাহা সবরমতীতে প্রতিপালিত হউক বলিয়া গান্ধীজী ইচ্ছা করেন, যে আদর্শের দিকে ভারতবর্ষ সনাতন কাল হইতে চলিয়া আসিতেছে ও গান্ধীজী যাহার প্রগতি অক্ষুণ্ণ করিতে ইচ্ছা করেন, এই ছোট বইখানিতে তাহাই আছে। এক কথায় গান্ধীবাদ বা 'গান্ধীইজম' কি তাহা এই বইখানাতেই পাইবেন। গান্ধীজীর লেখা গুজরাটী হইতে সতীশবাবুর অনুবাদ। মূল্য ॥৹ আনা।

৮। **স্বাস্থ্য-রক্ষা**—গান্ধীজীর লেখা গুজরাটী হইতে সতীশবাবুর অনুবাদ। ইহাতে অশন বসন, রোগ ও চিকিৎসা সম্বন্ধে গান্ধীজীর অভিজ্ঞতা-লব্ধ অপূর্ব্ব জ্ঞান ও যে দার্শনিক ভিত্তির উপর তাহা প্রতিষ্ঠিত, তাহা বালকেরও বুঝার উপযোগী করিয়া লেখা হইয়াছে। মূল্য ॥৹ আনা।